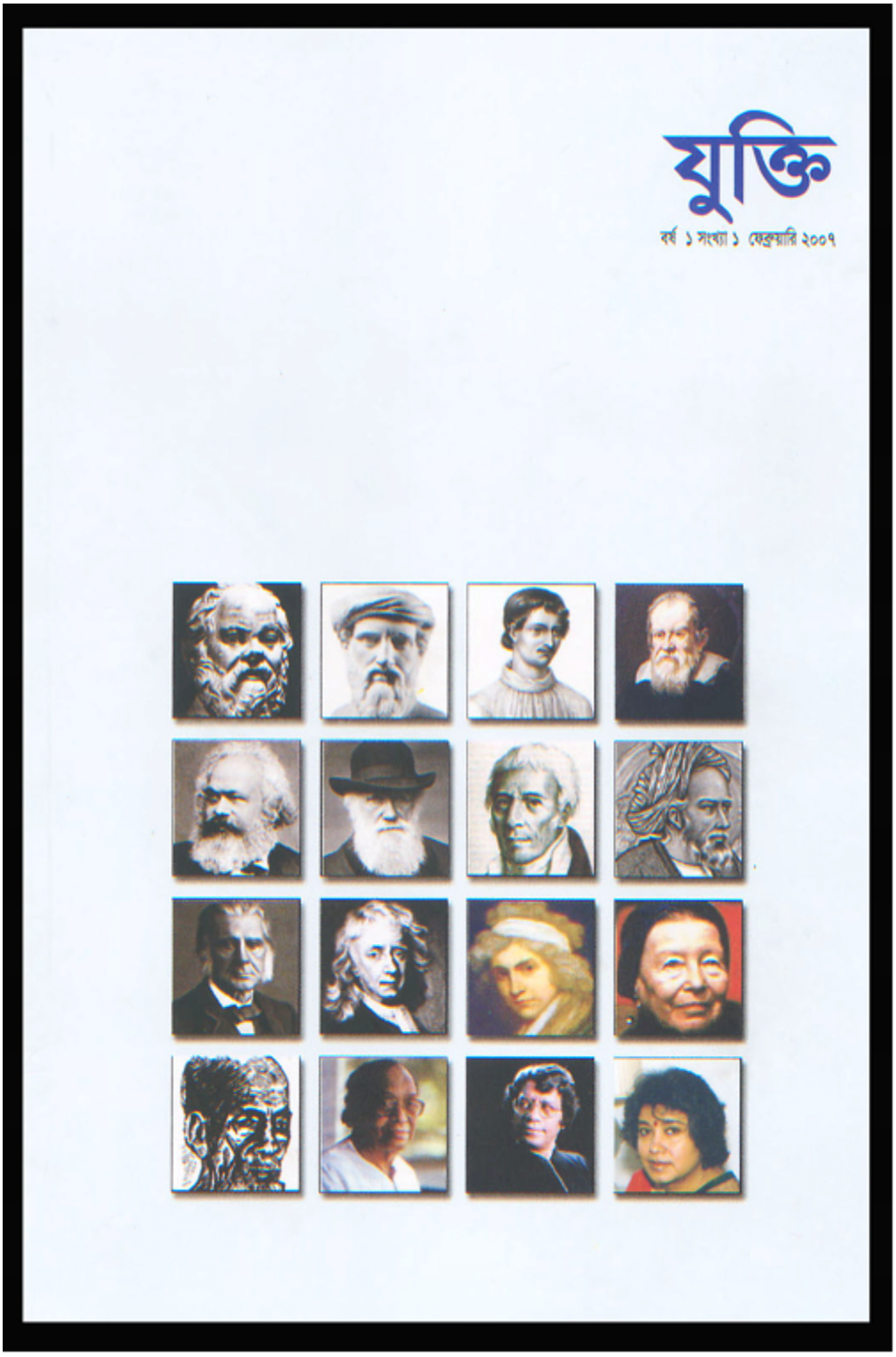

যুক্তি আনে চেতনা

আর চেতনা আনে সমাজ পরিবর্তন

যুক্তি : মুক্তমনা ই-বুক

যুক্তি কে না ভালবাসে? ভালবাসা তো শুধু নয়, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই তো যুক্তির প্রতি আস্থা থাকা প্রয়োজন। সবচেয়ে কট্টর বিশ্বাসী ব্যক্তিটিও কিন্তু যুক্তি ছাড়া এ জগতে এক পাও চলতে পারেন না। যতই বিশ্বাস কিংবা ঈমানের জোর থাকুক না কেন, কেউই হাইওয়েতে গিয়ে চলমান বাসের সামনে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে যান না। কখনই ভাবেন না, 'দাঁড়িয়ে যাই, ক্ষতি কি- বাঁচা মরার মালিক তো আল্লাহ, তিনিই তাঁর বান্দাকে রক্ষা করবেন।' অপার্থিব সত্তার কাছে মগজ বিকিয়ে না দিয়ে বরং আস্থা রাখেন মানবীয়, যুক্তি, সংশয় এবং বুদ্ধির উপর, সব দিক দেখে-শুনেই শেষ পর্যন্ত রাস্তা পার হন। বাজারে গিয়ে ঈশ্বরের নাম জপে চোখ বন্ধ করে কেউ বাজার করেন না, বরং দেখে-শুনে, যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে ভাল মত বিচার করেই জিনিস কেনেন, পাছে ঠকে না যান! এগুলো উদাহরণ থেকে আমাদের পার্থিব জীবনে যুক্তির গুরুত্ব বোঝা যায়। অথচ, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তিবাদী হওয়ার কথা বললে কিংবা যুক্তিবাদ প্রচার করলে অনেকের মাথায় যেন বাজ পড়ে। ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা 'আগডুম-বাগডুম' তত্ত্বকথা আর অতিকথা হাজির করে যুক্তিবাদীদের ঠেকাতে সচেষ্ট হন, কখনওবা কথার মার-প্যাঁচ দিয়ে এমন এক অস্তিত্বহীন সত্তার 'অস্তিত্ব প্রমাণে' সচেষ্ট হন, যার প্রতি আসলে তার নিজেদেরও ব্যবহারিক জীবনে কোন আস্থা নেই, ছিলও না বোধ হয় কখনও।

এর মধ্যে আমাদের প্রিয় মুক্তমনা সদস্য অনন্ত বিজয় এক অভিনব কাজ করে ফেলেছে। 'মৌলবাদীদের আখড়া' হিসেবে পরিচিত সিলেটে থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের যুক্তিবাদীদের সংগঠিত করে 'যুক্তি' নামের এমন একটি সাহসী পত্রিকা বের করেছে এবারের (২০০৭) বই মেলায়, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অভূতপূর্বই বলা যায়। এ পত্রিকাটি পড়লেই পাঠকেরা বুঝবেন যে, অনন্ত বিষবৃক্ষের পাতায় পাতায় কাঁচি চালায়নি, বরং কুঠারের কোপ বসিয়েছে একদম গভীরে, বিষবৃক্ষের গোঁড়াতেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত দৈনিকে ছোট্ট বইটি ইতোমধ্যেই আলোচিত হয়েছে আর সেই সাথে পেয়েছে উগ্র সাম্প্রদায়িক মহল থেকে হুমকি-ধামকিও!!! এধরনের হুমকি ধামকি তো আমাদের মত মুক্তমনাদের কাছে নতুন কিছু নয়! অনন্ত নিশ্চয়ই তা এতোদিনে জেনে গেছে।

আমার অনুরোধে অনন্ত 'যুক্তি' নামের লিটল ম্যাগাজিনটি মুক্তমনায় 'ই-বুক' আকারে প্রকাশের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আমি মনে করি অনুসন্ধিৎসু এবং মননশীল পাঠকেরা এতে খুবই উপকৃত হবেন। মুক্তমনা আন্দোলনের সাথে জড়িত লেখকদেরও বেশ কটি লেখা এতে সন্নিবেশিত করেছে অনন্ত। আমরা এর আগে মুক্তমনার পক্ষ থেকে 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' এবং 'বিবর্তনের পথ ধরে' বই দুটি ই-বুক আকারে প্রকাশ করেছিলাম। সেই একই ধারাবাহিকতায় এবার প্রকাশিত হল 'যুক্তি'। বইটি সুতনী ফন্টে লেখা হয়েছে। ম্যাগাজিনটি ঠিকমত পড়তে না পারলে দয়া করে সুতনী ফন্ট আমাদের ওয়েব সাইট থেকে ডাউনলোড করে নিন।

অনন্তকে তাঁর এই সাহসী পদক্ষেপের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি যুক্তির বহুল প্রচার কামনা করি।

অভিজিৎ রায়
মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
১৭ এপ্রিল, ২০০৭

যুক্তি

ফেব্রুয়ারি ২০০৭

●●●

যুক্তি

বর্ষ ১ সংখ্যা ১ ২০০৭

সম্পাদক
অনন্ত বিজয় দাশ

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
lekhok@inbox.com

প্রচ্ছদ পরিকল্পক
বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল, সিলেট

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪১৩, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

মুদ্রক
প্যারাডাইম অফসেট প্রেস
রাজা ম্যানশন, দ্বিতীয় তলা, জিন্দাবাজার, সিলেট

পরিবেশক
তক্ষশিলা, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা
বইপত্র, উত্তর জিন্দাবাজার, সিলেট

সার্বিক যোগাযোগ
মুঠোফোন : ০১৭১২ ৯৬৬৮১৩, ০১৭১২ ৯৯১৮৫৬
yukti@inbox.com

মূল্য
৫০ টাকা

সূচি

প্রবন্ধ

ব্রুনো থেকে আরজ আলী মাতুব্বর/অজয় রায় ৭
ঈশ্বরই কি সৃষ্টির আদি বা প্রথম কারণ?/অভিজিৎ রায় ১৬
মানুষের বিবর্তন/বন্যা আহমেদ ২১
আগামীদিনের মুক্তমনা/আকাশ মালিক ৩২
নারীবাদ ও নারীবাদী/নন্দিনী হোসেন ৩৪
মোহনীয় মোনালিসা/ফরিদ আহমদ ৩৬

কবিতা

ড. ইউনূস-শান্তিপুরস্কার/মৌ মধুবন্তী ৫২

প্রবন্ধ

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা বনাম কোরানিক বিজ্ঞান/জাহেদ আহমদ ৫৪
যুক্তিবাদ : একটি দর্শন একটি আন্দোলন/মফিজুর রহমান রুন্নু ৬৬
আলোকবিন্দু/অরুণকান্তি দাশ ৭২

ছোটগল্প

রাশার খণ্ডিত পৃথিবী/মাহ্‌মুদ আলী ৭৪

প্রবন্ধ

অস্থির সময় স্বপ্নহীন ভবিষ্যৎ/অ.আ.ম. রেজা ৮১
দাজ্জালের কথা/জাহিদ রাসেল ৮৪
সিলেটি মৌলবাদ/সুমন তুরহান ৯০
ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল- এর কাছে খোলা চিঠি/ফাতেমা রেজমিন ৯৬
মুসলিম দর্শনে মুতাজিলাবাদ/মনির হোসাইন ১০০
কালের আয়নায় নারীমুক্তির হালচাল/এম এ আলিম ১০৮
হায় স্বপ্ন! হায় সভ্যতা!/লিটন দাস ১১৪
ধর্মবিশ্বাসে যুক্তির সংকট/সৈকত চৌধুরী ১১৬

অনুবাদ

মুক্তচিন্তক পরিচিতি/ড্যান বার্কার ; অনুবাদ : মিহিরকান্তি চৌধুরী ১২২

প্রবন্ধ

যুক্তি ও যুক্তিবাদ/অনন্ত বিজয় দাশ ১২৫

সম্পাদকীয়

আন্ধারে ভরা রাতি, আলেয়া জ্বালায় বাতি ।
বল না, বল না, কে যাবি, আনতে ভোর ... ॥

মানুষ তার এই আপন মাতৃভূমিতে পদচারণার সময় থেকে খুঁজে ফিরছে নিজের শিকড় । এই শিকড় খুঁজতে গিয়ে মানুষ বারেবারে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, উত্তর খুঁজেছে আপন মনে । কখনও পেয়েছে কিছু কিছু উত্তর প্রত্যক্ষ প্রমাণ–ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের মাধ্যমে আর কখনওবা হাতড়ে হাতড়ে চলছে, এখনও । কেউবা উত্তর খুঁজতে গিয়ে ধৈর্য্য হারিয়ে কিংবা স্বার্থের লোভে তৈরি করেছে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা, প্রথা আর নিয়মের নামে শোষণের কৌশল । মনীষী মার্কস বর্ণিত আফিমে আসক্ত, বিশ্লেষণী জ্ঞানচর্চায় উদাসীন শ্রেণীবিভক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তা মেনে নিয়েছে । ফলে, গুটিকয় সুযোগ-সন্ধানী সওদাগর সিন্দাবাদের ভূতের মতো আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাঁধে চেপে বসে আছে যুগ যুগ ধরে । ভৌতিকোপন্যাসের চরিত্র ড্রাকুলা'র মতো আমাদের রক্ত খেয়ে নিজের উদরপূর্তি করে চলছে ওরা! কিন্তু আমরা দেখেছি, ইতিহাস সবসময় এই ড্রাকুলাদের বিপরীতে অবস্থান করে । ড্রাকুলাদের হাত থেকে আপন ধরণী রক্ষার জন্য সবসময়ই প্রথাবিরোধী কালোত্তীর্ণরা নিজের জীবন বাজি রেখেছেন । এই প্রথাবিরোধী বিরুদ্ধস্রোতের যাত্রী কালোত্তীর্ণদের তালিকা কিন্তু নেহায়েতই কম নয় । এই তালিকায় যেমন রয়েছেন খ্রিস্টপূর্বের অনেক মনীষী তেমনি বর্তমান কালের অনেক জ্ঞানীগুণী; যেমন গৌতম বুদ্ধ, চার্বাক, বৃহস্পতি, মহাবীর, অজিত কেশকম্বল, মক্ষলি গোশাল, কপিল, হেরাক্লিটাস, এ্যানাক্সিগোরাস, পিথাগোরাস, ডেমোক্রিটাস, সক্রেটিস, হাইপেশিয়া, আল্লাফ আবুল হুজৈল আল আল্লাফ, নজ্জাম, জাহিজ, আবু হাসিব, ওমর খৈয়াম, ইবনে সিনা, কোপার্নিকাস, ব্রেনো, গ্যালিলিও, নিউটন, ডারউইন, কার্লমার্ক, মেরী ওলস্টোনক্রাফট, সিমোন দ্য বোভোয়ার, আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আব্দুল কাদির, আবুল ফজল, আরজ আলী মাতুব্বর, আহমদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা নাসরিন প্রমুখ । এভাবে ক্রমেই তালিকা দীর্ঘায়িত করা যায় । আমরা ঐতিহ্যগতভাবে তাঁদেরই উত্তরসূরি । বুদ্ধির মুক্তি এবং মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনে, বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ বিনির্মাণে আমরা প্রেরণা পাই এই দৃঢ়চিত্ত মুক্তচিন্তার মনীষীদের কর্মস্পৃহা থেকে । আমাদের চেতনায় মুক্তমন, চর্চা করি বিজ্ঞানমনস্কতা আর যুক্তিবাদিতার ।

বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্যের সমন্বয়ে বেশকিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ, অনুবাদ ছাড়াও সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে শুরু হল যুক্তির প্রথম যাত্রা । আশা করি, প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাইরে থেকে রচিত যুক্তি সকলশ্রেণী পাঠকের গ্রহণযোগ্যতা পাবে । আমরা শ্রদ্ধার সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সকল লেখকের কাছে, যারা নিজেদের প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মাঝে সময় বের করে, আমাদের জন্য দু' কলম লিখেছেন, এই সাথে আমার আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তাদের কাছে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যাদের লেখা বর্ধিত কলেবরের কারণে ছাপানো সম্ভব হলো না । আন্তরিকতা আর নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও এবারের সংখ্যায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেল, পাঠকের কাছে অনুরোধ-এইসকল ভুলভ্রান্তি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এবং সাথে সাথে এগুলো ধরিয়ে দেয়ার জন্য, যাতে ভবিষ্যতে আমরা সংশোধন করতে পারি । সবশেষে, আমরা স্পষ্টভাবে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এই সংখ্যায় প্রকাশিত সকল লেখাই লেখকগণের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, অভিমত এবং তথ্যসংকলন; এর সাথে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল কোনোভাবেই (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) সম্পৃক্ত নয় । আমরা মনে করি, প্রকাশিত যে কোনো বিষয়বস্তুর সাথে যে কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন এবং প্রকাশের জন্যে আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন । প্রকাশযোগ্য হলে, আমরা অবশ্যই পাঠকের ভিন্নমত আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করব ।

অনন্ত

বিজ্ঞান নিয়ে ভাবনা

ব্রুনো থেকে আরজ আলী মাতুব্বর

অজয় রায়

ছাত্রবন্ধুদের জন্য বিজ্ঞান নিয়ে কিছু কথা বলতে হবে, অনুরোধ এসেছে-আর এ বন্ধুদের শিক্ষার স্তর মাধ্যমিক বা তার চেয়ে কম। এই অনুরোধ করার পেছনে আছে বস্তুবাদী দার্শনিক আরজ আলীর দর্শন ও তাঁর বৈজ্ঞানিক মতকে আবিষ্কার করার আগ্রহ। আরজ আলী মাতুব্বর আমাদের দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে আধুনিক কালে একটি উজ্জ্বল সংযোজন। তাঁর সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ বাড়ছে, এটি শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু আরজ আলীকে বুঝতে হলে চাই বিজ্ঞানের চর্চা করা, বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা। এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখেই এই ক্ষুদ্র রচনাটির প্রয়াস।

সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান নিয়ে রয়েছে নানা কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা। তারা ভাবে বিজ্ঞানের কল্যাণে জীবনে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য ও আয়েস। গরমের দিনে, যাদের সামর্থ্য আছে তারা তালপাখার পরিবর্তে বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস খেতে পারে, পায়ে হাঁটার পরিবর্তে সাইকেলে চড়তে পারে, গরুর গাড়ির পরিবর্তে বাসে উঠতে পারে, মাটির জায়গায় শানবাঁধান রাস্তার ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। নৌকায় নদী পার না হয়ে পুলের ওপর দিয়ে হেটে সহজে নদী পার হতে পারে। আরও বিত্ত থাকলে গ্রামেও কুঁড়েঘরের পরিবর্তে ইটের সুন্দর বাড়িতে বসবাস করতে সক্ষম। বিত্ত থাকলে শহরেও গাড়ি বাড়ি নিয়ে শান-শওকতের সাথে থাকা যায়, এও সাধারণ মানুষ জানে।

চিত্র : ব্রুনো

সাধারণ মানুষ এও জানে যে বিজ্ঞানের দৌলতে কৃষিতে ফলন বেড়েছে, নানা ধরনের জৈব-অজৈব সার ব্যবহারে জমির উর্বরা শক্তি বাড়ে; প্রতি নিয়ত উচ্চফলনশীল বীজ কৃষকের হাতে এসে পৌঁছাচ্ছে গবেষণাগার থেকে। হাতে পয়সা থাকলেই কৃষক বিজ্ঞানের এসব সুযোগসুবিধা গ্রহণ করতে পারে। হালের বদলে এসেছে কলের লাঙল বা পাওয়ার টিলার। কিন্তু বড় সমস্যা হল কৃষকের হাতে টাকা থাকা। ক্ষুদ্র চাষীদের হাতে পয়সা নেই, আর ভূমিহীনদের জমিই নেই। সুতরাং কৃষিও এখন আর পাঁচটা বৃত্তির মত অর্থের লগ্নিকরণ বা ইনভেস্টমেন্ট যা ক্রমেই সাধারণ কৃষকের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ধনী কৃষকরাই পারে অর্থলগ্নি করে কৃষিখাত থেকে সম্পদের ওপর সম্পদ গড়ে তুলতে। তাই ধনী কৃষকদের ঘরে এখন শোভা পায় দামী সোফাসেট, কাঠের চেয়ারের পরিবর্তে। সুদৃশ্য পর্দাঘেরা ড্রইংরুমের পরিবেশ এখন দুর্লক্ষ্য নয় গ্রামীণ পরিবেশেও। ফ্রিজ আছে, রঙিন টিভিও রয়েছে। অনেকের বাড়িতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও রয়েছে। কিন্তু দরিদ্র কৃষকরা অর্থলগ্নি করে চাষ করতে না পারায় অসম প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে আর চাষযোগ্য জমি বেচে দিতে বাধ্য হচ্ছে ধনী কৃষকদের কাছে, আর তাই ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়ছে। গ্রামে বাড়ছে মানুষের মধ্যে আর্থিক ব্যবধানের অসমতা। ফলে সামাজিক ভারসাম্যও বিনষ্ট হচ্ছে গ্রামে। এটাও কিন্তু বিজ্ঞানের দান। তাই অনিবার্য হিসেবে সিদ্ধান্ত এসে পড়ে যে, সমাজকাঠামোতে সমতা না এনে শুধু বিজ্ঞানের অবদানকে কাজে লাগিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষের উপকার করা যায় না, বরং সমাজের আর্থিক ভারসাম্য নষ্ট করে, সৃষ্টি করে প্রকট শ্রেণীবৈষম্য কারণ উন্নত উৎপাদনব্যবস্থাগুলো একটি অর্থবান শ্রেণীর সম্পদে পরিণত হয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উন্মেষের সাথে শ্রেণীহীন সমাজ-উন্মেষের কথাও ভাবতে হবে সমাজতন্ত্রের আদর্শবাদীদের বা কল্যাণমূখী রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণের ভবিষ্যৎ স্থপতিদের।

সাধারণ মানুষ এও জানে যে, বিজ্ঞান চিকিৎসাব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছে- টাইফয়েড-কলেরায় লোক মরে না, গ্রামের পর গ্রাম আজ আর উজাড় হয়ে যায় না বসন্ত রোগে। গ্রামেও প্রসূতি ও শিশুমৃত্যু অনেক কমে এসেছে। যক্ষা রোগ আজ আর কালব্যাধি নয়, কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণ

নিরাময়যোগ্য এবং ছোঁয়াচে নয়। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষও জানে এগুলো সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের কল্যাণে, বিজ্ঞানীদের নিরলস সাধনায়। বিজ্ঞান নিয়ে মানুষের অন্যধরনের কৌতুহলের অভাব নেই। সে ভাবে কিভাবে অনেকদূর থেকে মানুষের সাথে কথা বলা যায় তারের মধ্য দিয়ে, অনেকসময় বিনা তারেও রেডিও-টিভির যন্ত্রের মাধ্যমে। সে এও শুনেছে শুধু মাটির পৃথিবীতে নয়, মানুষ চাঁদে নামছে, বিভিন্ন গ্রহে যান পাঠিয়ে কেমন করে ভিন্নলোকের ভেতরের খবর পৃথিবীতে বসেই সংগ্রহ করে আনছে। এ নিয়ে আমাদের দেশের মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। কিন্তু আমাদের দেশের সবজান্তা ফতোয়াবাজ মৌলভিরা এসবের ব্যখ্যা দিতে পারেন না, কারণ ধর্মপুস্তকের বাইরে এদের কোনো জ্ঞান নেই। আর শতশত বর্ষ আগে লেখা ঐসব পবিত্র গ্রন্থাদিতে বিজ্ঞানের কোনো কথা নেই, থাকার কথাও নয়, কারণ তখন আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয় নি।

কিন্তু এতো গেল অর্থনৈতিক ব্যবধান সৃষ্টিতে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ। আরও আছে, সভ্য সমাজে বিজ্ঞান রূপান্তরিত হয়েছে অজ্ঞানতা, কুপ্রথা, অন্ধবিশ্বাস-ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ারে। কিন্তু আমাদের দেশে, সাধারণ মানুষ তো বটেই শিক্ষিত মানুষও বিজ্ঞানকে দেখে আরাম-আয়েশ, ভোগবিলাস ও জীবনের মান বৃদ্ধির উপকরণ হিসেবে। বিজ্ঞান যে যুক্তিবাদী একটি প্রক্রিয়া যা অন্ধকারকে দূর করে আলো জ্বালায়, সে অর্থে আমরা বিজ্ঞানকে গ্রহণ করি নি। এখনও আমাদের অগাধ বিশ্বাস পির হুজুরদের তুক্তাকে। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্তালা চাইলে রোগশয্যায় শায়িত যে কোনো রুগ্নব্যক্তি বিনা ওষুধে নিরাময় হতে পারে। আমরা এখনও পাগলের চিকিৎসার জন্য রোগীকে মনোবিজ্ঞানীর পরিবর্তে পিরের আস্তানায় নিয়ে যেতে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। মনোবিজ্ঞানীর ফিজিওথেরাপির পরিবর্তে আমাদের আস্থা পিরের ঝাড়ফুঁক, তুক্তাক, প্রহারসহ শারীরিক নির্যাতনী নানা উদ্ভট প্রেসক্রিপশনে। আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে, পিরের ফুঁ ও পানিপড়ার ক্রিয়া অ্যান্টিবায়োটিকের ক্রিয়ার চাইতে অধিক কার্যকর। আমরা বিশ্বাস করি পিরের আশীর্বাদে পরীক্ষায় ভাল ফল করা যায়, চাকুরীতে পদোন্নতি হয়, মামলায় জেতা যায়–হারানো জিনিস ফেরৎ পাওয়া যায়-বন্ধ্যানারী গর্ভবতী হয়। কি না সম্ভব হয় পির-দরবেশের আশীর্বাদ ও দোয়ায়। সুতরাং পিরব্যবসার যে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি ঘটবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

শুধু দরিদ্র আর অশিক্ষিত মানুষেরাই কি অন্ধবিশ্বাসী আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন? না, মৌলবাদী ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-অধ্যাপক-বিজ্ঞানীর অভাব নেই এদেশে। এমনতর অভিজ্ঞতা হয়েছে যখন অনেক ডাক্তারই তার রোগীকে বলে থাকেন " আমরা তো চেষ্টা করি মাত্র, ভাল করার হাত তো আল্লাহ্র কাছে।" জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, "আল্লাহ্র যদি হাত, তাহলে আপনার হাতে টাকা গুঁজে দেয়া কেন? মসজিদে বা পিরের দরগায় ধরনা দিলেই তো হয়।" কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করি না, পাছে ডাক্তার সাহেব রুষ্ট হন, রোগীর ক্ষতি হয়। দেশটিতে কীভাবে অন্ধবিশ্বাসের আবহ সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হচ্ছে, তা দেখলাম ঢাকা-চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে। কিছুদূর পর পরই কোরানের বাণী উৎকলিত সিমেন্টের স্ল্যাব বসানো হয়েছে রাস্তার পাশে– ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে; কোনটিতে নামাজ রোজা পালনের উপদেশ; একটিতে দেখলাম লেখা হয়েছে, "আল্লাহ্তালার হুকুম ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না .. .. ।" অথচ ধর্মব্যবসায়ীরা বলে থাকেন যে মানুষ আল্লাহতালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাকে জ্ঞান ও বিবেক দেয়া হয়েছে। এখন আল্লাহ্তালার ইচ্ছে ছাড়া যদি মানুষ তার একটি অঙ্গুলিও নাড়াতে না পারে, তাহলে সে জ্ঞানচর্চা কী করবে, স্বাধীন চিন্তা করবে কেমন করে ? আর জ্ঞানসৃষ্টির মূল চাবিই তো স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা। আর এটি আছে বলেই মানুষ অন্য জীব থেকে স্বতন্ত্র প্রাণী। অথচ ধর্মব্যবসায়ীরা কোরানের এই বাণীর মধ্যে স্ববিরোধিতা খুঁজে পান না। কোরানের আরও একটি বাণী– মহাসড়কের বাঁকে বাঁকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কল্যাণে প্রদর্শিত হচ্ছে– " আল্লাহ্তালার ইচ্ছে ছাড়া কেউ কারও প্রাণ হরণ করতে পারে না।" কী সাংঘাতিক বাণী জনে জনে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। আর এজন্যই হয়তো সরকারের এক সময়ের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল সেই ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন, "জীবন মরণ আল্লাহ্র মওদুদ, আল্লাহ্র মাল আল্লাহ্ নিয়ে গেছেন।"

ড. হুমায়ুন আজাদের খুনীরা কিংবা সাংবাদিক ও বিচারকদের হত্যাকারীরা যদি বলে যে আমাদের ইচ্ছে শক্তি নেই– আমরা তো কলের পুতুল আল্লাহ্র ইচ্ছেতেই চলি, কাজ করি– আল্লাহ্ই আমাদেরকে দিয়ে হুমায়ুন আজাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন, সাংবাদিক ও বিচারকদের হত্যা করিয়েছেন। সাক্ষ্য হিসেবে আদালতে যদি কোরানের এসব বাণী উপস্থাপন করা হয়, তাহলে মাননীয় আদালত কী করে কোরানের বাণীর বিপরীতে কাজ করবেন!

আমদের দেশের জ্ঞানপাপী বিজ্ঞানীরা আমাদের সমাজের সবচাইতে ক্ষতিকর কাজটি করছেন যখন তাঁরা বলেন– প্রাণের উন্মেষসহ মহাবিশ্ব সৃষ্টির সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য মহাপবিত্র গ্রন্থটিতে রয়েছে– আমরা মূর্খ মানুষেরা তা বুঝতে অক্ষম, আর মূর্খ মানুষদের বোঝানোর দায়িত্ব এই ধর্মব্যবসায়ী বিজ্ঞানীরা নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। অথচ আমরা কেন ভুলে যাই যে পবিত্র গ্রন্থটি এসেছে সাধারণ মানুষের জন্য। সাধারণ মানুষ যদি এর বাণী ও মর্মার্থ বুঝতে না পারে তাহলে কোরান অবতীর্ণ হওয়ার মানে থাকে না, এর মূল উদ্দেশ্যটিই অসার হয়ে পড়ে। কারণ ধর্মপ্রাণ সরল মুসলমান বিশ্বাস করে যে কোরান এমন সহজ সরল সাধারণ মানুষের জন্য লেখা যে এর মর্মার্থ বুঝতে কোন আলেম বা ব্যাখ্যাকারের প্রয়োজন নেই। কেন না ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী মনে করেন ইসলামে ৩য় কোন ব্যক্তি বা গুরুর প্রয়োজন নেই। আমরা প্রায়শ ভুলে যাই কোরান এসেছে আরবদেশের তৎকালে বিরাজিত আরববাসীর সামাজিক প্রেক্ষাপটে মুখ্যত পশ্চাদপদ অন্ধকারাচ্ছন্ন এক দল মানুষের মুক্তির বার্তা নিয়ে। তাই এখানে সহজ সরল ভাষায় তৎকালের মানুষের জ্ঞানের স্তরের কথা মনে রেখে সাধারণ মানুষের বোধ্য ভাষাতেই সৃষ্টির কথা, মানুষের জন্মের কথা, প্রাণীজগতের কথা, মহাবিশ্বেও জ্যোতিষ্কদের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। সব কিছু সৃষ্টির মূলে রয়েছে আল্লাহ্তালার মহান ইচ্ছার প্রকাশ একটি মাত্র শব্দে "হও"। আর এ কথাটিই হল অজৈব-জৈব মহাবিশ্ব সৃষ্টির পশ্চাতে আসল তত্ত্বকথা। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করে নি, তিনি স্বয়ম্ভু কালের আদিতেও ছিলেন, কালের পরও থাকবেন, স্থান সৃষ্টির আগেও ছিলেন, স্থান বিলুপ্তির পরেও থাকবেন। কোথায় থাকবেন, কেমন করে থাকবেন বিশ্বাসীদের কাছে এ প্রশ্ন অবান্তর। জ্ঞানপাপী মহাবিজ্ঞানীরা আমাদের আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে, প্রাণের

বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণবিজ্ঞানীরা বর্তমানে যা বলছে তা পবিত্র মহাগ্রন্থটির কোন না কোন সুরায় বা কোন না কোন আয়াতে বিস্তৃত রয়েছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির তত্ত্ব মহাবিস্ফোরণের (big bang) কথাও ঐ গ্রন্থে রয়েছে। বিজ্ঞান মহলে প্রাণসৃষ্টি তত্ত্বেও শেষ কথা বলা হয়েছে এমনটি দাবি করা হয় নি। কিন্তু কোরানিক বৈজ্ঞানিকেরা ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীদের অসুম্পূর্ণ তত্ত্বের সমর্থন খুঁজে পেয়েছেন ঐ গ্রন্থে। আর মহাবিশ্ব সৃষ্টি তত্ত্বেরও শেষ কথা বলার সময় এখনও হয় নি। পদার্থবিদদের কাছে এখনও দুটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা চলছে। একটি হল সাম্প্রতিক কালের মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব যা আদিতে একটি অদ্বৈত বিন্দু থেকে (singularity) যাত্রা শুরু করেছিল। আর দ্বিতীয়টি হল জ্যোতির্বিজ্ঞানী নার্লিকার-হয়েল স্থির বিশ্ব তত্ত্ব – এর কোনো সৃষ্টি কাল নেই ছিল না– অনন্তকাল ধরেই এই বিশ্ব ছিল, অনন্তকাল ধরেই এটি থাকবে, এর কোনো লয় নেই। তত্ত্ব দুটি পরস্পর বিরোধী। তবে বর্তমানে যে প্রমাণ সাক্ষ্য, প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে রয়েছে তা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের প্রতিই সমর্থন যোগাচ্ছে। তবে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নি। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের নবতর প্রমাণ ও সাক্ষ্য উপস্থিত হলে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব পরিত্যাজ্য বা পরিমার্জিত হয়ে উন্নততর তত্ত্ব উদ্ভাবিত হতে পারে, এমনকি হয়েলের তত্ত্বেও প্রত্যাবর্তনকে একেবারে নস্যাৎ করা যায় না। এ রকমটি ঘটলে জ্ঞানপাপী বিজ্ঞানীদের অবস্থা কী দাঁড়াবে ভাবা যায় না। কোরানের শাশ্বত বাণীর ভুল ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য এদেরকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

আমরা ভুলে যাই যে ধর্ম পুস্তকগুলিকে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসাবে দেখা উচিৎ, কোনো বিজ্ঞানের মহাগ্রন্থ যেখানে বিজ্ঞানের সব সত্যই পাওয়া যাবে- এ ধারণা অবশ্য পরিত্যাজ্য। তা না হলে বিশ্বাসের ভিত্তিটাই নড়ে উঠবে। বিজ্ঞান ও ধর্ম এক জিনিস নয়। দুটিকে গুলিয়ে ফেলাও ঠিক হবে না। ধর্ম বিশ্বাসের বস্তু, – এখানে যুক্তি, জিজ্ঞাসা আর অনুসন্ধিৎসার স্থান নেই। কিন্তু বিজ্ঞান যুক্তি (logic), যুক্তিবাদিতা (rationalism), জিজ্ঞাসা আর অনুসন্ধিৎসার পথ ধরে এগুতে থাকে। আর তাই বিজ্ঞানে চরম সত্য বা শেষ জ্ঞান বা পরম জ্ঞান বলে কিছু নেই। বিজ্ঞান নিয়ত নতুন সত্য উদ্ঘাটন করে – নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে অহরহ। তাই বিজ্ঞানকে কালের গণ্ডীতে বেঁধে রাখা যায় না। অথচ ধর্ম কালকে থামিয়ে দিতে চায় – কালকে বন্দী করে রাখতে চায়। তাই ধর্মগ্রন্থগুলি দাবি করে যে, যেখানে যে কথাগুলি বলা হয়েছে তা সর্বকালের জন্য, সর্বস্থানের জন্য সত্য, এবং একমাত্র সত্য। এক কথায় মহাগ্রন্থগুলির বাণীগুলি শাশ্বত – স্থানকাল অনপেক্ষ। আর এখানেই বিজ্ঞানের কৌতুহলী ও জিজ্ঞাসু মনের সাথে ধর্মের চিরশাশ্বত মনোভাবের ঘটে সংঘর্ষ। তাই সভ্যতার লগ্ন থেকেই উদার দার্শনিক ও বিজ্ঞানের মতের সাথে চার্চের ও অন্যন্য ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানকে পথ করে নিতে হয়েছে। এই সংঘর্ষে ও বৈপরীত্য দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন ও জানার অতুল আগ্রহ – ধর্মের নিষেধাজ্ঞা তাকে বিরত রাখতে পারে নি।

আমরা এখানে স্মরণ করতে চাই যে ৪০৬ বছর আগে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারিতে ইতালির তৎকালের মুক্তমনা দার্শনিক লিওনার্দো ব্রুনোকে ৬ ঘণ্টা ধরে তৎকালের চার্চের ধর্মগুরু মহামতি পোপের নির্দেশে 'ব্লাসফেমি'র অপরাধে অর্থাৎ ঈশ্বর ও চার্চের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলার অপরাধে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়। ব্রুনোর কী অপরাধ ছিল? তিনি তো নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না, খ্রিস্ট ধর্মও তিনি ত্যাগ করেন নি। তিনি সারা জীবন শুধু প্রচার করেছেন যে ঈশ্বরের কাছে সাধারণ মানুষ থেকে ঈশ্বরপুত্র যিশু বা চার্চের প্রধান ধর্মগুরু পোপ সবাই সমান – তাঁর ভালবাসা সবার জন্যই অসীম ও অপার। কিন্তু চার্চের মত ছিল যে ঈশ্বরের ভালবাসা অসীম শুধু যিশুর জন্য, পোপের জন্য, ধর্মযাজকদের জন্য – সাধারণ পাপী মানুষের জন্য ঈশ্বরানুগ্রহ দয়া ও ভালবাসা সসীম। এছাড়া ব্রুনো প্রচলিত বাইবেলে উল্লিখিত সৃষ্টিতত্ত্বীয় মতের বিরুদ্ধে নিজস্ব দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচার করতেন – পৃথিবী ও জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতিক নিয়মে, পরস্পর সম্পর্কিত বস্তুকণিকার সংশ্লেষণ-মিশ্রনে, কোনো অলৌকিক ঈশ্বরের ইচ্ছায় নয়।

ঠিক একই কারণে আধুনিক বিজ্ঞানের পথ প্রদর্শক মহাবিজ্ঞানী গ্যালিলিওকেও চার্চের হাতে সারা জীবন ধরে উৎপীড়িত হতে হয় তাঁর বৈজ্ঞানিক মতবাদের জন্য– যা ছিল চার্চের বিশ্বাস-বিরুদ্ধ। পোপ তাঁকে বাধ্য করায় এ কথা বলাতে, যে তাঁর মতবাদ ছিল মিথ্যা ও ভ্রান্ত। অত্যাচার সইতে না পেরে বৃদ্ধ গ্যালিলিও মেনে নিয়েছিলেন চার্চের নির্দেশ। ধর্মদ্রোহিতার অপরাধ নিয়ে গ্যালিলিও মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু প্রচার না করেও আমৃত্যু চালিয়ে গিয়েছিলেন বিজ্ঞান সাধনা; নিভৃতে লিখে গেছেন তাঁর আবিষ্কারের কথা। চার্চ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, বিজ্ঞানী জয়ী হয়েছেন শেষে।

অবশেষে চার্চ নতিস্বীকার করেছে ১৯৯২ সালে ৩১ অক্টোবরে একটি ঘোষণার মধ্য দিয়ে– জনসাধারণের কাছে ক্ষমা চেয়ে যে সেদিনের রোমান চার্চ ব্রুনো ও গ্যালিলিওর প্রতি, বিশেষ করে ব্রুনোর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য। ৪০৬ বছর আগে বিচারকালে সাহসের সাথে ব্রুনো পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস, যা আজও আমাদের সাহস যোগায় আমরা যারা মুক্তবুদ্ধি ও বিজ্ঞান চর্চার অনুসারী।

"আমার বিশ্বাসের কথা আপনাদের বলতে চাই না। কালই সব দিয়ে থাকে, আবার কালই সব হরণ করে। সব কিছুই পরিবর্তিত হয়, কোনো কিছুরই ধ্বংস নেই। কেবল, হ্যাঁ কেবল মাত্র একটি সত্ত্বাই অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত এবং সর্বংসহ – তা হল আমার সত্তা। এই দর্শনের বলেই আমার আত্মা উজ্জীবিত হয়, আমার মন প্রসারিত হয়। ... রাত যতই তমসাচ্ছন্ন হোক না কেন, আমি প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করব, আর যারা দিনে প্রতাপের সাথে বিচরণ করে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে রাতের তমসা ... অতএব আনন্দ কর , এবং সমগ্রকে তুলে ধরো যদি পারো, আর ভালবাসাকে ভালবাসা দাও।"

এই আমাদের পৃথিবী, এই নক্ষত্র, – এরা কেউ মৃত্যুর অধীন নয়। এবং প্রকৃতিতে কোথাও বিলীন বা ধ্বংস নেই, তা অসম্ভব; তবে কালের পথ ধরে এদের এবং এদের অংশবিশেষের পরিবর্তন ঘটে থাকে। এ্যারিস্টটল যেমন বিশ্বাস করতেন 'পরম উর্ধ বা পরম অধঃ' বলে কিছু নেই; মহাস্থানে পরম অবস্থান নেই; একটি বস্তুর অবস্থান অন্য কোন বস্তু বা বস্তুনিচয়ের সাপেক্ষে নির্ধারিত। মহাবিশ্বের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্থানে

অবিরাম ঘটছে আপেক্ষিক অবস্থানিক পরিবর্তন, আর পর্যবেক্ষক সব সময় কেন্দ্রে অবস্থিত ।" এই ছিল ব্রুনোর দার্শনিক মতবাদ ।

এর পর থেকেই বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান সাধকের কাছে ব্রুনো হয়ে উঠেছিলেন মুক্তচিন্তা আর প্রগতিশীলতার প্রতীক, – বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চার রাজ্যে আলোকবর্তিকা । শুধু কি খ্রিস্টান চার্চ ও পাদ্রীদের হাতেই মুক্তমনারা নিগৃহীত হয়েছিলেন? নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের গোঁড়াপন্থী প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতেও নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হয়েছিলেন মুক্তচিন্তার ধারক আরব বৈজ্ঞানিক ও দর্শনের পণ্ডিতেরা । মুতাজিলা নামে পরিচিত মুক্ত ও লোকায়ত দর্শনকে নির্মূল করা হয় আরবীয় জ্ঞানরাজ্য থেকে । ইসলামী বিশ্বে ইমাম গাজ্জালীর ভূমিকা ভারতীয় বৈদান্তিক দর্শনের শঙ্করাচার্যের ভূমিকার চাইতে কোন অংশে কম ক্রুর ছিল না । গোঁড়াপন্থীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আধুনিক চিকিৎসার পথপ্রদর্শক ইবনে সিনাকে (১০৩৭ খ্রিস্টাব্দ) ক্রমাগত পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে, জ্যোতির্বিদ ও ভারততত্ত্ববিদ আলবেরুনীকে (৯৭০-১০৫৮) সর্বদা গ্যালিলিওর মত নতমস্তকে মৃত্যুভয়ে জর্জরিত থেকে বিজ্ঞান ও গণিত চর্চা করতে হয়েছে । মুক্তচিন্তার ধারক জ্যোতির্বিদ-গণিতজ্ঞ ওমর খৈয়ামকে শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীলদের ভয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য বিজ্ঞান সাধনা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা পরিত্যাগ করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন আর শেষপর্যন্ত কবিতা লেখায় আত্মনিয়োগ করেছেন ।

ভারতবর্ষেও রক্ষণশীলসমাজ চার্বাক ও লোকায়ত দর্শনকে গলা টিপে হত্যা করেছে আর তাদের রচনাবলিকে চিরকালের জন্য ধ্বংস করে দিয়েছে । এ দর্শনের ছাত্র ও অনুসারীদের যুগযুগ ধরে নিপীড়ন করা হয়েছে । আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের মত জ্ঞানসাধকদের ধর্মের সাথে আপোস করে তাদের বিজ্ঞানসাধনাকে এগিয়ে নিতে হয়েছে । পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণনশীল আর্যভট্টের এই মতে বিশ্বাসী হয়েও বরাহমিহিরকে প্রকাশ্যে বলতে হয়েছে 'পৃথিবীর ঘূর্ণন তত্ত্বটি' একটি বিকল্প পথ মাত্র, আসল তত্ত্ব হল সূর্যই ঘুরছে, পৃথিবী নয়- যা প্রাচীনেরা বলে থাকেন ।' কিন্তু শেষপর্যন্ত বিজ্ঞানেরই জয় হয়েছে- সত্যকে চাপা দিয়ে রাখা যায় নি ।

রক্ষণশীল বনাম প্রগতিশীল - এই দ্বন্দ্বে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা, বিজ্ঞানীদের জ্ঞান সাধনা থেমে থাকেনি শত প্রতিকূলতার মাঝেও । চার্বাক ও লোকায়ত দর্শনকে হত্যা করা হলেও ভারতে পুনর্বার বস্তুবাদী সাংখ্য দর্শনের জন্ম হয়েছে, জন্ম নিয়েছে নাস্তিক্যবাদ, অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) ও বুদ্ধের ডাই-ইরেকটিক (অস্তি-নস্তি) দর্শন ।

বিজ্ঞান এভাবেই অগ্রসর হয় সত্যকে আবিষ্কারের আগ্রহ নিয়ে, নতুন সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে । কিন্তু বিজ্ঞানের পথ হল যুক্তির পথ, যৌক্তিকতার পথ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ । গণিত আর জ্যামিতির তীক্ষ্ণ যুক্তি তার ভিত- তার ভাষা, পর্যবেক্ষণ তার উপলব্ধি- সম্ভাব্য জ্ঞানের আকর, সংশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা তার অস্ত্র । তাই যুক্তিভিত্তিক সমাজ গড়তে হলে, সমাজ-প্রগতির পথে অগ্রসর হতে হলে, উদারনৈতিক বহুমাত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়তে হলে, বিজ্ঞান পড়তে হবে, বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে– বিজ্ঞানী না হয়েও বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মর্মবাণীগুলোকে ধাতস্থ করতে হবে, অনুধাবন করতে হবে– তবেই না আমরা লোকায়তবাদী আরজ আলী মাতুব্বরের জীবন দর্শন, তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা, সর্বোপরি এই মানবতাবাদী মানুষটির অন্তর্নিহিত বাণীকে বুঝতে পারব ।

চিত্র : আরজ আলী মাতুব্বর

আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি বিজ্ঞানের অবদান অর্থনৈতিক ব্যবধান সৃষ্টি করে মানুষে-মানুষে । বিজ্ঞান যদি দূরবর্তী আগন্তুক রূপে অশিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করে, যেমনটি আমাদের সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে তাহলে আমরা তার বাহ্যিক স্থূল অবদানকেই ব্যবহার করব, এর অন্তর্নিহিত দর্শন ও বাণীকে আত্মস্থ করতে পারব না, ফলে সমাজের অগ্রগতি হবে না, পিছিয়েই থাকবে । অর্থাৎ সুইচ টিপে বৈদ্যুতিক বাতির আলো ব্যবহার করব ঠিকই, কিন্তু জানব না কী করে বৈদ্যুতিক বাতি আলো দেয় । ফলে আমাদের অন্তর্লোক অন্ধকারেই থাকবে আলোকিত হবে না । আরজ আলী মাতুব্বর বিদ্যুৎশক্তির পরিচয় জানতে চেয়েছেন শুধু তত্ত্বগত বই পড়ে নয়, বাতি জ্বালাবার জন্য গ্রামীণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডাইনামো বানিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করেছিলেন । দর্শন মাথায় থাকে, আর বিজ্ঞান মস্তিষ্ক থেকে নেমে আসে মাঠে– সাধারণ মানুষের কল্যাণে । আরজ আলী এইটি আমাদের দেখিয়েছেন, এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, এখানেই তিনি আমাদের নমস্য ।

লৌকিক দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনের মূল কথা হল জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের মধ্য দিয়ে সত্যে উপনীত হওয়া যায়, তাই তো তিনি বলেন, 'অজানাকে জানার স্পৃহা মানুষের চিরন্তন । .. এই রকম 'কী' ও 'কেন' অনুসন্ধান করিতে করিতেই মানুষ আজ গড়িয়া তুলিয়াছে

বিজ্ঞানের অটল সৌধ।' অথচ ধর্মীয়পুস্তকগুলো আমাদের বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ রেখে জ্ঞানের স্পৃহাটিকে মেরে ফেলতে চায়। ধর্মপুস্তকে যা বলা হয়েছে তাই চরম সত্য ও পরম জ্ঞান– এর বাইরে জানার কোনো প্রয়োজন নেই কেননা তা সত্য নয়, প্রকৃত জ্ঞান নয়। আরজ আলী এই ধর্মীয়গোঁড়ামি আর অন্ধবিশ্বাস থেকে আমাদের মুক্তির পথ বাৎলিয়েছেন। এই পথ দেখানোর আলো তিনি উপহার দিয়েছেন তার প্রথম গ্রন্থ 'সত্যের সন্ধানে'র মধ্য দিয়ে। জাতির কাছে তার শ্রেষ্ঠ উপহার। সত্যের সন্ধানকে তিনি বলেছেন 'লৌকিক দর্শন'- এর অর্থ জনগণের দর্শন, ইহলোকের দর্শন। বহুশতাব্দী আগে চার্বাক ও বৃহস্পতি ইহলৌকিক বা বস্তুবাদী দর্শনের নাম দিয়েছিলেন 'লোকায়ত দর্শন'। মাতুব্বর একবিংশ শতকের দ্বার প্রান্তে এসে আমাদের জন্য নতুন করে উপহার দিলেন নতুন কলেবরে 'লোকায়ত দর্শন'। তিনি বিজ্ঞানের সারকথা সরল ভাষায় চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন, আর এর মধ্য দিয়ে ভাববাদী দর্শনের গোড়ায় আঘাত করেছেন, "মানুষের মনে জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। .. বর্তমান যুগটি বিজ্ঞানের যুগ এবং যুক্তিবাদেরও। বিজ্ঞান পৃথিবীর বুকে আত্মশক্তি বা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, কাহারও অনুকম্পায় নয়। ... আপনি যদি বিজ্ঞানের দান গ্রহণ করিতে না চাহেন, তাহা হইলে যানবাহন বিদেশ সফর ও জামা-কাপড় ত্যাগ করুন এবং কাগজ-কলমের ব্যবহার ও পুস্তক পড়া ত্যাগ করিয়া মুখস্ত শিক্ষা করুন। ইহার কোনটি করা আপনার পক্ষে সম্ভব ? ... মানুষ বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। কিন্তু সমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা হাতে ঘড়ি ও চক্ষে চশমা আঁটিয়া মাইকে বক্তৃতা করেন আর বস্তুবাদ বলিয়া বিজ্ঞানকে ঘৃণা ও বস্তুবাদী বলিয়া বিজ্ঞানীদের অবজ্ঞা করেন। অথচ তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, ভাববাদীরা বস্তুবাদীদের পোষ্য। বিজ্ঞান মানুষকে পালন করে। কিন্তু ধর্ম মানুষকে পালন করে না, বরং মানুষ ধর্মকে পালন করে এবং প্রতিপালনও। কোনো রকম গোঁড়ামীকে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রত্যেক ধর্মকে যথাসম্ভব কুসংস্কার মুক্ত করা উচিত। কুসংস্কার ত্যাগ করার অর্থ 'ধর্মকে ত্যাগ করা' নহে। যদি কেহ কুসংস্কার ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হন এবং বলিতে চাহেন যে, কুসংস্কার ত্যাগ করিলে ধর্ম থাকিবে না, তাহা হইলে মনে আসিতে পারে যে, ধর্মরাজ্যে কি কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নাই? .. .. আমাদের অভিযান শুধু অসত্য বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, কোন ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। প্রত্যেকটি ধর্ম থাকিবে মিথ্যার আবর্জনাবর্জিত ও পবিত্র সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"- এই অর্থে আরজ আলী আজকের যুগের রামমোহন, বিদ্যাসাগর। আমাদের নমস্য।

এই নতুন কথা লিখতে গিয়ে, চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে তাঁকে পাকিস্তানি স্বৈরশাসক ও রক্ষণশীল মৌলবাদীদের হাতে নিগৃহীত হতে হয়েছিল, নাস্তিকতা প্রচারের অভিযোগে সরকারের হাতে কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তিনি মৌলবাদীদের হাত থেকে রক্ষা পান। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই সত্যের সন্ধানের প্রকাশ সম্ভব হয়, নইলে এই দার্শনিককে হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যেত না। শত অত্যাচারের মুখেও তিনি আত্মসমর্পন করেননি, নিজের মতবাদকে বিসর্জন দেননি। তিনি এ যুগের ব্রুনো, যিনি ব্রুনোর আদর্শকে আর একবার তুলে ধরলেন। তিনি আমাদের চির নমস্য।

ঈশ্বরই কি সৃষ্টির আদি বা প্রথম কারণ?

অভিজিৎ রায়

বার্ট্রান্ড রাসেল তার বিখ্যাত `why i am not a Christian' প্রবন্ধে প্রথম কারণ সম্বন্ধে বলেন :

> 'আমাদের আগেই বুঝে রাখা দরকার যে জগতের যা কিছু আমরা দেখতে পাই, সব কিছুর একটি কারণ আছে। এই কারণকে প্রশ্ন করতে করতে আপনি পেছনের দিকে এগিয়ে গিয়ে অবশ্যই প্রথম কারণের (First Cause) সম্মুখীন হবেন এবং এই প্রথম কারণকেই স্বতঃসিদ্ধভাবে 'ঈশ্বর' হিসেবে ধরে নেয়া হয়। ... আমিও বহুদিন ধরেই এটিকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলাম কিন্তু একদিন, যখন আমার বয়স আঠারো, আমি জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনী পড়ছিলাম, আর পড়তে গিয়েই সেখানে এই বাক্যটি পেলাম : 'আমার বাবা আমাকে প্রশ্ন করলেন–'কে আমাকে তৈরি করেছে?' আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। কিন্তু এই প্রশ্নটি আমাকে আরও একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের দিকে ঠেলে দিল। যেটি হল ঈশ্বরই যদি আমাকে তৈরি করে থাকেন, তবে ঈশ্বরকে তৈরি করেছে কে?' আমি এখনও মনে করি 'ঈশ্বরকে তৈরি করেছে কে?' এই সহজ সরল বাক্যটি প্রথম কারণ সম্পর্কিত যুক্তির দোষটি সেই প্রথম আমাকে দেখালো। যদি প্রতিটি জিনিসের একটি কারণ থাকে, তবে ঈশ্বরেরও কারণ থাকতে হবে। আবার যদি কারণ ছাড়াই কোন কিছু থাকতে পারে (যেমন ঈশ্বর), তবে এই যুক্তি ঈশ্বরের জগতের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য'

'বিগ ব্যাং' তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক সমাজে গৃহীত হওয়ার পর পরই বিশ্বাসীদের মধ্যে নতুন করে 'প্রথম কারণ'টিকে প্রতিষ্ঠা করার নব উদ্দীপনা লক্ষ করা গেল। ১৯৫১ সালে Pope Pius XII পন্টিফিকাল একাডেমির সভায় বলেই বসলেন–

> 'যদি সৃষ্টির শুরু থাকে, তবে অবশ্যই এই সৃষ্টির একজন স্রষ্টাও রয়েছে, আর সেই স্রষ্টাই হলেন ঈশ্বর।'

জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং ধর্মযাজক জর্জ হেনরি লেমিত্রি (যিনি 'বিগ ব্যাং' প্রতিভাসের একজন অন্যতম প্রবক্তা)– পোপকে বিনয়ের সঙ্গে এ ধরনের যুক্তিকে 'অভ্রান্ত' হিসেবে প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ইদানীংকালে 'কালাম কসমলজিকাল আর্গুমেন্ট' (Kalam Cosmological Argument) নামে একটি দার্শনিক যুক্তিমালা সাধারণ বিশ্বাসীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত সুদর্শন দার্শনিক এবং পেশাদার বিতার্কিক উইলিয়াম লেন ক্রেইগ (William Lane Craig) ১৯৭৯ সালে লেখা The Kalam Cosmological Argument বইয়ের মাধ্যমে যুক্তির এই ধারাকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলেন। ধারাটিকে নিচের চারটি ধাপের সাহায্যে বর্ণনা করা যায় :

১. যার শুরু আছে, তার পেছনে একটি কারণ রয়েছে।
২. আমাদের আজকের এই মহাবিশ্বের একটি উৎপত্তি আছে।
৩. সুতরাং এই মহাবিশ্বের পেছনে একটি কারণ আছে।
৪. সেই কারণটিই হল 'ঈশ্বর'।

দার্শনিকেরা কালামের যুক্তিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন বিভিন্ন সময়েই।[১] এখানে 'বাহুল্য বিধায়' সেগুলোর পুনরুল্লেখ করা হল না। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার উল্লেখ না করলেই বোধ হয় নয়। সবকিছুর পেছনেই 'কারণ' আছে বলে পেছাতে পেছাতে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের কাছে গিয়ে হঠাৎ করেই থেমে যান। এ সময় আর তারা যেন কোন কারণ খুঁজে পান না। মহাবিশ্বের জটিলতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য যদি ঈশ্বর নামক একটি সত্তার আমদানি করতেই হয়, তবে সেই ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করার জন্য একই যুক্তিতে আরেকটি 'ঈশ্বর'কে কারণ হিসেবে আমদানি করা উচিৎ। এভাবে আমদানির খেলা চলতেই থাকবে একের পর এক, যা আমাদেরকে অসীমত্বের দিকে ঠেলে দেবে। এই ব্যাপারটি স্বাভাবিকভাবেই সকল বিশ্বাসীর কাছে আপত্তিকর। তাই তারা নিজেরাই 'সবকিছুর পেছনেই কারণ আছে' এই স্বতঃসিদ্ধের ব্যতিক্রম হিসেবে ঈশ্বরকে কল্পনা করে থাকেন আর সোচ্চার ঘোষণা করেন–'ঈশ্বরের অস্তিত্বের পেছনে কোনো কারণের প্রয়োজন নেই।' সমস্যা হল যে, এই ব্যতিক্রমটি কেন শুধু ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে কেন নয়, এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা তারা দিতে পারেন না।

দর্শন ছেড়ে এবার বিজ্ঞানের দিকে চোখ ফেরানো যাক। 'যার শুরু আছে তার পেছনে কারণ থাকতেই হবে'–কালামের যুক্তিমালার প্রাথমিক ধাপটিকে বিজ্ঞানের জগতে অনেক আগেই খণ্ডন করা হয়েছে। কারণবিহীন কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের উদাহরণ হাজির করে। আণবিক পরিবৃত্তি (Atomic Transition), আণবিক নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ের Radio Active Decay of nuclei) মতো কোয়ান্টাম ঘটনাসমূহ 'কারণবিহীন ঘটনা' হিসেবে ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকৃত। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব (uncertainty principle) অনুযায়ী

সামান্য সময়ের জন্য শক্তি (যা $E=mc^2$ সূত্রের মাধ্যমে, শক্তি ও ভরের সমতুল্যতা প্রকাশ করে) উৎপন্ন ও বিনাশ ঘটতে পারে–স্বতঃস্ফূর্তভাবে–কোনো কারণ ছাড়াই। এইসবই পরীক্ষিত সত্য। কাজেই উপরের উদাহরণগুলোই কালামের যুক্তিকে খণ্ডন করার জন্য যথেষ্ট।

আমি আমার লেখা 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' বইটিতে (মূল বইয়ের সপ্তম অধ্যায় দেখুন) তথাকথিত শূন্য থেকে কিভাবে জড় কণিকা সৃষ্টি হয়, তা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এই ধারণাটিকে সম্প্রসারিত করে বহু বিজ্ঞানীই আজ মনে করেন এক কারণবিহীন কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের (Quantum Flactuation) মধ্য দিয়ে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে পারে, যা পরবর্তীতে সৃষ্ট মহাবিশ্বকে স্ফীতির (Inflation) দিকে ঠেলে দিয়েছে, এবং আরো পরে পদার্থ আর কাঠামো তৈরির পথ সুগম করেছে। এগুলো কোন কল্পকাহিনী নয়। মহাবিশ্ব যে শূন্য থেকে উৎপন্ন হতে পারে প্রথম এ ধারণাটি ব্যক্ত করেছিলেন এডওয়ার্ড ট্রিয়ন ১৯৭৩ সালে 'নেচার' নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জার্নালে।[২] তারপর আশির দশকে স্ফীতিতত্ত্বের আবির্ভাবের পর থেকেই বহু বিজ্ঞানী প্রাথমিক কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনরে ধারণাকে স্ফীতিতত্ত্বের সাথে জুড়ে দিয়ে মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন। শূন্য থেকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ধারণা যদি অবৈজ্ঞানিক এবং ভ্রান্তই হত, তবে সেগুলো প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সাময়িকী (Scientific Journal) গুলোতে কখনই প্রকাশিত হত না। মূলত স্ফীতিতত্ত্বকে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং সবগুলোতেই এই তত্ত্ব অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়েছে।[৩]

চিত্র : আঁদ্রেলিন্দে (বায়ে) এবং এলান গুথ (ডানে); স্ফীতিতত্ত্বের দুই প্রাণপুরুষ

আসলে ইনফ্লেশন বা স্ফীতি নিয়ে আঁদ্রে লিন্ডে আর তার দলবলের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সত্যিকার অর্থেই সেই 'উত্তপ্ত বিগ ব্যাং'–যার মাধ্যমে পনের'শ কোটি বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এ মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, তাকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। কারণ, সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বিগ ব্যাং দিয়ে মহাবিশ্বের শুরু নয়, বরং মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন দিয়ে। অর্থাৎ বিগ ব্যাং এর পরে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে মহাবিশ্ব তৈরী (যা কিছুদিন আগেও সত্যি বলে ভাবা হত) হয়নি, বরং ইনফ্লেশনের ফলশ্রুতিতেই কিন্তু বিগ ব্যাং হয়েছে, তারপর সৃষ্ট হয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব। তার কথায় :[৪]

> Inflation is not a part of big-bang theory as we thought 15 years ago. On the contrary, the big-bang is the part of inflationary model

আরও মজার ব্যাপার হলো, ওই ইনফ্লেশনের ফলে শুধু যে একবারই বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ ঘটেছে তা কিন্তু নয়, এরকম বিগ ব্যাং কিন্তু হাজার হাজার কোটি কোটি এমনকি অসীম-সংখ্যকবার ঘটতে পারে; তৈরী হতে পারে অসংখ্য 'পকেট মহাবিশ্ব'। আমরা সম্ভবত এমনই একটি পকেট মহাবিশ্বে অবস্থান করছি বাকিগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত না হয়ে (এ ব্যাপারটিকে বলা হয় 'মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা[৫])। নিচের ছবিটি দেখলে লিন্ডের সাম্প্রতিক স্ফীতি তত্ত্বটি (যেটির নাম করণ করা হয়েছে Chaotic inflation) কি বলতে চাইছে এ সম্বন্ধে হয়ত কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

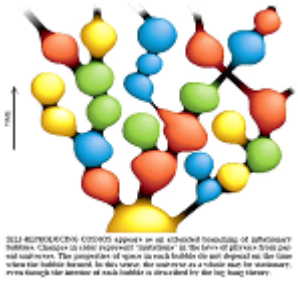

দেখা যাচ্ছে, এ তত্ত্ব অনুযায়ী কেওটিক ইনফ্লেশনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (expanding Bubbles) এবং প্রতিটি সম্প্রসারিত বুদ্বুদই আবার জন্ম দিয়েছে এক একটি 'বিগ ব্যাং'-এর। আর সেই এক একটি বিগ-ব্যাং পরিশেষে জন্ম দিয়েছে এক একটি পকেট মহাবিশ্বের। আমরা এ ধরনেরই একটি পকেট মহাবিশ্বে বাস করছি। এ তত্ত্ব আজ অনেকের মাঝেই তৈরি করেছে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা' এক সর্বজনীন দার্শনিক আবেদনের, এ মহাবিশ্ব যদি কোনো দিন ধ্বংস হয়ে যায়ও, জীবনের মূল সত্তা হয়ত টিকে থাকবে অন্য কোনো মহাবিশ্বে, হয়ত অন্য কোনো ভাবে, অন্য কোন পরিসরে।

লিন্ডের মতে এ তত্ত্বের সমাধানটি এতটাই সরল যে, এর আগে এটি বিজ্ঞানীদের মাথায় কেন আসে নি, তা ভেবে লিন্ডে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অ্যালেন গুথ যাকে 'ইনফ্লেশন তত্ত্বের জনক' হিসেবে অভিহিত করা হয়, তিনি তার দ্য ইনফ্লেশনারি ইউনিভার্স বইয়ে বিশ্বসৃষ্টিকে একটি 'আলটিমেট ফ্রি লাঞ্চ' হিসেবে অভিহিত করে বলেন :

> `Most Important of all, the Question of the Origin of the matter in the Universe is no longer thought to be beyond of science. ...If inflation is correct, then the inflationary mechanism is responsible for creation of essentially all the matter and energy in the Universe. ...After two thousand years of scientific research, it now seems likely that Lucretius (who said `Nothing can be created from nothing') was wrong Conceivably, everything can be created from nothing. And `everything' might include a lot more than what we can see. In the context of inflationary cosmology, it is fair to say that Universe is the ultimate free lunch!'

অনেক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরাই মনে করেন, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের ধারণার সাথে সমন্বিত করা ইনফ্লেশন তত্ত্ব যখন একেবারে শূন্য থেকে বিশ্বসৃষ্টির একটি প্রাকৃতিক এবং যৌক্তিক সমাধান দিতে পারছে, তখন ঈশ্বর সম্ভবত একটি 'বাড়তি হাইপোথিসিস' ছাড়া আর কিছু নয়।

তারপরও একটি কথা বলা যায়, বিজ্ঞান কিন্তু কোনো বিষয় সম্পর্কে পরম বা নিখুঁত জ্ঞান দিতে পারে না। আজকে আণবিক স্থানান্তর, নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বা কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মত ঘটনার কারণ পাওয়া যাচ্ছে না, ভবিষ্যতে পাওয়া যেতেই পারে। কেউই সে সম্ভাবনাকে অস্বীকার করছে না। ভবিষ্যতে পাওয়া যেতে পারে মহাবিশ্ব সৃষ্টির 'আদি' কারণও। কিন্তু সেই কারণটি যে 'ঈশ্বরের মত মহাপরাক্রমশালী 'সত্তা'ই হতে হবে, এটি ভেবে নেওয়ার কোন যৌক্তিক কারণ নেই, বরং কারণটি হতে পারে সম্পূর্ণভাবেই 'প্রাকৃতিক'। ওয়েস মরিসন তার `Must the Begining of the Universe Have a Personal Cause? A critical Examination of the Kalam's Cosmological Argument' এ বলেন–

> 'সৃষ্টির সব কিছুর পেছনেই কারণ আছে–এ ব্যাপারটি ধ্রুব সত্য নয়। আর যদিও বা ইতিহাসের পরিক্রমায় কখনও বের হয়ে আসে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে একটি 'আদি' কারণ রয়েছেই, তবুও একথা ভেবে নেওয়ার কারণ নেই যে, সেই আদি কারণটি 'ঈশ্বরের মত একটি ব্যক্তি সত্ত্বাই হতে হবে।'

মুক্তমনা পদার্থবিদ ড. ভিক্টর স্টেংগরও একই ধরনের মত ব্যক্ত করে বলেন–

> `Note that even if Kalam Conclusion were sound and Universe has a cause, why could that cause itself not be natural? As it is, Kalam Argument fails both empirically and theoretically.'

টিকা :

১. উৎসাহী পাঠকেরা www.mukto-mona.com (World of science & rationalism page) এবং www.infidels.org. ওয়েব সাইট দুটি দেখতে পারেন।

২. Is the Universe a Vacuum Fluctuation? Edward P. Tryon, Nature, Vol. 246. pp369-397(1973)

৩. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন- The Inflationary Universe : The Quest for a New Theory of Cosmic Origins, Alan H. Guth, Perseus Books Group (March 1, 1998)

৪. Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998.

৫. মাল্টিভার্স নিয়ে মাসিক সায়েন্স ওয়ার্ল্ডের অক্টোবর এবং ডিসেম্বর '০৬ সংখ্যায় আমার দুটি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মানুষের বিবর্তন

বন্যা আহমেদ

ধরুন, দেড় দুই লক্ষ বছর আগে কোনো এক বুদ্ধিমান মহাজাগতিক প্রাণী, আমাদের কল্পনার সেই উড়ন্ত সসারে করে পৃথিবীতে পদার্পণ করল। সেই সময়ে আফ্রিকার এক কোণে ঘুরে বেড়ানো আমাদের আধুনিক মানুষের প্রজাতি *Homo sapiens* দের দেখে কী ভাবতো তারা? তারা কি বিবর্তনের পরিক্রমায় এই পৃথিবীতে আমাদের টিকে থাকা নিয়ে কোন বড়সড় বাজি ধরতে রাজি হত? তারা কি ভুলেও কল্পনা করতে পারতো যে এই প্রজাতিটিই খুব নিকট ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীটাকে দখল করে নেবে? চারদিকের নির্মম প্রকৃতির সাথে টেক্কা দিয়ে টিকে থাকার জন্য কী আছে তাদের? প্রয়োজনীয় কিছুই নেই–থাবা নেই, ধারালো দাঁত নেই, শিং বা লোম কিছুই নেই, অত্যন্ত দুর্বল দেখতে অদ্ভুত এক দ্বিপদী প্রাণী! জানি, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মতই শোনাচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটাকে ঠিক উড়িয়েও তো দেওয়া যায় না। এখন তাহলে প্রশ্ন করতে হয়, সে অবস্থা থেকে আমরা টিকে গেলাম কী করে?

শুধু টিকে গেছি বললেও তো ভুল বলা হবে–মাত্র দেড়-দুই লাখ বছরে ফুলে ফেপে সংখ্যা ছয়শো কোটি তো ছাড়িয়ে গেছিই, পৃথিবীব্যাপী প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছি, ইদানীংকালে আবার পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে মহাবিশ্বের দিকেও দিয়েছি হাত বাড়িয়ে। কিন্তু কী করে সম্ভব হল সেটা? বৈচিত্র্যময় এই বিশাল প্রকৃতিতে আমরা কি আসলেই অনন্য? এর উত্তর তো সোজাসাপ্টা 'হ্যা' ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। মানুষ এই প্রকৃতিরই অংশ, অন্যান্য প্রাণীর মতই লাখ লাখ বছর ধরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায়ই তার উৎপত্তি ঘটেছে। কিন্তু বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াতেই মানুষের মধ্যে অনন্যসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটেছে যা প্রকৃতিতে সেভাবে আগে কখনও ঘটেনি। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় যে কী ধরনের অভিনব এবং জটিল বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি ঘটতে পারে তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছি আমরা। বর্তমানে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক (তিনি এমআইটি'র মস্তিস্ক এবং বৌদ্ধিক বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, ভাষা, ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং তার সাথে বিবর্তনবাদের সম্পর্ক, মানুষের মন, সচেতন জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবষণার জন্য বিখ্যাত) স্টিভেন পিঙ্কার এক সাক্ষাৎকারে মজা করে বলেছিলেন, 'হুট করে দেখলে মানুষের বিবর্তনকে তো অসাধারণ বলেই মনে হয়। যে পদ্ধতি থেকে শামুক, বট গাছ বা মাছের মতো জীবের জন্ম হয় তা থেকেই কী করে আবার চাঁদে পৌঁছে যাওয়া, মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়া বা ইন্টারনেটের জন্মদাতা এমন এক বুদ্ধিমান প্রাণীর উৎপত্তি ঘটতে পারে? তাহলে কি কোন স্বর্গীয় স্পর্শ আমাদের মস্তিস্ককে বিশেষভাবে তৈরি করেছিল? না, আমি তা মনে করি না, কারণ ডারউইনের দেওয়া প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া দিয়েই মানুষের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।'

মানুষের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে দু'টির কথা তো চোখ বন্ধ করেই বলা যায় : মানুষ একমাত্র প্রাণী যে দুই পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে শিখেছে, আর ওদিকে আবার খুব অসাধারণ রকমের বড় মস্তিস্কেরও বিবর্তন ঘটেছে যা অন্য কোন প্রাণীতে ঘটতে দেখা যায় নি। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অত্যন্ত সুপরিচিত জীববিজ্ঞানী, এডওয়ার্ড উইলসনের গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০ লক্ষ বছর আগে থেকে শুরু করে আড়াই লাখ বছর আগে পর্যন্তও আমাদের মস্তিস্কের আকার প্রতি এক লাখ বছরে প্রায় এক চামচের সমান করে বেড়েছিলো।[1] বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ধীরগতিতে হলেও এখনও আমাদের মস্তিস্কের বিবর্ধন ঘটে চলেছে। আমাদের মস্তিস্কের যে অংশটি আমাদের বুদ্ধিমত্তার সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সেই সেরিব্রেল করটেক্স কে যদি টেনে ফ্ল্যাট করে বিছিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে তা চার পৃষ্ঠা জুড়ে জায়গা করে নিচ্ছে। আমাদের সবচেয়ে কাছের পূর্বসূরি শিম্পাঞ্জীদের সেরিব্রেল করটেক্স নেবে মাত্র এক পাতার সমান জায়গা, বানরেরটা নেবে একটি পোস্টকার্ডের সমান আর ইঁদুরের ক্ষেত্রে তা নেবে মাত্র একটা স্ট্যাম্পের সমান জায়গা।[২]

পার্থক্যটা চোখে পড়ার মতই, তাই হয়তো সাফল্যের পাল্লাটাও বেশ ভারী। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, উহু!, মস্তিস্কের আকারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেটাই বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়! তাহলে তো আমাদের মত বড় মস্তিস্কের অধিকারী নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির মানুষরাও একই রকম সাফল্য অর্জন করতে পারতো–তাদের মত প্রজাতির তো তাহলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা নয়। একদিকে মস্তিস্কের বিকাশ, অন্যদিকে ঘটেছে ভাষার উৎপত্তি ও ব্যবহার, আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে ঘটেছে সাংস্কৃতিক বিবর্তন এবং বিকাশ ঘটেছে জটিল এক সামাজিক ব্যবস্থার। মানুষের বিবর্তনে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যা হয়তো অন্য কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে সেভাবে প্রয়োজ্য নয়। এখানেই তো শেষ নয়, গত কয়েক লক্ষ বছরে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকা পরিবেশগত পরিবর্তনের ব্যাপারটাকেও তো এই সমীকরণ থেকে বাদ দিয়ে দিলে চলবে না। এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে টিকে থাকার জন্য মানুষ যত নতুন ভাবে অভিযোজিত হয়েছে বিবর্তনের নিয়মে ততই বিকশিত হয়েছে তার নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য।

আমরা জানি যে, এই মহাবিশ্ব প্রায় ১৪শ' কোটি বছর আগে সৃষ্টি হলেও আমাদের এই বুড়ো পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে প্রায় সাড়ে ৪শ' কোটি

বছর আগে। এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, প্রাণের জন্ম হতে লেগে গিয়েছিলো আরও প্রায় একশো কোটি বছর। আর মানুষের উৎপত্তি? সে তো সে দিনকার কথা! আদিম এককোষী প্রাণ, ব্যাকটেরিয়া, বহুকোষী প্রাণী, অ্যালজি, অমেরুদণ্ডী প্রাণী, বিভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণীর উৎপত্তি, বিকাশ বা বিলুপ্তির ধাপ বেয়ে, বিবর্তনের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মানুষের আদি পূর্বপুরুষদের উদ্ভব ঘটলো মাত্র ৫০-৬০ লাখ বছর আগে। সে সময়ে মানুষ এবং অন্যান্য বনমানুষের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কিছু প্রজাতিরা পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াত শিখলেও তার থেকে আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষদের উদ্ভব ঘটতে লেগে গেছে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ বছর। আর আমাদের নিজেদের প্রজাতি অর্থাৎ *Homo Sapiens* দের গল্পের শুরু তো সেদিন, মাত্র দেড় দুই লাখ বছর আগে। ভূতাত্ত্বিক নিয়মে হিসাব করলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের ব্যাপারটা এক্কেবারেই আনকোরা। শুধু তো তাইই নয়, বিবর্তনের ধারায় যেমন অগুনতি জীবের উৎপত্তি ঘটেছে ঠিক তেমনি তাদের একটা বড় অংশ বিলুপ্তও হয়ে গেছে। একইভাবে আমরা ফসিল রেকর্ড থেকে দেখতে পাই যে, মানুষেরও বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে, আবার আমাদের প্রজাতি ছাড়া বাকিরা বিলীন হয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায়। বিবর্তনের ইতিহাসে অনিয়শ্চতার তো কোনো শেষ নেই, ডাইনোসরের মত অতিকায় প্রাণী বহুকাল ধরে পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করেও শেষপর্যন্ত হারিয়ে গেছে। সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ভয়ঙ্কর কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মহাপরাক্রমশালী ডায়নোসরগুলো বিলুপ্ত হয়ে না গেলে সেই সময়ের অত্যন্ত নগন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলো হয়তো এত বিকশিত হতে পারতো না। অর্থাৎ, অন্যান্য প্রাণীর মতই আমাদের উদ্ভবও তো কোনো পূর্ব নির্ধারিত ব্যাপার নয়। প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী এবং ফসিলবিদ স্টিফেন জে. গুলড তাই বলেছিলেন, 'মানুষ আগে থেকে নির্ধারিত বিবর্তনের কোন ধারার শেষ ফসল নয় বরং মানুষ হচ্ছে আকস্মিকভাবে উদ্ভুত মহাজাগতিক এক অনুচিন্তার ফলাফল। বিশাল শাখা প্রশাখাসহ যে প্রাণবৃক্ষের বিবর্তন ঘটেছে মানুষ হচ্ছে তার একটা ছোট্টো শাখামাত্র। এরকম নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এই গাছের বীজটাকে যদি আবার নতুন করে বপন করা হয় তাহলে এই শাখাটা আবার একই রকমভাবে একই জায়গায় জন্ম নেবে না।'[৩]

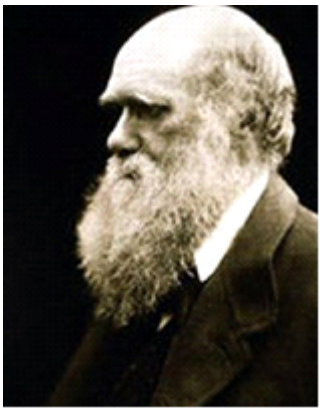

চিত্র : চার্লস ডারউইন

আমরা জানি যে, ষোড়শ শতাব্দীতে এসে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণাটা হাজার বছর ধরে টিকে থাকা মধ্যযুগীয় ধর্মীয় এবং সামাজিক স্থবিরতার ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরও তো প্রায় কয়েকশ বছর লেগে গিয়েছিল সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে। আমরা জানি কিভাবে বহু বাঁধাবিঘ্ন পেরিয়ে জীববিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেরিয়ে এসেছিলো সেই 'প্রজাতির পৃথক পৃথক সৃষ্টি' এবং স্থির প্রজাতির মতবাদের ভ্রান্তি থেকে! প্রথমবারের মতো আমরা জানতে পেরেছিলাম আমাদের উৎপত্তি এবং বিকাশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা। তারপর প্রায় দেড়শো বছর কেটে গেছে, বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক শাখাগুলো প্রতিদিনই আরও জোরালোভাবে এই বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতা প্রমাণ করে চলেছে, কিন্তু প্রাচীন চিন্তার অচলায়তন ভেঙে আমাদের সমাজে তা কিন্তু এখনও জায়গা করে নিতে পারেনি। পৃথিবীতে যে গুটিকয়েক তত্ত্ব সমস্ত পুরোনো ঘুণে ধরা রক্ষণশীল ভ্রান্ত চিন্তা ভাবনা ও প্রথাকে সমূলে আঘাত করেছে তার মধ্যে বিবর্তনবাদ অন্যতম। তাই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধেরও মাত্রাটা যে একটু বাড়াবাড়ি রকমের বেশি হবে তা তো জানা কথাই। মানব সভ্যতার সমগ্র ইতিহাস জুড়েই আমরা এর পুনরাবৃত্তি দেখে এসেছি। অন্যান্য জীবের বিবর্তন নিয়ে কথা বললে যাও বা ঠিক আছে, কিন্তু মানুষের বিবর্তনের প্রসঙ্গ আসলেই আমাদের মাথায় যেনো আকাশ ভেঙে পড়ে। সেই ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন এবং অ্যালফ্রেড ওয়ালেস যখন প্রথম বিবর্তনের তত্ত্বটি প্রস্তাব করলেন তখন চার্চের বিশপের স্ত্রী মুখ থেকে যে আতঙ্কবাণী বের হয়ে এসেছিলো, তা যেনো আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। তিনি আর্তনাদ করে বলেছিলেন,[৪] 'বনমানুষ থেকে আমাদের বিবর্তন ঘটেছে! আশা করি যেনো এটা সত্যি না হয়, আর যদি তা একান্তই সত্য হয়ে থাকে তবে চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি সাধারণ মানুষ যেনো এটা কখনই জানতে না পারে!' সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সত্যকে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা তো আর নতুন কিছুই নয়। এখনও বিশ্বব্যাপী সেই চেস্টার যেন কোনো কমতি নেই!

ডারউইন প্রথমে তার 'প্রজাতি উৎপত্তি' বইটিতে মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে তেমন কিছুই বলেন নি (শুধু বলেছিলেন, 'Light will be thrown on the origin of man and his history'); সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার এই নিশ্চুপতার কারণটা বোঝা তেমন কঠিনও নয়। ১৮৫৭ সালে জার্মানির ডুসেল নদীর উপত্যকায় নিয়েন্ডারথাল নামক জায়গায় বেশ কিছু আদিম মানুষের করোটি আবিস্কৃত হয়।

তখন জার্মানির প্রখ্যাত অধ্যাপক স্কাফ হাউসেন ফসিলগুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রস্তাব করেন যে, এগুলো আসলে মানুষের কোনো বিলুপ্ত আদিম প্রজাতির হাড়গোড়। এদের নাম দেওয়া হয় নিয়েন্ডারথাল মানুষ।[৫] তখনকার শিক্ষিত সমাজ কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করেননি। ওদিকে ডারউইনের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং বিজ্ঞানী টি এইচ হাক্সলি সে সময়ই মানুষের বিবর্তনের বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং এপ বা বন মানুষের সাথে মানুষের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলো তুলে ধরে ১৮৬৩ সালে *`Evidence as to Man's Place in Nature'* নামক বইটি প্রকাশ করেন। এর পর ডারউইন যখন *`The Descent of man and selection with respect to Sex'* বইটি বের করেন ততদিনে মানুষের বিবর্তনের বিষয়টি বুদ্ধিজীবীমহলে মোটামুটিভাবে সুপরিচিত হয়ে গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জার্মানি বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেল তার বিখ্যাত 'সৃষ্টির ইতিহাস' বইয়ে লিখেছিলেন যে, বনমানুষ থেকে মানুষের বিবর্তন যদি সত্যিই ঘটে থাকে তবে মানুষও নয় আবার ঠিক বনমানুষও নয় এমন ধরণের মধ্যস্থিত ফসিল পাওয়া যাবে। তিনিই প্রথম বিবর্তনের মধ্যবর্তী অবস্থার এরকম ফসিলগুলোকে হারানো যোগসূত্র বা `missing link' বলে আখ্যায়িত করেন।[৬] তার কথাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে– গত একশো বছরে এমন অসংখ্য ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে যা থেকে মানুষ এবং বনমানুষের মধ্যবর্তী অবস্থার বিবর্তনের ধাপগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু তো তাইই নয়, এ থেকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন সময়ে আমাদের প্রজাতির *(Homo sapiens)* মানুষ ছাড়াও আরও অন্যান্য প্রজাতির মানুষও বিচরণ করেছে, এমনকি অনেক সময় একাধিক প্রজাতির মানুষ একই সময়ে তাদের সম্মিলিত পদচারণায় মুখরিত করে তুলেছে আমাদের এই ধরনী। এই মুহূর্তে আমরা ছাড়া আর কোনো মানব প্রজাতির অস্তিত্ব না থাকলেও অতীতে যে তা ছিলো তা নিয়ে কিন্তু দ্বিমত প্রকাশের কোনো অবকাশই আর নেই।

গত একশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা মানুষ এবং এপের মধ্যবর্তী স্তরের যে সমস্ত ফসিল খুঁজে পেয়েছেন তা থেকে মানব বিবর্তনের একটা পরিস্কার চিত্র পাওয়া কিন্তু আর কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। এখন সমস্যাটা আর 'যথেষ্ট পরিমাণে ফসিল পাওয়া যাচ্ছে না' তা নয় বরং ঠিক তার উলটো। এত রকমের মানুষের পূর্বপুরুষের প্রজাতির এবং তাদের মধ্যবর্তী স্তরের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে যে তাদেরকে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঠিক ঠাক মত শ্রেণীবিন্যাস করাটাই বিজ্ঞানীদের জন্য এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেলের মনোবাঞ্ছা যে এভাবে পূরণ হবে তা হয়তো তিনি নিজেও আশা করেননি। তার ওপরে আবার গত কয়েক দশকে ডেটিং পদ্ধতির যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে তার ফলে ঠিকভাবে ফসিলের বয়স এবং প্রকৃতি নির্ধারণ করার ক্ষমতাও বেড়ে গেছে বহুগুণ।

এছাড়া মানুষ এবং এপের দৈহিক গঠনের তুলনামূলক বিচার থেকেও বহু তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের সাথে এপের পার্থক্যগুলো যত বেশি না পরিমাণগত, তার চেয়ে অনেক বেশি গুণগত। মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রকমের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আকার বিশেষত মস্তিস্কের আকার মানুষের অনেক বড়, বন মানুষের সাথে তাদের হাত এবং পায়ের আকারের অনুপাতেও পার্থক্য রয়েছে, গায়ের লোম পড়ে গেছে অনেকাংশেই, চামড়ার রঞ্জকবস্তু এবং বুড়ো আঙুল নাড়াবার ক্ষমতাও মানুষের অনেক বেশি। আগে মানুষের সাথে বনমানুষের পার্থক্যকে যত বড় বলে মনে করা হত আধুনিক গবেষণার ফলে তা ক্রমশঃ যেন কমে আসছে। অনেকেই এখনও ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়েন (Richard Owen, 1804-1892) এর বলা কিছু ভুল তথ্যকে সত্য বলে মনে করে বসে আছেন– ওয়েন মনে করেছিলেন যে, তিনি মানুষ এবং বনমানুষের মধ্যে বিশাল এক পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে মানুষ এবং বনমানুষ একই পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে আসেনি। তিনি বলেন মানুষের মস্তিস্কে হিপোক্যাম্পাস নামের একটি বাড়তি উপাঙ্গ রয়েছে যা কি না বনমানুষের মধ্যে নেই। কিন্তু ডারউইনের বন্ধু টি এইচ হাক্সলি তখনই তা ভুল প্রমাণ করেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষ এবং এপ দুই গ্রুপের মধ্যে এই উপাংগটির অস্তিত্ব রয়েছে।

এতো গেলো একটা দিক, অন্যদিকে জেনেটিক্স এবং জিনোমিক্সের আধুনিক গবেষণা এবং পর্যালোচনাকে বাদ দিলে তো বিবর্তনের গল্প বলাই এখন আর সম্ভব নয়। গত দুই তিন দশকে বিজ্ঞানের এই শাখাটি বিবর্তনবাদ এবং মানুষের বিবর্তনের পক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী সব তথ্য এবং সাক্ষ্য হাজির করেছে যার সাথে অঙ্গস্থানবিদ্যা এবং ফসিলবিদ্যা থেকে আলাদা আলাদাভাবে পাওয়া তথ্যগুলো প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। আর দুএক জায়গায় যেখানে অমিল বা সংশয় ধরা পড়ছে সেখানে বিজ্ঞানীরা সুযোগ পাচ্ছেন আরও নতুন নতুন গবেষণার মাধ্যমে ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার। বিজ্ঞানের তিনটি শাখা থেকে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া এই সম্মিলিত তথ্যগুলো বিবর্তনবিদ্যাকে অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। গত কয়েক দশকে আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের বিভিন্ন আবিস্কারগুলো প্রাণের বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে এক নতুন পর্যায়ে উত্তোরিত করেছে। চলুন খুব সক্ষেপে দেখা যাক আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় আমাদের নিজেদের বিবর্তনের গল্পটা এখন কীরকম শোনাচ্ছে।

বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স তার `Unweaving the Rainbow' বইতে বলেছিলেন যে, ডিএনএ হচ্ছে 'মৃতের জেনেটিক বই'–আমাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাসের রোজনামচা যেন তারা। বিবর্তনবিদ্যা বলে যে, জীবের শরীরের সবকিছুই তার পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আর এদিকে ডিএনএ'র মধ্যে বিস্তারিতভাবে লেখা রয়েছে সেই কাহিনীর পূর্ণ ধারাবাহিক বিবরণী–কখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা

কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে, কোন পরিবেশে টিকে থাকার জন্য যুদ্ধ করেছে, প্রজননের ইতিহাস থেকে শুরু করে কোথায় কখন কোন মিউটেশন তাদের বিবর্তনের গতিকে নিয়ে গেছে নতুন দিগন্তে–সবকিছু লেখা আছে আমাদের ডিএনএ-র ভিতরে। প্রজননের মাধ্যমে পরের প্রজন্ম তৈরির ধারাবাহিকতা যদি ছিন্ন না হয় তাহলে ডিএনএ-এর ভিতরে লেখা তথ্যগুলো এক অণু থেকে আরেক অণুতে, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। প্রতিটি জীব তার দেহকোষের ভিতরে হাজার লক্ষ এমনকি কোটি বছর ধরে এই ঐতিহাসিক তথ্য বয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা মোটে গত কয়েক দশক ধরে আণবিক জীববিদ্যার প্রভূত অগ্রগতিরে ফলে সঠিকভাবে ডিএনএর ভিতরে লেখা এই তথ্যগুলো পড়তে এবং বুঝতে শুরু করেছি। ড. রিচার্ড ডকিন্স মনে করেন যে পৃথিবীতে যদি একটাও ফসিলের অস্তিত্ব না থাকতো, বা কেউ যদি তাদেরকে কোন ম্যাজিক করে উড়িয়ে দিত, তাহলেও পৃথিবী জোড়া জীবের বিস্তৃতির প্যাটার্ণ এবং তাদের জেনেটিক তথ্য থেকেই সম্পূর্ণ বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব হতো।[৭] কথাটা শুনতে অতিরঞ্জণ বা ঔদ্ধত্য বলে মনে হলেও, আজকে একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দাঁড়িয়ে, আণবিক জীববিদ্যার সাম্প্রতিক আবিস্কারগুলোকে একটু মনযোগ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেই বোঝা যায় যে, কথাটা আদৌ মিথ্যা নয়।

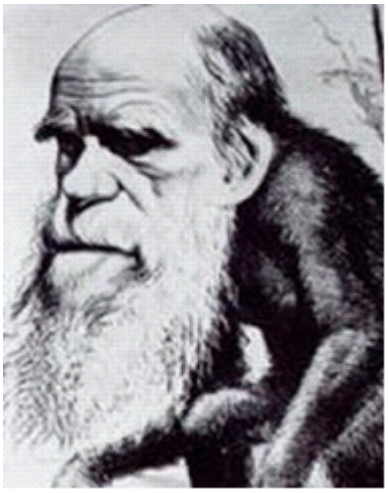

মানুষের জিনোমের সিকোয়েন্সিং বা অনুক্রমের ঐতিহাসিক প্রথম খসড়াটি প্রকাশিত হয় ২০০১ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এই প্রজেক্টে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৩ সালে এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়।[৮] এর কিছুদিন পরেই, ২০০৫ সালে, আমাদের বিবর্তনের ইতিহাসে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শিম্পাঞ্জির জিনোমও পড়ে শেষ করা হয়। (এদিকে আবার গত কয়েক বছরে ইঁদুর, মৌমাছি, ইস্টসহ বেশ কয়েকটি জীবের জিনোমের অনুক্রমও বের করা হয়েছে, www.ncbi.nih.gov/Genbank বা www.genome.ucsc.edu ওয়েব সাইটগুলোতে এখন মানুষ এবং শিম্পাঞ্জিসহ বিভিন্ন জীবের জিনোমের অনুক্রমের বিস্তারিত তথ্য রাখা আছে)।[৯] পৃথিবী জোড়া ৬৭ জন বিজ্ঞানী এই শিম্পাঞ্জি সিকোয়েন্সিং এ্যন্ড এ্যনালিসিস কনসোরটিয়ামে অংশগ্রহণ করেন, নেচার জার্নালের ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর ইস্যুতে মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির জিনোমের তুলনামুলক বিশ্লেষণের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয়।[১০] ন্যাশনাল হিউম্যান জিনোম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (NHGRI) এর ডিরেকটর ফ্রান্সিস কলিন্স এর মতে, এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস, শারীরিক গঠন, বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখের উৎপত্তি বুঝতে হলে বিবর্তনের ধারায় উদ্ভুত এবং অত্যন্ত কাছাকাছি সম্পর্কিত বিভিন্ন জীবের জিনোমের সাথে আমাদের জিনোমের তুলনামূলক ব্যাখ্যা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের জিনোমের পরীক্ষার সাথে ফসিল রেকর্ড এবং শারীরবিদ্যার তুলনামূলক ব্যাখ্যা থেকে বিজ্ঞানীরা আগে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে যা ভেবেছিলেন তা প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। এদের বর্তমান জিনোমের মধ্যে সাদৃশ্য প্রায় ৯৯% এবং তাদের প্রোটিনের গঠনও খুবই কাছাকাছি। ডিএনএ-র সন্নিবেশন (Insertion) এবং বিলুপ্তি (Deletion) হিসাব করলে এই সাদৃশ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬%এ। প্রোটিন লেভেলে বিচার করলে দেখা যায় যে তাদের ২৯% জিন একই প্রোটিনের কোডিং এ নিয়োজিত। অর্থাৎ দুটো মানুষের ডিএনএ' তুলনা করলে যে পার্থক্য দেখা যাবে, একটা মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির মধ্যে সে পার্থক্যটা মাত্র ১০ গুণ বেশী, কিংবা ধরুন ইঁদুরের সাথে মানুষের যে পার্থক্য তার তুলনায় শিম্পাঞ্জির সাথে পার্থক্য ৬০গুণ কম![১১] বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন যে, মানুষ এবং শিম্পাঞ্জিতে কিছু কিছু জিন অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর তুলনায় ক্রমাগতভাবে দ্রুতগতিতে বদলে যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে শব্দ শোনা এবং বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় জিন,

ায়ূতন্ত্রের সংকেত আদান-প্রদানের জিন, শুক্রাণু তেরির জিনসহ আরও কয়েকটি জিন। এদিকে আবার দেখা যাচ্ছে যে, বিবর্তনের ধারায় মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির ডিএনএ'তে ইঁদুর বা খরগোশের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ক্ষতিকর মিউটেশন ঘটেছে। তার ফলে একদিকে যেমন তাদের অসুখের পরিমাণ বেড়েছে কিন্তু অন্যদিকে আবার তা তাদেরকে পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হতে বাড়তি সুবিধা করে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা মানুষের জিনোমের এই ধরনের মিউটেশনগুলো আরও খতিয়ে দেখছেন। শিম্পাঞ্জি, অন্যান্য প্রাইমেট বা অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর সাথে আমাদের মিলগুলো বোঝা যেমন দরকার ঠিক তেমনিভাবেই গুরুত্বপূর্ণ এদের সাথে আমাদের পার্থক্যগুলো সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারা। তাহলেই হয়তো আমরা বলতে পারবো কোন কোন পরিবর্তনগুলোর ফলে আমরা মানুষে বিবর্তিত হয়েছি, কিংবা ঠিক কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে আমরা তাদের থেকে বুদ্ধিমত্তায় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এত আলাদা হয়ে গেছি। ইতোমধ্যেই আমরা এই ধরনের বিশ্লেষণ থেকে এমন কিছু কিছু তথ্য জানতে পেরেছি যা আমাদের স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারে। যেমন ধরুন, দেখা যাচ্ছে যে, শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের সাধারণ পূর্বসুরি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর মানুষ Caspase-12 নামক জিনের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে যার ফলেই সে এখন আলজাইমারস বা স্মৃতিভ্রংশ (Alzheimer's) রোগে আক্রান্ত হয়। এখন আমরা যদি শিম্পাঞ্জির মধ্যে এই জিনের কাজগুলোকে ঠিকমতো বুঝতে পেরে আমাদের শরীরে মধ্যে তার প্রয়োগ ঘটাতে পারি তাহলে হয়তো এই মারাত্মক রোগটির একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিভিন্ন রোগের সাথে আমাদের জেনেটিক গঠনের বিবর্তনের ইতিহাস যে কী ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তা এখন ধীরে ধীরে আমাদের সামনে পরিস্কার হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

গত শতাব্দীর প্রথম দিকে কিন্তু মানুষের তেমন কোন মধ্যবর্তী ফসিলের সন্ধান পাওয়া যায়নি, অনেকেই তখন মনে করতেন যে, মানুষ হয়তো অন্যান্য বনমানুষের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো প্রায় ৫ কোটি বছর আগে। তারপর ধীরে ধীরে যখন আরও অনেক ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করলো, এদিকে আবার বিজ্ঞানীরা মানুষের সাথে ওরাং ওটাং, গরিলা, শিম্পাঞ্জির মিলগুলো আরও ভালো করে বুঝতে শুরু করলেন তখন মনে করা হয় যে, হয়তো দেড় কোটি বছর আগে মানুষের বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিলো। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডিএনএর আবিস্কারের পর আমাদের সামনে আণবিক জীববিদ্যার গবেষণার দুয়ার খুলে যায়। সত্তরের দশকে মানুষ এবং অন্যান্য বনমানুষের প্রোটিনের এমাইনো এসিডের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, বিবর্তনের যাত্রায় মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা ৫০ লক্ষ বছরের বেশি পুরোনো হতে পারে না। এদিকে আবার গত তিরিশ, চল্লিশ বছরে ফসিলবিদেরা আফ্রিকা থেকে মানুষের 'আধা' এবং 'সম্পূর্ণ' আদিপুরুষদের যে সব ফসিল খুঁজে পেয়েছেন তা থেকেও কিন্তু আমরা এখন একই ধরণের তথ্য পেতে শুরু করেছি। আর এদিকে আজকের জিনোমিক্সের অত্যাধুনিক গবেষণা থেকেও আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত জোরালো সাক্ষ্য পেতে শুরু করেছি। ২০০৬ সালের মে মাসে এমআইটি এবং হার্ভার্ড ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা নেচার জার্নালে যে গবেষণাটি প্রকাশ করেন তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ এবং শিম্পাঞ্জি তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো ৫৪ লক্ষ থেকে ৬৩ লক্ষ বছর আগে এবং তাদের আলাদা হয়ে যাওয়ার ইতিহাসটি বেশ জটিল।[১২] বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে এই দুই প্রজাতি বা উপপ্রজাতির মধ্যে বেশ লম্বা সময় ধরে প্রজনন ঘটেছিল যা আমাদের ক্রোমোজোম x এর মধ্যে গভীর ছাপ ফেলে গেছে। কে জানে, এ জন্যই হয়তো আমরা এত লম্বা সময় ধরে আফ্রিকাজুড়ে 'না-বনমানুষ–না-মানুষ' জাতীয় মধ্যবর্তী মানুষের বা মিসিং লিঙ্কের সন্ধান পাচ্ছি!

একটা মজার গল্প দিয়ে লেখাটা শেষ করা যাক। শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাং ওটাং সবার মধ্যে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ৪৮, হঠাৎ করেই দেখা যাচ্ছে যে, একই হোমিনয়ডিয়া দলের সদস্য হওয়া স্বত্ত্বেও, মানুষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা হয়ে গেছে ৪৬। বিবর্তনের তত্ত্বানুযায়ী এরা যদি পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে থাকে এবং অন্যদের সবার মধ্যে ৪৮ টি ক্রোমোসোমের অস্তিত্ব থাকে, তাহলে অবশ্য আমাদেরকে এখন প্রশ্ন করতে হবে, মানুষের জিনোম থেকে দু'টো ক্রোমোজোম কোথায় হারিয়ে গেল? বিবর্তন তত্ত্ব যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে তো একদিন হঠাৎ করে ক্রোমোজোম দু'টো হাওয়া হয়ে যেতে পারে না, তাদের কোনো না কোনো রকমের চিহ্ন থাকতেই হবে মানুষের জিনোমের মধ্যে। আর যদি এ ধরণের কোন নমুনা একেবারেই না পাওয়া যায় তাহলে তো বিবর্তনবাদের মুল বিষয়টি নিয়েই সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে। জীববিদরা প্রকল্প দিলেন যে, যেহেতু সব বনমানুষের মধ্যে এখনও ৪৮টা ক্রোমোজোম আছে কিন্তু এদের দলের মধ্যে শুধুমাত্র মানুষেরই দু'টো ক্রোমোজোম কম আছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, শেষ সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর বিবর্তনের পথে চলতে চলতে কোন এক সময়ে মানুষের প্রজাতির মধ্যে আদি দু'টো ক্রোমোজোম সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল, যা অন্যান্য বনমানুষের ক্ষেত্রে ঘটেনি। শেষ পর্যন্ত, এই তো কিছুদিন আগে, ২০০২ সালে বিজ্ঞানীরা দেখালেন যে, আসলে শিম্পাঞ্জিদের যে ১২ এবং ১৩ নম্বর ক্রোমোজোম (এখন তাদেরকে 2A এবং2B বলে নামকরণ করা হয়েছে) রয়েছে সে দু'টো মানুষের মধ্যে মুখোমুখীভাবে সংযুক্ত হয়ে ক্রোমোজোম ২ তৈরি করেছে।[১৩] এই দু'টো ক্রোমোজোমের সংযুক্তির বিন্দুটির গঠন নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা থেকেও মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের আরও অনক তথ্য বের হয়ে এসেছে, কিন্তু তা নিয়ে এখানে আর আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। আসলে এ ধরনের ক্ষেত্রগুলোতেই আমরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে বিবর্তনবাদের শক্তি এবং সঠিকতা বুঝতে পারি। কোন সঠিক তত্ত্ব থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বা পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয় যা অবৈজ্ঞানিক কোনো কিছুর উপর ভিত্তি করে দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন ধরুন, মানুষের শরীরে কোনভাবেই এই হারিয়ে যাওয়া ক্রোমোজোমটির অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া যেত তাহলে বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হতেন বিজ্ঞানীমহল।

এছাড়াও মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির জিনোম বিশ্লেষণ থেকে বিজ্ঞানীরা মানুষের মস্তিস্কের অত্যন্ত দ্রুত বিকাশের জন্য দায়ী জিনগুলো, তাদের বিকাশের সময়সীমা, বিভিন্ন ধরনের প্রোটিনের গঠন, বনমানুষদের মধ্যে ঘ্রাণশক্তির লোপ এবং সেই সাথে সাথে শক্তিশালী দৃষ্টিশক্তির বিকাশের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য পেতে শুরু করেছেন। এমআইটি এবং হার্ভার্ড ইউনির্ভারসিটির ব্রড ইনস্টিটিউটের সদস্য বিজ্ঞানী টি মিকেলসনের মতে, আগামী কয়েক বছরে আরও অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং প্রাইমেটের জিনোমের অনুক্রম বের করে ফেলা যাবে, সেখান থেকে খুব সহজেই মানুষের বিবর্তনের জন্য দায়ী বিশেষ ডিএনএর অনুক্রমগুলো বেড়িয়ে পড়বে। মানুষের বিবর্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো, যেমন ধরুন, দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে পারা, মস্তিস্কের বিবর্ধন বা জটিল ভাষাগত দক্ষতার মতো বিবর্তনের বিশেষ ধাপগুলোতে কী ধরনের জেনেটিক পরিবর্তন কাজ করেছিল সেগুলো আবিস্কার করতে পারলে হয়তো আমরা মানুষের বিবর্তনের একটা সম্পূর্ণ রূপরেখা তৈরি করতে পারবো।[১৪] আবার অন্য দিকে এই জেনেটিক পরিবর্তনগুলো তাদেরকে টিকে থাকার জন্য কি বিশেষ ধরনের সুবিধা করে দিয়েছিল–এগুলো কি তাদের পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বাড়তি সুবিধা করে দিয়েছিল নাকি দ্রুত চলাচলে বা পারস্পরিক সংযোগ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল, নাকি সামাজিকভাবে দলবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার ক্ষমতা যুগিয়েছিল-এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে রয়েছে আমাদের উৎপত্তি এবং বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসের রহস্য।

তথ্যসূত্র

1. DiChristine M, 2006, Becoming Human, Scientific American Science Magazne:Special Edition, p.1.
2. Calvin W. 2006, The Emergence of Intelligence, Scientific American:Special Edition, pp 85.
3. Gould, S, J: Understanding Evolution, PBS Website : (http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/08/1/l_081_06.html
4. Skybreak, A. 2006, The Science of Evolution and The Myth Of Creationism, Insight Press, Illinois, USA.
5 .আখতারুজ্জামান, ম, ১৯৯৮, বিবর্তনবাদ, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা ৩১৯।
6. আখতারুজ্জামন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২২।
7. Dawkins R, 2004, The Ancestor's Tale, 2004. Houghton Mifflin Company, Boston, New York.
8. The Human Genome Project, http://genome.wellcome.ac.uk/node30075.html
9. New Genome Comparison Finds Chimps, Humans Very Similar At DNA Level, 2005, Science Daily Magazine. http://www.sciencedaily.com/releases/2005/09/050901074102.htm
10. Ibid
11. Ibid
12. Human and Chimp Genomes Reveal New Twist on Origin of Species, 2006, Science Daily Magazine. http://www.sciencedaily.com/releases/2006/05/060518075823.htm

13. Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium ,2005. "Initial sequence of the chimpanzee genome and comparison with the human genome". Nature *437: 69-87*
http://www.genome.gov/Pages/Research/DIR/Chimp_Analysis.pdf,
Kenneth R. Miller, professor of biology at Brown University, delivered the keynote address at the University's 242nd Opening Convocation Tuesday, Sept. 6, 2005. http://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2005-06/05-013m.html, National Human Genome Reserach Institue4, 2005,
'Scientists Analyze Chromosomes 2', http://www.genome.gov/1351462
14. New Genome Comparison Finds Chimps, Humans Very Similar At DNA Level,2005, Science Daily Magazine. http://www.sciencedaily.com/releases/2005/09/050901074102.htm

আগামীদিনের মুক্তমনা

আকাশ মালিক

মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য হলো, মানুষ জন্ম থেকে প্রশ্ন করা, জানা, খোঁজা, কথা বলা ও চিন্তাবিলাসী। পশু তা পারে না, পশুর মধ্যে এ সমস্ত গুণ নেই। সমাজ-বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রত্যেকটি মানব শিশু বৈজ্ঞানিক হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে জন্ম নেয়। শিশু তার চারপাশের ঘটনাবলি থেকে জ্ঞান অর্জন করে। বিজ্ঞানীরূপে জন্ম নিয়েই সে তার চারপাশের জগৎকে আবিষ্কার করে। অজানাকে জানার আগ্রহ, কৌতুহল মনোবৃত্তি যেমন বড়দের, তেমন ছোটদের। শিশুরা অনবরত প্রশ্ন করে, জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে, উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে, সবকিছুতেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চায়, কারণ সে সারা জগতটাকে তার আপন দৃষ্টিকোণে আবিস্কার করতে চায়।

সে আপনার কাছে হয়তো জানতে চাইবে সূর্যের তাপমাত্রা কত, কফির উপরে ক্রীম কেন ভাসে, দুধ কেন ভাসে না, ছোট লোহার টুকরা কেন জলে ডুবে আবার এতবড় জাহাজ ভাসে কিভাবে, কিংবা হয়তো প্রশ্ন করবে, আগুন জল দিলে নেভে আবার কেরোসিন দিলে বাড়ে কেন, অথবা রঙধনুর সাত রঙ কেন, কেন রঙধনু হয়, কিভাবে হয়, কোথা থেকে হয়? হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর আপনার জানা নেই। কিন্তু এমন কোন উত্তর তাকে দেবেন না যার কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ নেই। আমাদের মনে রাখা উচিৎ, আজকের শিশুরা জন্ম নিয়েছে বিজ্ঞানের অপরিসীম সাফল্যের যুগে। যে মানুষ এক সময় পৃথিবীর আগুন ব্যবহার করতে জানতো না, সে মানুষ আজ সূর্যের আগুন নিয়ে খেলতে জানে, সূর্যের তাপ ব্যবহার করে গাড়ি চালায়। বই পড়ে মানুষ আগুন আবিস্কার করে নাই, জাহাজ পানিতে কেন ভাসে আর্কিমেডিস কোন স্কুলের শিক্ষকের কাছ থেকে শেখেন নাই। জগতের এত আবিস্কার, বিজ্ঞানের এত বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে যে সকল মহামানবদের অবদান, তাঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন অতিসাধারণ পরিবারের সাধারণ মানুষ।

শিশুর অনুসন্ধিৎসু মনের একটি উদাহরণ দেই। মা দেখলেন একটি মাত্র ডিম ঘরে আছে যা আজকের নাস্তার টেবিলে স্বামীকে দেবেন। হঠাৎ করেই পাঁচ বৎসরের ছেলেটি ফ্রিজ থেকে ডিমটি বের করে মাটিতে ছুঁড়ে ভেঙে ফেললো। এমতাবস্থায় মা তেলে বেগুনে আগুন না হয়ে, বাবা অগ্নি চক্ষু না করে তাকে প্রশ্ন করলেন, সে কী ভেবে ডিমটি ভাঙলো। ছেলেটি উত্তর দিলো, বড় ভাইয়ের ছোট বলটি মাটিতে ছুঁড়লে কি সুন্দর লাফ দেয়, দৌঁড়ে, ডিমটা কেন তা করল না? এর পরে তার আরো কিছু জানার আছে। বলটির ভেতরে বাতাস না থাকলে বলটি লাফ দেয় না কেন? আবার কোন জিনিস শক্ত জায়গায় যত সহজে ভাঙে নরম জায়গায় তত সহজে ভাঙে না কেন? একটি ডিম ভাঙাকে কেন্দ্র করে যে সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন তার উত্তর পেতে হলে আপনাকে জানতে হবে বস্তুর ধর্ম, গতি, শক্তি, বাতাসের ওজন, ঘনত্ব এসব কিছু।

শিশুর অনুসন্ধিৎসু মন জানতে চায়, খুঁজতে চায় ঘটনার পেছনের ঘটনা। আপনি এখান থেকেই শুরু করতে পারেন আপনার ছেলের ইউনিভার্সিটির প্রথম ক্লাস। আপনি বলতে পারেন, আমার তো বাবা এতসব উত্তর জানা নেই, চলো আমরা দু-জন মিলে এর উত্তর খুঁজি, কিংবা বলতে পারেন, তুমি নিয়মিত স্কুলে যাবে, স্কুলে সব উত্তর পাওয়া যায়। অথবা বলতে পারেন, চলো লাইব্রেরিতে যাই, অজানাকে জানার একটা বই নিয়ে আসি। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নাগরিকের ভাল হওয়া, মন্দ হওয়া, শিক্ষিত হওয়া, মূর্খ হওয়া, পরোপকারী হওয়া, অনিষ্ঠকারী হওয়া, চরিত্রবান হওয়া, চরিত্রহীন হওয়া নির্ভর করে প্রথমত মা বাবা, দ্বিতীয়ত চার-পাশের পরিবেশের ওপর। সব শিশুর মনেই নজরুল হওয়ার বাসনা আছে। সব শিশুই বলতে চায় 'বিশ্ব জগত দেখবো আমি আপন হাতের মুঠোয় পরে'। চৈতন্যতা, গতিশীলতা, মনন, ভাবনা-শক্তি মানুষের জন্মগত গুণ, আর এই গুণ মানুষকে দিয়েছে অপরিমেয় সুপ্ত ক্ষমতার অধিকার, যা অন্য জীবের মধ্যে নেই। সংবিৎ এবং চৈতন্যতার গুণে মানুষ হয়েছে অনন্য। দূরকল্পী ভাবনা (স্পেক্যুলেটিভ থিংকিং) একমাত্র মানুষই করতে পারে। আর এই দূরকল্পী ভাবনাকেই বলা হয় দর্শন। দার্শনিকতার জোরেই পৃথিবীর মানুষ মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিজ্ঞান ও দর্শনে যে জাতি যত বেশি উন্নত, নিঃসন্দেহে সেই জাতিই পৃথিবীতে তত বেশি উন্নত, সুখী এবং শক্তিশালী

মানুষের বেঁচে থাকার পথ খোঁজা শুরু হয় মায়ের গর্ভ থেকে। ভ্রূণ মনুষ্যাবয়ব পাওয়া থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজা শুরু করে। এক সময় মা তার এই খোঁজা-খুঁজি টের পান। মা বোঝেন তার পেটের সন্তান বেরিয়ে আসার অর্গলটি পেতে দেয়াল হাতড়ে বেড়াচ্ছে। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে ঠিক সময়মত একদিন বেরিয়ে আসার দ্বার সে খুঁজে পায়। ধরিত্রীর সদস্যের খাতায় নাম লেখানোর পর থেকে তার খোঁজা-খুঁজি শুরু হয়, মৃত্যুর আগপর্যন্ত তা চলতে থাকে। জগতের অপরিসীম অগণিত, অসীম বিস্ময়কর সৃষ্টিতত্ত্ব যদি অজানা, অনাবিস্কার থেকে যায়, মানুষ যদি তা জানতে না পারে, যদি জানার সুযোগ দেয়া না হয়, মানব জনমটাই তার ব্যর্থ হয়ে যাবে। যে সুযোগ, যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে লাঞ্ছিত-বঞ্ছিত, বিতাড়িত, নিন্দিত, আহত, নিহত হয়েছেন কালের অনেক ইমাম, মোজাদ্দিদ, সুফি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিকগণ। তাদের মধ্যে আবু-মুসা বিন মনসুর হাল্লাজ, ইবনে রুশদ, ইবনে সিনা, আল গাজ্জালী, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়া, আলবার্ট আইনস্টাইন, গ্যালিলিও, আইজ্যাক নিউটন, সক্রেটিস, স্টিফেন হকিন্স অন্যতম। এ ধরায় যুগে যুগে সৃষ্টিশীল, মননশীল, বিদূষী, মনীষীর জন্ম হবে, যদি আমরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে খোঁজার, বলার, জানার, বোঝার, অনুসন্ধান করার, প্রশ্ন করার সুযোগ দিই।

নারীবাদ ও নারীবাদী

(উৎসর্গ : বাংলাদেশের প্রথম নারীবাদী রোকেয়াকে)

নন্দিনী হোসেন

লেখার শুরুতেই নারীবাদের সহজ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি। আমাদের অনেকেরই মনে 'নারীবাদ' ও 'নারীবাদী'দের নিয়ে প্রচুর ভ্রান্ত ধারণা আছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্যেও 'নারীবাদ' শব্দটি নিয়ে বেশ নেতিবাচক ধারণা যে করেই হোক জন্ম নিয়েছে। তাছাড়া শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটা বৃহৎ অংশের ভিতরও এই নিয়ে এক ধরনের ধোঁয়াশা বিদ্যমান।

আসলে 'নারীবাদ' বিষয়টি কী? এ প্রশ্নের যথাযথ, সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর পেতে আমরা উইকিপিডিয়ার সাহায্য নিতে পারে। সেখানে নারীবাদ অথবা Feminism এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

Feminism is a diverse collection of social theories, political movements and moral philosophies, largely motivated by or concerned with the experiences of women. Most feminists are especially concerned with social, political and economic inequality between men and women (in the context of it being to the disadvantage of women); some have argued that gendered and sexed identities, such as `man' and `woman', are socially constructed. Feminists differ over the sources of inequality, how to attain equality, and the extent to which gender and gender-based identities should be questioned and critiqued. In simple terms, feminism is the belief in social, political and economic equality of the sexes, and the movement organised around the belief that gender should not be the pre-determinant factor shaping a person's social identity, or socio-political or economic rights.

উপরের সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারি 'নারীবাদ' আসলে এমন কিছু নয় যা নিয়ে নানামুখি ভুল ধারণা আমাদের অনেকের মধ্যে গেড়ে আছে। যেমন কারো কারো ধারণা যিনি 'নারীবাদি' চিন্তা চেতনা নিজের ভিতর লালন করেন, তিনি উচ্ছন্নে-যাওয়া কেউ! তিনি সমাজ সংসারের ধার ধারেন না! পুরুষের উপর নারীর আধিপত্য বিস্তার করতে চান বা পুরুষবিদ্বেষী হন, অথবা পুরুষদের প্রতিপক্ষ ঘোষণা করে সারাক্ষণ যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে থাকেন। যদিও ব্যক্তিগতভাবে কেউ তা হতে পারেন কিন্তু, নারীবাদের সংজ্ঞা থেকে আমরা যে বিষয়টা বুঝি তা হচ্ছে, নারীবাদীরা পুরুষের পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগসুবিধা আদায়ের জন্য লড়াই বা আন্দোলন যাই বলি না কেন তা নিয়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। প্রবলভাবে পুরুষশাসিত সমাজ সৃষ্ট লিঙ্গ বৈষম্য উপড়ে ফেলে কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেন। যত দিন পর্যন্ত এই সমতা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিকভাবে নিশ্চিত না হচ্ছে তত দিন নারীবাদীদের দাবি আদায়ের জন্য এই আন্দোলন চলতেই থাকবে। এটা শুধু নারীবাদের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজের সর্বস্তরের তুলনামূলকভাবে কম সুবিধাপ্রাপ্তরা নিজেদের বঞ্চিত বোধ করেন স্বাভাবিক কারণেই। যার জন্য নিজেদের দাবি আদায়ের পথে বাধাবিপত্তি ডিঙানোর জন্য তাদের দৃঢ় ও শক্তিশালী অবস্থান নিতে হয়।

'নারীবাদের' ইতিহাসের দিকে আমরা যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাবো 'নারীবাদ' আসলে হঠাৎ করে উড়ে এসে জুড়ে বসা কিছু নয়, যেমনটা আমরা অনেকেই ধরে নেই। অধিকার আদায়ের জন্য ধাপে ধাপে এগুতে হয়েছে নারীবাদীদের। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় আঠারোশো শতকেরও আগে নারীবাদের অস্তিত্ব ছিল যদিও তার ডালপালা বিস্তার করে ওই শতকেরই শেষ ঘটাতে গেলে যে শক্তি, যে দৃঢ়তা, পরিবারে যে অবস্থানের প্রয়োজন হয় তা থেকে তাকে কৌশলে বঞ্চিত করা হয়েছে যুগ যুগ ধরে। তিনি এই বৈষম্যকে মানেন নিয়তি বলে। নারীর নিয়তি! সেই নিয়তি মানেননি বেগম রোকেয়া। মানেননি বলেই আজকের রোকেয়াকে আমরা পেয়েছি বাঙালি মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে। তাঁর কোনো কোনো সমালোচক বলেন তিনি পুরুষতন্ত্রের সাথে আপোস করে টিকে ছিলেন। তবে হুমায়ূন আজাদ যথার্থই বলেছেন, রোকেয়া তখন কিছুটা আপোষ করেছিলেন বাধ্য হয়ে সত্যি–কিন্তু, 'তিনি পুরুষতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্যে নিরন্তর লড়াই করে গেছেন; তাঁর রচনাবলি পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ধারাবাহিক মহাযুদ্ধ।' তিনি রোকেয়ার আপোসকামিতা নিয়ে আরও যে প্রণিধানযোগ্য কথাটি উল্লেখ করেছেন তা হলো, 'রোকেয়া পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে চালিয়েছিলেন সার্বিক আক্রমণ। তিনি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছেন পুরুষতন্ত্রের তৈরি নারী ও পুরুষের ভাবমূর্তি, বর্জন করেছেন নারীপুরুষের প্রথাগত ভূমিকা; তুলনাহীনভাবে আক্রমণ করেছেন পুরুষতন্ত্রের বলপ্রয়োগ সংস্থা ধর্মকে। রোকেয়া পরে ধর্মের সাথে কিছুটা সন্ধি করেছেন আত্মরক্ষার জন্য; নইলে তাঁকে ও তাঁর আদর্শকে অত্যন্ত বিপন্ন করে তুলতো মুসলমান পিতৃতন্ত্র।' রোকেয়া যখন নির্দ্বিধায় বলেন 'আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।' তখন এ থেকেই বোঝা যায় নারীর সামগ্রিক অধিকার প্রতিষ্টা করতে চাইলে ধর্মকে পাশ কাটিয়ে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' জাতীয় আন্দোলন করে ফল পাওয়ার আশা করা হবে চরম বোকামি।

তথ্যসূত্র : www.wikipedia.com

'নারী' : হুমায়ুন আজাদ

A Vindication of the rights of woman : Wollstonecraft

মোহনীয় মোনালিসা

ফরিদ আহমদ

পৃথিবীর তাবৎ রমণীকূলের মধ্যে মোনালিসার মতো এতো প্রচার, প্রচারণা এবং ভালবাসা বোধহয় আর কেউ পায়নি। জনপ্রিয়তার দিক থেকে ভিঞ্চির এই মানস সুন্দরী ম্লান করে দিয়েছে অনেক বাঘা বাঘা হলিউড সুন্দরীদেরকে। যৌবনের কোনো না কোনো সময় মোনালিসার প্রেমে পড়েনি এমন পুরুষ খুঁজে পাওয়া রীতিমত বিরল। মোনালিসার কৌতুকপ্রিয় চোখ আর ঠোঁটের কোণে ঝুলে থাকা এক টুকরো রহস্যময় হাসি অনেক যুবকের রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। শত শত বছর ধরে মোনালিসার হাসির রহস্য উদঘাটনে ব্রতী হয়েছে অসংখ্য কবি, শিল্পী এবং সাহিত্যিকেরা। তা সত্ত্বেও রহস্যময়ী মোনালিসার রহস্যময় হাসি রয়ে গেছে রহস্যের অন্তরালে। যুগে যুগে বিপুল সংখ্যক গবেষণা, সাহিত্য, কাব্য আর সঙ্গীত রচিত হয়েছে মোনালিসাকে ঘিরে। প্রেমিকেরা তাদের প্রেয়সীর মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছেন মোনালিসার অপার রহস্য, চোখের গভীরে পেতে চেয়েছে মোনালিসার অনন্য ঝিকিমিকি কৌতুক। সে কারণেই বোধহয় সব যুগেই পুরুষেরা তাদের স্বপ্নচারিণীদের তুলনা করে এসেছে মোনালিসার সাথে। মোনালিসা হয়ে উঠেছে সৌন্দর্য আর রহস্যময়তার প্রতীক হিসাবে।

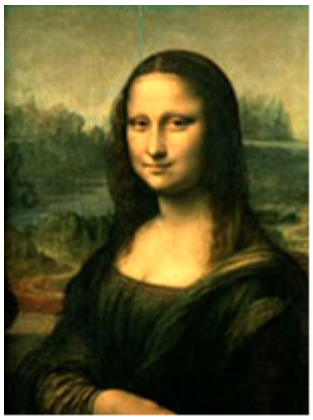

চিত্র : লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসা

কী আছে পাঁচশো বছর আগে ইতালীয় রেঁনেসার শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসার মধ্যে যে, যার কারণে তাকে নিয়ে এতো উন্মাদনা, এতো আগ্রহ, এতো ভালবাসা, এতো প্রচার? এ রহস্যেরও সমাধান কেউ দিতে পারেনি এখন পর্যন্ত। শত শত পণ্ডিত, গবেষক এবং ঐতিহাসিকেরা পৃথিবীর দূর দূরান্তের লাইব্রেরীতে গিয়ে পুরোনো দলিলপত্রে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন মোনালিসার রহস্য উদ্ধার করার জন্য।

রহস্য ও গোপনীয়তায় আচ্ছন্ন এই প্রতিকৃতিটি আঁকা হয়েছে ৭৭×৫৩ সেন্টিমিটার বৃহৎ পপলার প্যানেলে। এতে কোনো স্বাক্ষর ছিল না এবং কোন তারিখও দেয়া নেই। লিওনার্দোর অন্য সব ছবির ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে সেগুলোর স্কেচ বা ছবিটি সম্পর্কে কিছু বর্ণনা লিওনার্দো তার নোটবুকে লিখে রেখেছেন। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার হাজার হাজার পৃষ্ঠার নোটবুকে মোনালিসা সম্পর্কে একটি লাইন বা কোন স্কেচ পাওয়া যায় নি। ঐতিহাসিকেরা মোটামুটি একমত যে, লিওনার্দো তার শেষ বয়সে মোনালিসা এঁকেছেন তবে ঠিক কত সালে মোনালিসা আঁকা হয়, সে বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে ১৫০৬ সালে মিলানে ফিরে আসার আগে ফ্লোরেনসে আঁকা হয়েছে। আবার অন্যেরা দাবি করেন যে ছবিটি হয়তো ফ্লোরেনসে আঁকা শুরু হয়েছে কিন্তু শেষ হয়েছে কয়েক বছর পর মিলানে। শুধু কোন সময়ে আঁকা হয়েছে তাই নয়, ঐতিহাসিকেরা এটা জানারও চেষ্টা করেছেন যে, কেন লিওনার্দো এই প্রতিকৃতিটি আঁকতে গেলেন? কেউ কি তাকে এটা করে দিতে বলেছিল? যদি তাই হয়, তবে কে সে? লিওনার্দো তার অন্য সব চিত্রকর্মই বায়নাকারীদের দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু মোনালিসার ক্ষেত্রেই তার একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছে। তিনি এটাকে তার সাথেই রেখে দিয়েছিলেন দীর্ঘদিন। কেন এটা বায়নাকারীকে কখনোই দেওয়া হয়নি? এই সমস্ত প্রশ্নের কোন সদুত্তর এখনো পাওয়া যায়নি।

চিত্র : লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

আদিতে এই ছবিটি এখনকার তুলনায় আকৃতিতে বেশ খানিকটা বড় ছিল। ছবিটির দুই পাশের দুটো কলাম বা পিলার কেটে ফেলা হয়েছে। একারণেই এখন ছবি দেখে সহজেই বোঝা যায় না যে মোনালিসা আসলে টেরাসে বসে ছিল।

আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং মোনালিসার কিছু কিছু অংশ পরবর্তী সময়ে রঙ করার কারণে বর্তমানে ছবিটির অনেক আনুঙ্গিক বিষয়ই দৃশ্যমান নয়। তা সত্ত্বেও ছবিটির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ঠিকই অক্ষুণ্ন রয়েছে।

মোনালিসা সেই সময়ের জন্য ছিল অনন্যসাধারণ। যারা মোনালিসা দেখেছেন তাদের কাছে মনে হবে যেন কোন প্রতিকৃতি নয়, পুরোপুরি জীবন্ত এই মহিলা। ঠোঁটের কোণে রহস্যময় এক চিলতে হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে দর্শকের দিকে। ক্ষণে ক্ষণে আবার এই হাসির রূপও বদলে যায়। কখনো এই হাসিকে মনে হয় নিষ্পাপ, বড় পবিত্র আবার কখনোবা মনে হয় বিদ্রুপ করছে আশেপাশের সবাইকে। আবার কখনোবা মনে হয় কোন হাসিই নেই তার ঠোঁটে। জীবন্ত কাউকে যে পুরে রাখা হয়েছে ক্যানভাসে; এক্ষুনি হয়তো বের হয়ে আসবে ক্যানভাস ছেড়ে। আর দশটা জীবন্ত মানুষের মতই মনে হয় যেন তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা রয়েছে সে কি চিন্তা করছে বা তার অনুভূতি কি তা বলা মহা দুঃসাধ্যের কাজ। সে কি আনন্দিত নাকি বিষাদগ্রস্ত, ধূর্ত নাকি সহজ সরল, শান্ত সমাহিত। নাকি পারিপার্শ্বিক সব কিছু থেকে উদাসীন কোনো নারী? যারাই মোনালিসার ছবি দেখেছেন তারা কেউই একমত হতে পারেননি। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে মোনালিসার মেজাজমর্জিকে ব্যাখ্যা করেছেন।

ফুমাটো (Sfumato) কৌশল

ভিঞ্চি তার এই পোট্রেটে যে কৌশলে এই রহস্যময়তা এনেছেন তাকে বলা হয় ফুমাটো কৌশল বা পদ্ধতি। এই ইটালিয়ান শব্দটির মানে হচ্ছে ধোঁয়াশা বা ঝাপসা। তার সময়ের অন্যান্য শিল্পীরা যেখানে সুস্পষ্ট বহির্রেখা ব্যবহার করতেন সেখানে ভিঞ্চি এই ক্ষেত্রে তার বিপরীতটা করেছিলেন। মোনালিসার দেহের প্রান্তসীমাসমূহ, তার সামগ্রিক মুখমণ্ডল, হাতদ্বয় এবং কাপড়ের রয়েছে হালকা প্রান্তসীমা। এই প্রান্তসীমাসমূহ ঘিরে থাকা আলো বা ছায়ার মধ্যে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেছে। আলো এবং ছায়ার মধ্যে অদৃশ্য উত্তরণ, কখনো কখনো বিভিন্ন রং এর কোন দৃশ্যমান চিহ্ন ছাড়াই একের সাথে অন্যের মিশে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি সবকিছুকেই ধোঁয়ার মতো মিশিয়ে দিয়েছেন তিনি কোন প্রান্তসীমা ছাড়াই। যে কোন প্রতিকৃতির অভিব্যক্তি মূলত নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর, মুখের এবং চোখের প্রান্ত। কিন্তু মোনালিসায় লিওনার্দো সচেতনভাবেই এই দু'টি জায়গাকেই হালকা ছায়ার সাথে অন্তলীন হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে অস্পষ্ট করে রেখেছেন। একারণে আমরা কখনোই নিশ্চিত না যে মোনালিসা কোনো মেজাজে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার অভিব্যক্তি সবসময়ই দর্শককে বিভ্রান্তির মধ্যে রেখে দেয়। তবে শুধুমাত্র অস্পটতাই এই এফেক্ট তৈরি করেনি। এর পিছনে আরো অনেক কিছুই আছে। লিওনার্দো অত্যন্ত দুঃসাহসী একটা কাজ করেছিলেন যা শুধুমাত্র তার মত অসম্ভব প্রতিভাবানরাই করতে পারে। মোনালিসাকে খুব ভাল করে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে এর দুই পাশ পুরোপুরি মেলে না। এটা সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান পটভূমিকার স্বপ্নিল প্রাকৃতিক দৃশ্যে। বাম দিকের দিগন্ত রেখা ডানদিকের দিগন্ত রেখার তুলনায় অনেক নিচে। ফলে, আমরা যখন ছবিটির বা দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করি তখন মোনালিসাকে মনে হয় বেশ কিছুটা লম্বা। এ ছাড়া খেয়াল করলে দেখা যাবে যে মোনালিসার এক চোখ আরেক চোখের তুলনায় সামান্য উচুতে অবস্থিত। এই পরিবর্তনের ফলে এবং তার মুখের দুইপাশ না মেলার কারণে তার মুখচ্ছবিও পালটে যায় বিভিন্ন কৌণিক অবস্থান থেকে দেখার সময়। আলো এবং ছায়ার সচেতন ব্যবহার ছাড়াও মোনালিসার অবস্থান নিয়েও লিওনার্দো বেশ যত্নশীল ছিলেন। মোনালিসার শরীর সামান্য কাত হয়ে আছে। হাত দুটো হালকাভাবে বাহুর

ওপরে রেখে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসে আছে সে। শব্দ বা কঠিন হয়ে পোজ দেওয়ার চেয়ে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তিনি চেয়েছিলেন মোনালিসাকে আঁকতে। মেরী রোজ স্টোরি (Mary Rose Storey) মোনালিসার এই ভঙ্গিমা নিয়ে লিখেছেন :

> 'লিওনার্দোর সময়ে মোনালিসার এই ভঙ্গিমা নতুন আবিস্কার হিসাবেই বিবেচনা করা হত এবং ব্যাপকভাবে অনুসৃত হত। এটা ছিল চিরায়ত ভঙ্গিমা Contrapposto-র পরিমার্জিত সংস্করণ। Contrapposto-শব্দটি ইটালিয়ান। এর মানে হচ্ছে এমন একটি ভঙ্গিমা যেখানে শরীরের এক অংশ অন্য অংশের বিপরীত দিকে বাঁকানো থাকে।'

লিওনার্দো মোনালিসা প্রতিকৃতিটি আঁকা শুরু করেন ১৫০৩ সালে। পরবর্তী চার বছর তিনি এর ওপর বার বার কাজ করেন। ১৫০৭ সালে লিওনার্দো যখন ফ্লোরেন্স ছাড়েন তখন তিনি ছবিটি তার সাথে করে নিয়ে যান। অনেকেরই ধারণা যে যেহেতু ছবিটি সম্পূর্ণ হয়নি তাই লিওনার্দো এটিকে তার সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারো কারো মতে অবশ্য, লিওনার্দো ছবিটিকে এতো ভালবাসতেন যে তিনি এর সঙ্গ ছাড়তে পারেননি।

১৫১৬ সালে ছবিটি সাথে নিয়েই লিওনার্দো ফ্রান্সে আসেন। রাজা ফ্রান্সিস I তার এ্যামবোয়েসের দুর্গের জন্য ছবিটি কিনে নেন। পরে ফাউন্টেইনব্লো, প্যারিস, ভার্সেই ঘুরে অবশেষে মোনালিসা এসে পড়ে লুডউইগ XIV এর সংগ্রহশালায়। ফরাসি বিপ্লবের পর ল্যুভের মিউজিয়ামে এর নতুন আবাস গড়ে ওঠে। মোনালিসার প্রেমে মত্ত নেপোলিয়ান সেখান থেকে একে নিয়ে যান তার শোবার ঘরে। নেপোলিয়ানের পতনের পর মোনালিসা আবার ফিরে যায় তার পুরোনো ঠিকানা ল্যুভরে।

কেউ কেউ মনে করেন যে মোনালিসা কোন একক মহিলার প্রতিকৃতি নয়, বরং অনেক মহিলার সুচতুর সমন্বয়, সমগ্র নারী জাতির প্রতীক। অন্যদের মতে এটা ড্রাগের প্রভাবযুক্ত ভিঞ্চির কোন পুরুষ মডেলের ছবি। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, মোনালিসা কোনো প্রতিকৃতিই নয়, বরং ভিঞ্চির অসাধারণ কল্পনার রূপমাত্র। কেউ কেউ আবার একে ভিঞ্চির মায়ের প্রতিকৃতি বলেও রায় দিয়েছেন।

লিওনার্দো বক্রতলে আলোর কারুকাজ নিয়ে অতি উৎসাহী ছিলেন। রেশমি আচ্ছাদন, মোনালিসার চুল, তার ত্বকের উজ্জ্বলতা, সবকিছু তৈরি হয়েছে স্বচ্ছ রঙ এর অতি পাতলা আস্তরণ দিয়ে। এর ফলে মনে হয় মোনালিসার মুখে ফুটে উঠেছে উজ্জ্বল আভা, ছবিটি পরিণত হয়েছে জাদুকরী গুণসম্পন্ন অতি উচ্চমার্গীয় শিল্পকর্মে। কুজিন (Cuzin) এ সম্পর্কে বলেন যে :

> 'আজকের শিল্প সমালোচকেরা ছবিটির রহস্যময়তা এবং সুসমন্বয়তার উপর বেশি নজর দেন। কিন্তু প্রথমদিককার শিল্প ঐতিহাসিকেরা এর অসাধারণ বাস্তবতার প্রতি বেশি জোর দিয়েছেন, বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন হাস্যময় অধর এবং উজ্জ্বল চোখের কথা।'[২]

গিওর্গিও ভাসারি (Giorgio Vasari) তার ভিঞ্চির জীবনীগ্রন্থ Lives of the Painters'-এ লিখেছেন :

> 'মোনালিসাকে মনে হয় না যে আঁকা হয়েছে। বরং রক্তমাংসের প্রকৃত মানবীই মনে হয় তাকে। খুব কাছাকাছি থেকে কেউ যদি তার কণ্ঠের দিকে তাকিয়ে থাকে তবে সে হলফ করেই বলতে পারবে যে মোনালিসা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে।'[৩]

লিওনার্দোর ছবির এই বাস্তবতা এসেছে তার বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ থেকে। মানব এনাটমি ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে তিনি আকৃতির গাণিতিক সিস্টেম এবং পারসপেক্টিভ আবিস্কার করেছিলেন। এই পারসপেকক্টিভই তিনি ব্যবহার করেছিলেন মোনালিসার ক্ষেত্রে। মোনালিসার শরীরের তুলনায় মাথা এবং চোখ কিছুটা বেশি ঘোরানো ছিল দর্শকের দিকে। ভিঞ্চি সাবজেক্ট এবং পটভূমিকার অবজেক্ট এর পার্থক্যও পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং মোনালিসার পটভূমিকায় গভীরতার বিভ্রম তৈরি করার জন্য এরিয়াল পারসপেক্টিভ ব্যবহার করেছিলেন। কোন বস্তু দূরত্বের দিক থেকে যত দূরে থাকবে তার স্কেল তত ছোট হবে, রঙ যত অনুজ্জ্বল হবে বহির্সীমা তত অস্পষ্ট হবে। এ বিষয়ে কুজিন বলেন :

> 'লিওনার্দো, আকাশ, মাটি, বায়ুমণ্ডল এবং আলো নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। কাজেই তার এপ্রোচ ছিল বৈজ্ঞানিকের মত কিন্তু তিনি অসাধারণ শৈল্পিক এবং সুচারুরূপে একে পরিণতি দিয়েছিলেন তার চিত্রকর্মে। একই চিত্রকর্মে আমরা কোমল অঞ্চল যেমন মেঘ থেকে চলে যেতে পারি চরম জটিলতায় এবং চমৎকার ডিটেইলসে। উদাহরণস্বরূপ, মোনালিসার পোশাকের গলার কাছে সূক্ষ্ম পরস্পর বিজড়িত এমব্রয়ডারি রয়েছে। এগুলোর বিভিন্ন এলাকার বৈসাদৃশ্য এমন এক ধরনের প্রাঞ্জলতা তৈরি করেছে যা চিত্রকর্মে বিরল। সবকিছু মিলে মোনালিসা এতই স্বাভাবিক এবং এতই পরিচিত যে, আমরা ভুলেই যাই এটা ষষ্টদশ শতাব্দীর শুরুতে এই চিত্রকর্মটি কি অসাধারণ আবিস্কার ছিল।'[৪]

ভাসারি তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, লিওনার্দোর সময়েই দূর দূরান্ত থেকে শিল্পীরা তার স্টুডিওতে ভিড় জমাতো মোনালিসাকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য। তরুণ শিল্পী রাফায়েল লিওনার্দোর সৃষ্টিকর্ম নিয়ে এমনই আচ্ছন্ন ছিল যে, সে নিজেও মোনালিসার আদলে বেশ কিছু প্রতিকৃতি এঁকে ফেলেছিল। এদের মধ্যে আবার কয়েকটি মোনালিসার সাথে দারুণভাবে সাদৃশ্যও ছিল। তবে বলতেই হয় সেগুলোতে দা ভিঞ্চির মাস্টারপিসের নাটকীয়তা অনুপস্থিত ছিল।

রহস্যময় হাসি

পাঁচ শতাব্দী ধরে লোকজন মোনালিসার হাসিকে দেখে চলেছে চরম বিস্ময় নিয়ে, বিহ্বলের মত। পৃথিবীর সমস্ত রহস্যের আধার যেন তার হাসি। এই মনে হবে মোনালিসা হাসছে, পরক্ষণেই দেখা যাবে সে হাসি মিলিয়ে গেছে। কী আছে মোনালিসার ঠোঁটে? লিওনার্দো কিভাবে

মোনালিসার মুখে এই রহস্যময় অভিব্যক্তি তুলে দিয়েছিলেন? অন্য কোন শিল্পীরা তা পারেননি কেন? আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেকেই এর কারণ হিসাবে ফুমাটো কৌশলকেই দায়ী করেছেন।

হার্ভাডের নিউরো সায়েন্টিস্ট ড. মার্গারেট লিভিংস্টোন (Margaret Livingstone) এর মতে এর আরো শক্তিশালী অন্য একটা ব্যাখ্যা আছে। তার মতে মোনালিসার হাসি ক্ষণে ক্ষণে আসা যাওয়ার জন্য তার দুর্বোধ্য অভিব্যক্তি মোটেই দায়ী নয়। বরং মানুষের দর্শনেন্দ্রিয় যেভাবে ডিজাইন করা তাই এর মুখ্য কারণ।

বিশ্বজগতকে দেখার জন্য মানব চোখের সুস্পষ্ট দুটো আলাদা এলাকা রয়েছে। কেন্দ্রীয় এলাকাকে বলা হয় ফোভিয়া। এখান দিয়েই মানুষ বর্ণ দেখতে পায়, অক্ষর পড়তে পারে এবং খুঁটিনাটি সবকিছুকে আত্মস্থ করতে পারে। ফোভিয়ার চারপাশের এলাকা যাকে বলা হয় পেরিফেরাল, তা দিয়ে মানুষ সাদা-কালো, গতি এবং ছায়া দেখে থাকে।

মানুষ যখন অন্য কারো মুখের দিকে তাকায় তখন বেশির ভাগ সময়ই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সেই ব্যক্তির চোখের দিকে। কাজেই ড. লিভিংস্টোনের মতে যখন কোনো ব্যক্তির দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয় মোনালিসার চোখের ওপর তখন তার তুলনামূলকভাবে কম নির্ভুল প্রান্তিক দৃষ্টি এসে পড়ে মুখের ওপর। যেহেতু প্রান্তিক দৃষ্টি খুঁটিনাটির বিষয়ে মোটেই আগ্রহী নয়, কাজেই স্বাভাবিকভাবে তার কাছে ধরা পড়ে মোনালিসার চোয়ালের হাড়ের ছায়াগুলো।

এই ছায়াই হাসির রূপ নেয়। কিন্তু যখনই দর্শকের চোখ সরাসরি মোনালিসার মুখের ওপর পড়ে, তার কেন্দ্রীয় দৃষ্টি ছায়াকে আর দেখে না। ড. লিভিংস্টোনের মতে মোনালিসার মুখের দিকে তাকিয়ে কখনোই তার হাসি দেখতে পাওয়া যাবে না। ক্ষণে ক্ষণে হাসির আসা-যাওয়া ঘটতে থাকে কারণ মানুষ তাদের সৃষ্টি মোনালিসার মুখের বিভিন্ন জায়গায় সরাতে থাকে বলে। মোনালিসার মধ্যে রসিকতা করার একধরনের সকৌতুক প্রবণতা আছে। যখন আপনি অন্য দিকে তাকিয়ে থাকবেন তখন সে আপনার পিছনে হাসবে। আর আপনি তার দিকে তাকানোর সাথে সাথেই সে তার হাসি বন্ধ করে দেবে।

অভিনেত্রী জিনা ডেভিসের মধ্যে মোনালিসা এফেক্ট আছে। সবসময় মনে হয় হাসি যেন ঝুলে আছে ঠোঁটে। এমনকি যখন হাসেন না তখনও মনে হয় হাসছেন। ড. লিভিংস্টোনের মতে, যেহেতু জিনা ডেভিসের চোয়ালের হাড় খুবই দৃশ্যমান সেকারণেই এরকম মনে হয়।

মোনালিসার রহস্যময় হাসির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও এর নান্দনিক রূপের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ড. লিভিংস্টোন। কাজেই এই রহস্যটুকুকে হরণ করে এর প্রতি মানুষের আগ্রহকে কেড়ে নিতে চাননি তিনি।

> 'আমি চাই না লিওনার্দোর রহস্যটুকু কেড়ে নিতে। অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী জীবন থেকেই এই রহস্যটুকু নিয়েছিলেন, কিন্তু কেউই তা খেয়াল করেননি। আমাদের পাঁচশ' বছর লেগেছে তা উদ্ধার করতে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কেন অন্য শিল্পীরা এটা নকল করতে পারেন নি। মোনালিসার খুব ভাল নকল করতে হলে যা করতে হবে তা হচ্ছে আঁকার সময় এর মুখের থেকে অন্যদিকে তাকিয়ে নিতে হবে। এতো সহজ জিনিসটা অন্যেরা যে কেন পারেনি সেটাও এক রহস্য'। [৫]

সুখী মোনালিসা

আবেগ চিহ্নিতকরণ সফটওয়ার ব্যবহার করে ইউনিভার্সিটি অব আমস্টারডামের কম্পিউটারে মোনালিসাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে মোনালিসা ৮৩ শতাংশ আনন্দিত, ৯ শতাংশ বিরক্ত, ৬ শতাংশ আতংকিত এবং ২ শতাংশ ক্রোধান্বিত। আবেগ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কম্পিউটার সফটওয়ারটি ঠোঁটের বক্রতা, চোখের চারপাশের কুঞ্চনকে বিবেচনায় নিয়ে থাকে।

যতটা না সিরিয়াস গবেষণা, তার চেয়ে অনেক বেশি মজা হিসেবেই আমস্টারডামের গবেষকরা এই পরীক্ষাটি করেছিলেন। ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় এর সহযোগিতায় নির্মিত আবেগ চিহ্নিতকরণ এই সফটওয়ার এর মাধ্যমে মোনালিসার আবেগকে চিহ্নিত করার জন্য প্রথমে মোনালিসাকে স্ক্যান করা হয়। গবেষণার সাথে জড়িত প্রফেসর হ্যারো স্টকম্যান (Harro stokman) বলেন যে, গবেষকরা জানেন যে এই গবেষনা খুব একটা বৈজ্ঞানিক নয়, কেননা এই সফটয়ার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে ধরতে অক্ষম। অনেকেই মোনালিসার চোখের যৌন ইঙ্গিত বা তাচ্ছিল্য খুঁজে পান তা সনাক্ত করতে পারেনি এই সফটওয়ার। এছাড়া এই সফটওয়ার শুধুমাত্র ডিজিটাল ফিল্ম বা ইমেজকেই শুধুমাত্র ব্যবহার করতে পারে, এই ব্যক্তির বর্তমান আবেগকে সঠিকভাবে সনাক্ত করার জন্য প্রাথমিকভাবে তার নিরপেক্ষ আবেগশূন্য অবস্থার ছবি প্রয়োজন হয়। মুখ্য গবেষক নিকু সেবে (Nicu Sebe) এই চ্যালেঞ্জকে সিরিয়াসলি নেন এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বংশোদ্ভূত দশ জন মেয়ের মুখচ্ছবিকে ব্যবহার করে তিনি নিরপেক্ষ অভিব্যক্তির একটি ইমেজ তৈরি করেন। তারপর তিনি এই ইমেজকে মোনালিসার মুখের সাথে তুলনা করে ছয়টি আবেগ আনন্দিত, বিস্মিত, ক্রোধান্বিত, বিরক্ত, আতঙ্কিত এবং বিষাদগ্রস্তে ভাগ করেন। এই সফটওয়ার কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে স্টকম্যান বলেন :

> 'মূলত এটা মাকড়শার জালকে মুখের উপর ফেলে ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে ফেলার মত। তারপর আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নাকের স্ফীতি বা চোখের চারপাশের বলিরেখাগুলোর পার্থক্যকে বিশ্লেষণ করবেন এর আবেগকে চিহ্নিত করার জন্য।' [৬]

এই গবেষণার সঙ্গে জড়িত নন এমন বায়োমেট্রিক্সরা বলেন, যদিও এটাই মোনালিসার জন্য শেষ কথা নয় তথাপি এই গবেষণার ফলাফল যথেষ্ট আগ্রহ উদ্দীপক। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর আইডেন্টিফিকেশন টেকনোলজীর ডিরেক্টর ল্যারী হোরানক (Larry

Hornak) বলেন যে-

'মুখচ্ছবি সনাক্তকরণ টেকনোলজির দ্রুতগতিতে উন্নতি হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আবেগ সনাক্তকরণ এখনো আতুরঘরেই পড়ে আছে। তবে মনে হচ্ছে ছোট হলেও তারা একটা ডাটা সেটকে ব্যবহার করেছেন। নতুন ক্ষেত্র হিসাবে এই কাজ খুব একটা ফেলে দেয়ার মতোও নয়। গবেষণার ফলাফল যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। জনগণের আগ্রহের বিষয়গুলোতে টেকনোলজির ব্যবহার সবসময়ই মজাদার, এবং মাঝে মাঝে আপনি খুবই সাধারণ ফলাফলও পেয়ে যেতে পারেন।[৭]

স্যান জোস বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেট্রিক্স গবেষক জিম ওয়েম্যান (Jim Wayman) হোরনাকের সাথে একমত পোষণ করে বলেন যে–

'এটা একধরনের ভেল্কিবাজি, সিরিয়াস কোনো বিজ্ঞান নয়। কিন্তু মজা হিসাবে এটা দারুণ এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এতে কারো তো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না।'[৮]

হাসির অন্তরালের নারী

মোনালিসার প্রকৃত ইতিহাস এর রহস্যময় হাসির মতোই রহস্যের চাদরে মোড়া। এই প্রতিকৃতির সবচেয়ে পুরোনো বর্ণনা পাওয়া যায় গিওর্গিও ভাসারির লেখায়। ভাসারি যদিও মোনালিসা নিয়ে দারুণভাবে উচ্ছ্বসিত ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে তিনি কখনোই মোনালিসাকে স্বচক্ষে দেখেননি। কারণ তিনি যখন দা ভিঞ্চির জীবনী লেখেন তখন মোনালিসা ছিল ফ্রান্সে। অবশ্য ভাসারি লিওনার্দোর শিষ্য এবং পরবর্তীকালে তার সমস্ত শিল্পকর্মের উত্তরাধিকারী ফ্রান্সেসকো মেলজির সাথে সাক্ষাৎ করেন। মেলজিই তাকে মোনালিসা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করেন।

ভাসারি তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, লিসা ছিলেন ফ্লোরেনসের অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী রেশম ব্যবসায়ী ফ্রান্সেসকো ডেল গিওকন্ডোর চতুর্থ স্ত্রী। প্রতিকৃতিটি আঁকা প্রায় শেষ হওয়ার সময়ে লিসার বয়স ছিল ছাব্বিশ বা সাতাশ। এক সন্তানের জননী ছিল সে। অবশ্য তার সেই সন্তান জন্মের পর পরই মারা যায়। লিওনার্দো তার এই প্রতিকৃতিটির কোন নামকরণ করেন নাই। যেহেতু লিসা ছিল গিওকন্ডোর স্ত্রী, সে কারণে ইটালিতে এই চিত্রকর্মকে ডাকা হয় লা গিওকন্ডো নামে। ইংরেজি ভাষাভাষী অঞ্চলে লিসার নামে ছবিটির নাম হয়ে মোনালিসা। ইটালিয়ান ভাষায় মোনা হচ্ছে সম্মানসূচক পদবি। অনেকটা ম্যাডামের মত। আর এ কারণেই এ প্রতিকৃতিটি মোনালিসা নামে ডাকা হয়ে থাকে।

ভাসারি আরো উল্লেখ করেন যে, ছবি আঁকার সময় মোনালিসার মনোরঞ্জনের জন্য লিওনার্দো ভাড়া করা লোকজন দিয়ে গান-বাজনার ব্যবস্থা করে ছিলেন।[৯] এমনকি তাকে হাসিখুশি এবং উৎফুল্ল রাখার জন্য পেশাদার ভাঁড়েরও ব্যবস্থা ছিল। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে, মোনালিসার হাসি লিওনার্দোর একধরনের তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়। ইটালিতে গিওকন্ডো শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে– উৎফুল্ল, উল্লসিত, আনন্দিত। লিওনার্দো হয়তো তার নামকেই কৌতুকের আকারে হাসির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এ ধরনের কৌতুকের প্রতি ভিঞ্চির যে বেশ অনুরাগ ছিল তা ইতিহাসই প্রমাণ দেয়।

ভাসারির সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও শত শত বছর ধরে প্রায় ডজনখানেক নারী আলোচনায় উঠে এসেছে মোনালিসা হওয়ার দাবিদার হয়ে। কেউ কেউ আবার এই প্রতিকৃতিটিতে কোনো মডেলই ব্যবহৃত হয়নি বলে মনে করেন। তাদের ধারণা লিওনার্দো কল্পনা থেকে তার আদর্শ রমণীর ছবি এঁকেছেন।

বহুদিন আগে থেকে আবার বেশকিছু সংখ্যক লোক দাবি করে আসছিলেন যে মোনালিসা ভিঞ্চিরই নিজস্ব চেহারার রমণীয় রূপ। এই ধারণাটির রহস্য উদঘাটনে গ্রাফিক আর্টিস্ট লিলিয়ান শোয়ার্জ (Lillian Shcwartz) ১৯৯৮ কম্পিউটার ভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটান। শোয়ার্জ লিওনার্দোর নিজের আঁকা নিজেরই প্রতিকৃতি নিয়ে একে উলটে দেন এবং কম্পিউটার স্ক্রিণে মোনালিসার প্রতিকৃতি পাশাপাশি রেখে তুলনা করেন। তিনি দেখতে পান যে, মোনালিসা এবং লিওনার্দোর নাক, মুখ, কপাল, চোয়ালের হাড়, চোখ এবং ভ্রু সবকিছুই একেবারে সরলরেখায় অবস্থান করছে। লিলিয়ান এই বলে তার উপসংহার টানেন যে, লিওনার্দো নারী মডেল নিয়ে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরে এই মডেলকে আর না পাওয়া যাওয়াতে তিনি নিজের চেহারার রমণীয় রূপকেই ব্যবহার করেছিলেন।[১০]

এডেলেইডের অপেশাদার শিল্প ঐতিহাসিক মেইক ভোগট-লুয়েরসেন (Maike Vogt-Luerssn) এর দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি মোনালিসার পরিচয় এবং সেই সাথে তার বিষণ্নতা এবং রহস্যময় হাসির পিছনের কারণটি উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন।

রেনেসার সময়কার শিল্পকলার প্রতি সুগভীর প্রণয়ের কারণে মেইক তার এই গবেষণা প্রজেক্ট হাতে নেন, যার সূত্রপাত হয়েছিল জার্মানিতে। প্রায় সতের বছরের গবেষণার পর মেইক এই বিশ্বাসে উপনীত হন যে, মোনালিসা ফ্লোরেনসের ধনাঢ্য রেশম ব্যবসায়ীর স্ত্রী নন। বরং সে হচ্ছে লিওনার্দোর প্রেমাকাংখী মিলানের প্রাক্তন ডাচেস ইসাবেলা অব এ্যারাগন।

মেইকের এই গবেষণার ফলাফল জার্মানিতে Who is Mona Lisa? In Search of Her Identity নামে গ্রন্থাকারে বের হয়েছে।

মেইক বলেন যে, মোনালিসার পরিচয়ের সূত্র মোনালিসা চিত্রকর্মসহ সেই সময়কার অন্যান্য চিত্রকর্ম, ডায়েরি এবং তৎকালীন সরকারি ও বেসরকারি রেকর্ডের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

ফ্যাকাশে হাসি এবং মোনালিসার সারা শরীরের গহনার অনুপস্থিতি ছাড়াও তার পরনে রয়েছে গভীর শোকের পোশাক। মোনালিসাকে যে বছর আঁকা হয় তার আগেরই বছরই ইসাবেলার মা মারা যায়। সেই সময় ডাচেসের বয়স ছিল মাত্র সতের বছর এবং সে ছিল সুদর্শন কিন্তু অসৎ চরিত্রের অধিকারী ডিউক অব মিলান গিয়ান গালিয়াজো II মারিয়া ফোরজার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী।

মোনালিসার সাদাসিধা বাদামী পোশাকের দৃশ্যমান উর্ধ্বাংশ হচ্ছে ফোরজা পরিবারের প্রতীক এবং এর নিচের সংযুক্ত গিটসমূহ এবং সুতাগুলো ভিসকন্টি এবং ফোরজা পরিবারের বন্ধনকে প্রতিনিধিত্ব করছে। মেইক উল্লেখ করেন যে, এই প্রতীকের কারণে মোনালিসা হতে পারে এমন মহিলার সংখ্যা মাত্র আটজন-এ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তিনি সংশ্লিষ্ট মহিলাদের বেশ কিছু প্রতিকৃতি চিহ্নিত করেন। এদের মধ্যে রয়েছে ক্যাটরিনা, ফোরজা, যার চুল ছিল হালকা লাল রঙ এর, ইসাবেলার শ্বাশুড়ী বোনা অব স্যাভয় এবং ইসাবেলার ননদ এ্যানা-মারিয়া, এঞ্জেলা, ইপোলিটা, বিয়ানকা, এমপ্রেস এবং বিট্রিসা। বলা বাহুল্য এদের কারো সাথেই মোনালিসার চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি, কাজেই খুব স্বাভাবিকভাবেই মোনালিসা হওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র দাবিদার হয়ে পড়ে ইসাবেলা।

মেইকের ধারণা যে তিনি মোনালিসার বিষণ্নতা এবং উৎফুল্লতার পিছনের কারণও বের করতে পেরেছেন।

কেন মোনালিসা এতো বিষণ্ন? ১৪৮৮ সালের শেষের দিকে ইসাবেলা যখন মিলানে আসে তখনই তার বিয়ে হয় ডিউক অব মিলানের সাথে। কিন্তু তাদের বৈবাহিক জীবনে বড় ধরনের সমস্যা ছিল। তার স্বামী ছিল মদ্যপ, নপুংসক এবং স্ত্রী নির্যাতনকারী।

মেইক বলেন যে,

> 'সেই সময়কার ডায়েরি লেখকেরা ডাচেস অব মিলান নামের চমৎকার এক রমণীর দুঃখ লিখে গেছে, যে তার মদ্যপ স্বামীর হাতে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হয়ে কাঁদতো। কিন্তু সেই রমণী ছিল দা ভিঞ্চির ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা সম্ভবত তার চেয়েও বেশি কিছু। সে কারণেই অসংখ্য আগ্রহী ক্রেতা থাকা সত্ত্বেও ভিঞ্চি তার মোনালিসাকে হাতছাড়া করেননি কিছুতেই। এটা ছিল প্রেমের গল্প। কিন্তু খুবই দুরূহ প্রেমের গল্প। ইসাবেলা ছিলেন সমাজের অতি উচ্চপর্যায়ের এবং শক্তিশালী অবস্থানের অংশ। অন্যদিকে ভিঞ্চি ছিলেন নেহায়েতই এক শিল্পী। তখনকার সমাজ এ ধরনের অসম সামাজিক অবস্থানের প্রেমকে মেনে নেয়ার মতো অবস্থায় ছিল না'। ১১

ফ্লোরেনসের রেশম ব্যবসায়ীর স্ত্রী লা গিওকন্ডো মোনালিসা ছিলেন এই ব্যাপক স্বীকৃত ধারণাকে প্রত্যাখান করেছেন মেইক। তার মতে, গিওর্গি ভাসারিরর লিখিত বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে এটা ছিল ল্যুভর মিউজিয়ামের নিজস্ব অনুমান মাত্র। মেইকের নিজের ভাষায় :

> 'তারা জানতো না, মোনালিসা কে? কাজেই প্রথম যে বর্ণনা তারা পেয়েছে সেটাকেই তারা গ্রহণ করে নিয়েছে। এই বর্ণনা সাদামাটাভাবে মোনালিসার সাথে খাপও খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আসলে তা খাপ খায় নি। ল্যুভর যা কিছু বলেছে তার সব কিছুই অপ্রমাণিত এবং শুরু থেকেই বেশ কিছু গল্প ঐতিহাসিকেরা এর বিরোধিতা করে এসেছেন। মোনালিসা এবং ভাসারির বর্ণনাকৃত লা গিওকন্ডোর প্রতিকৃতির বর্ণনার মধ্যে গড়মিল রয়েছে।'১২

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র লেকচারার ক্রিস মার্শালদের মত শিল্প সমঝদারেরা অবশ্য মেইকের গবেষণাকর্মের সাথে একেবারেই পরিচিত নন এবং তার দৃষ্টিভঙ্গির সাথেও মোটেই একমত নন। ড. মার্শাল বলেন যে,

> 'যেহেতু ভাসারি তার স্মৃতির ওপর নির্ভর করে ষষ্টদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মোনালিসার বর্ণনা লিখেছেন, সে কারণেই লা গিওকন্ডো তত্ত্ব এখনো চালু রয়েছে।'১৩

পাঁচ সন্তানের জননী

গুইসেপ পালান্টি নামের ফ্লোরেনসের একজন শিক্ষক শহরের আর্কাইভগুলোতে দীর্ঘ পঁচিশ বছর গবেষণার পর সুস্পষ্ট প্রমাণ খুঁজে পান যে লিওনার্দোর পরিবার এবং রেশম ব্যবসায়ী ফ্রান্সেসকো গিওকন্ডোর পরিবার ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল।১৪

ভাসারির যে দাবি করেছিলেন মোনালিসা হচ্ছে গিওকন্ডোর স্ত্রী, সে বিষয়ে পালান্টির মনে কোন সন্দেহ নেই। কেননা ভাসারি ব্যক্তিগতভাবে গিওকন্ডো পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। লিসার বয়স যখন চব্বিশ তখন এই প্রতিকৃতিটি আঁকা হয় এবং খুব সম্ভবত লিওনার্দোর বাবাই তাকে এই কাজটি জুটিয়ে দিয়েছিল। এ ধরনের কাজ লিওনার্দোর বাবা আগেও অন্তত একবার করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। টাকা পয়সার ব্যাপারে লিওনার্দো এতোই অগোছালো ছিল যে তার বাবাকে এ ধরনের সাহায্যের হাত মাঝে মাঝেই বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল।

পালান্টির ভাষ্য অনুযায়ী লিসা পাঁচ সন্তানের জননী ছিলেন। লিসা এবং ফ্রান্সেসকো দম্পতির পাঁচ সন্তানের মধ্যে চার সন্তানেরই জন্মের রেকর্ড উদ্ধার করেছিলেন তিনি। পালান্টি তার গবেষণার ফলাফল ছোট্ট একটি বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

মোনালিসাকে তার রহস্য উদ্ধার করার জন্য অন্যান্য পণ্ডিত এবং গবেষকেরা পালান্টির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। রিকার্ডো নেনচিনি (Ricardo Nencini) বলেন যে,

> 'এই গবেষণা হয়তো সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্তভাবে প্রমাণ করতে পারবে না যে লিসা এবং মোনালিসা একই রমণী। কিন্তু যে ধরণের তথ্য প্রমাণ হাজির করা হয়েছে তাতে এরা যে একই নারী তা প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে।'১৫

অপহৃত মোনালিসা

১৯১১ সালের একুশে অগাস্ট সোমবার বিশ্ববিখ্যাত এই শিল্পকর্ম ল্যুভর মিউজিয়াম থেকে চুরি হয়ে যায়। ওই দিন সকালে মিউজিয়ামের কর্মচারীরা আবিস্কার করে যে মোনালিসা তার নিজের জায়গায় নেই। কিন্তু কর্মচারীরা ভেবে নেয় যে, মোনালিসাকে বোধহয় মিউজিয়ামের অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার তার অফিসে নিয়ে গেছে এর ফটো তোলার জন্য।

মঙ্গলবারের মধ্যে যখন ছবিটি স্বস্থানে ফিরে এলো না এবং জানা গেল যে, সেটা ফটোগ্রাফারের অফিসেও নেই, তখনই তা মিউজিয়াম কর্মকর্তাদের জানানো হয়। তাৎক্ষণিকভাবেই পুলিশকেও খবর দেওয়া হয় এবং তারা কিউরেটরের অফিসে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে সারা মিউজিয়ামের সর্বত্র ব্যাপক অনুসন্ধান চালায়। কিন্তু কোথাও মোনালিসার হদিস পাওয়া গেল না।

সংবাদপত্রে মোনালিসা চুরির ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর ফরাসি পত্রপত্রিকাগুলো চুরির বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে হাজির হয়। এক সংবাদপত্র দাবি করে যে, একজন আমেরিকান সংগ্রাহক এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। এবং এর নিখুঁত নকল করার পর নকল ছবিটি একসময় মিউজিয়ামে ফেরত পাঠানো হবে। অন্য এক সংবাদপত্র বলে যে, পুরো ঘটনাটাই আসলে ধোঁকাবাজি। কত সহজে ল্যুভর থেকে ছবি চুরি করা যায় তা দেখানোই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য।

চুরির রহস্য উদ্ধার করার জন্য কর্মচারীসহ আশেপাশে বসবাসকারী অসংখ্য লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে পুলিশ বিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসোকেও এই চুরির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। পিকাসো এর আগে তার এক বন্ধু পিয়েরের কাছ থেকে দু'টি চোরাই প্রস্তরের ভাস্কর্য কিনেছিলেন। মোনালিসা চুরি হওয়ার কয়েকমাস আগে পিয়েরে ওই ভাস্কর্য দুটো ল্যুভর থেকে চুরি করেছিল। পিকাসো ভেবেছিল যে তার এই গুণধর বন্ধুটিই হয়তো মোনালিসাকেও চুরি করেছে।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা এবং ইমেজ হারানোর ভয়ে পিকাসো ভাস্কর্য দুটো মিউজিয়ামে ফেরত দেয়ার জন্য স্থানীয় এক পত্রিকা অফিসে হস্তান্তর করেন। তার নাম প্রচারিত হোক এটা পিকাসো চাননি। কিন্তু কেউ একজন এই ঘটনা পুলিশকে ফাঁস করে দেয়। তদন্তের পর অবশ্য পুলিশ নিশ্চিত হয় যে পিকাসো মোনালিসা চুরির বিষয়ে কিছুই জানতেন না।

সৌভাগ্যক্রমে চুরি যাওয়ার সাতাশ মাস পরে মোনালিসাকে উদ্ধার করা হয়। ভিনসেনজো পেরুজিয়া নামের একজন ইতালিয়ান মোনালিসাকে এক লাখ ডলারের বিনিময়ে ফ্লোরেনসের উফিজি গ্যালারীতে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল। পেরুজিয়া অবশ্য দাবি করে যে, টাকা নয় বরং দেশপ্রেমের কারণেই সে মোনালিসাকে চুরি করেছিল। একজন বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পীর বিশ্বখ্যাত শিল্পকর্ম ফ্রান্সে থাকবে এটা সে মেনে নিতে পারে নি।

ত্রিমাত্রিক বিশ্লেষণ

মোনালিসার গঠনবিন্যাস, স্টাইল এবং কিভাবে আরো ভালভাবে সংরক্ষণ করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য ন্যাশনাল রিসার্চ কাউনসিলের (NRC) সৌভাগ্য হয়েছিল এই প্রতিকৃতিকে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার। অত্যাধুনিক কলাকৌশলের মাধ্যমে অত্যন্ত ব্যয়বহুল এই গবেষণায় NRC গবেষণা দল মোনালিসাকে স্ক্যান করে বিপুল সংখ্যক ডাটা সংগ্রহ করেন বিশ্লেষণ করার জন্য।

ল্যুভরের পেইন্টিং ডিপার্টমেন্টের অনুরোধে Centre de recherche et de restauration des musees de France (C2RMF) মোনালিসার ওপর গবেষণার কাজ নেয়। এই গবেষণা ছিল কোন পেইন্টিং এর ওপর নেয়া এখন পর্যন্ত সব চেয়ে ব্যয়বহুল গবেষণা। মডেলিং টেকনোলজী এবং থ্রিডি (ত্রিমাত্রিক) ইমেজিং এর ওপর ব্যাপক জ্ঞান এবং দক্ষতার কারণে এই প্রজেক্টের অংশ হিসাবে (C2RMF) ক্যানাডা ভিত্তিক গবেষনা প্রতিষ্ঠান NRC এর থ্রি ডি বিজ্ঞানীদের একটি দলকে আমন্ত্রণ জানায় গবেষণায় অংশ নেওয়ার জন্য।

এই গবেষণায় এনআরসি-র ভূমিকা ছিল মোনালিসার সম্মুখ এবং পশ্চাৎ দুইভাগই স্ক্যান করার মাধ্যমে প্রতিকৃতিটির সংরক্ষণযোগ্য একটি উচ্চ রেজুলিশন সম্পন্ন ত্রিমাত্রিক মডেল তৈরি করা। ত্রিমাত্রিক এই মডেল ব্যবহার করা হয়েছিল তিনটি কাজে :

- পপলার প্যানেলের আকৃতির কতখানি বিকৃতি ঘটেছে তা সনাক্ত করা।
- ছবিটির সম্মুখ অংশের বৈশিষ্ট্যসমূহ, রঙ এর বিভিন্ন স্তর, প্যানেল এবং প্রতিকৃতিটির উপরভিগের চিড় বা ফাটলকে পরীক্ষা করা।
- ছবিটির সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং ভিঞ্চির ছবি আঁকার কৌশল বিশেষত ফুমাটো কৌশলকে বুঝতে সহায়তা করা।

প্যারিসে যাওয়ার আগে NRC টিমের সদস্যরা স্ক্যানিং প্রক্রিয়ার অনুপুঙ্খ সিম্যুলেশন পরীক্ষা করেন। মোনালিসাকে তার পরিবেশ সংরক্ষণ চেম্বার থেকে বছরে মাত্র একবার এক রাতের জন্য পরীক্ষা করার জন্য বের করা হয়। NRC গবেষকরা ২০০৪ সালের ১৮ থেকে ২০শে অক্টোবরের মধ্যে দুটি মহামূল্যবান রাত পেয়েছিলেন মোনালিসার সামনের, পেছনের এবং পার্শ্বের অংশের ত্রিমাত্রিক স্ক্যানের জন্য।

NRC টিম এই প্রজেক্টের জন্য একটি বহনযোগ্য ত্রিমাত্রিক রঙিন লেজার স্ক্যানার তৈরি করেছিলেন। মে মাসে C2RMF এর রেঁনোর (Renoir) আঁকা বেশ কিছু ছবি স্ক্যানের মাধ্যমে এই বহনযোগ্য স্ক্যানারটি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করা হয়। ত্রিমাত্রিক টেকনোলজি তৈরির নেতৃত্বদানকারী গবেষক ফ্রাঙ্কোয়েস ব্লেইস (Francois Blais) মোনালিসার ক্রমশ পরিবর্তনশীল রঙ-এর অনুজ্জ্বলতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য নতুন এলগোরিদম এবং গাণিতিক মডেল উদ্ভব করেন।

এন আর সি বিজ্ঞানী মার্ক রিওক্স মোনালিসার ত্রিমাত্রিক ছবি বিশ্লেষণ করছেন ত্রিমাত্রিক মডেল নিখুঁতভাবে মোনালিসার প্যানেলের বেঁকে যাওয়ার পরিমাণকে চিহ্নিত করে। মোনালিসাকে আঁকা হয়েছিল যে পপলার কাঠের প্যানেলে তার মধ্যে ডান পাশে আশে পাশের এলাকার চেয়ে বারো মিলিমিটার উঁচু উত্তলাকৃতির বিকৃতি তৈরি হয়েছে। অবশ্য এই বিকৃতি এখন পর্যন্ত মোনালিসার হাসির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়নি।

ত্রিমাত্রিক এই বিশ্লেষণের সবচেয়ে বড় পাওনা হচ্ছে লিওনার্দোর অংকনকৌশলের রহস্য উদ্ধার করতে পারা। লিওনার্দো তার এই অংকন কৌশলকে ফুমাটো বলতেন। ইতালীয়ানে যার অর্থ হচ্ছে ধোঁয়া। কিন্তু ধোঁয়ার মধ্যে সত্যিকারের যা হারিয়ে গেছে তা হচ্ছে কিভাবে এই কৌশল মোনালিসাতে প্রয়োগ করেছিলেন ভিঞ্চি।

চিত্র : ত্রিমাত্রিক বিশ্লেষণে মোনালিসার ছবি

NRC র হাই রেজুলেশন রঙিন ত্রিমাত্রিক লেজার স্ক্যানিং টেকনোলজীতে মোনালিসাতে লিওনার্দোর তুলির আচড় সাগরের মৃদুমন্ড তরঙ্গের মতো এসেছে। এনআরসির গবেষক দলের সদস্য জন টেইলর (John Taylor) বলেন যে,

'মোনালিসায় আমরা তুলির আচড়ের বিস্তৃত কোন চিহ্ন দেখতে পাই না। এটা খুবই হালকাভাবে আঁকা এবং খুবই মসৃণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কোঁকড়ানো চুলের ডিটেইলস প্রবলভাবে দৃশ্যমান। কাজেই বলা যায় যে আমরা যে ধরণের কৌশল আগে কখনো দেখিনি। এটা লিওনার্দোর সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বকীয়তা।'[১৬]

কিভাবে তাহলে ভিঞ্চি মোনালিসাকে এঁকেছিলেন? টেইলর বলেন যে, যদিও ভাবা হয়ে থাকে যে ভিঞ্চি তার আঙুলকে ব্রাশ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু মোনালিসাতে সে ভাবে তার আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায়নি, যেটা ভিঞ্চির অন্যান্য ছবিতে পাওয়া যায়। শিল্প বিশেষজ্ঞরা জানেন যে, গভীরতার পারসেপশন, আয়তন, ধরন এবং হালকা বা গাঢ়তা আনার জন্য ফুমাটো কৌশলে স্বচ্ছ রঙে এর স্তর একের পর এক প্রলেপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ফ্রাস্কোয়েস ব্লেইস বলেন যে :

'স্ক্যানিং এর মাধ্যমে আমরা দেখাতে সক্ষম হয়েছি যে, গাঢ় এলাকা যেমন চোখ অবশ্য মোটা রং এর স্তর দিয়ে গঠিত। যার মানে হচ্ছে এগুলো অসংখ্য পর্যাক্রমিক পাতলা স্বচ্ছ রং এর আস্তরণের সমন্বয়। তা সত্ত্বেও, রেঁনেসার এই বিস্ময়কর শিল্পী কিভাবে তার রঙ-এর স্তর এবং তৈল মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন তা এখনো রহস্যই রয়ে গেছে।'[১৭]

বর্তমানে NRCর গবেষকরা মোনালিসার নকল প্রতিকৃতিগুলো যেগুলো কাঠের উপর ফুমাটো কৌশলে আঁকা হয়েছে সেগুলোর উপর কাজ করছেন, ত্রিমাত্রিক লেজার স্ক্যানিং এবং ছবির উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া ভালভাবে বোঝার জন্য। আর এর মাধ্যমেই তারা আশা করছেন যে, একদিন ভিঞ্চির ফুমাটো রহস্যকে তারা ভেদ করতে পারবেন।

ত্রিমাত্রিক গবেষণার সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত ব্লেইস এর সম্ভাবনা নিয়ে দারুণভাবে আশাবাদী। তিনি বলেন যে,

'আমরা যে ত্রিমাত্রিক ইমেজ পেয়েছি যা আসল মোনালিসার খুবই কাছাকাছির। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা একটা ডিজিটাল কপি মাত্র। আমরা এখন চিন্তা ভাবনা করা শুরু করেছি কিভাবে ভিজুয়ালাইজেশন এলগোরিদম তৈরি করা যায়, যা মোনালিসার চোখের উজ্জ্বল গভীরের অনুভূতিকে করায়ত্ত্ব এবং তা পুনর্নির্মাণ করতে পারবে।'[১৮]

অন্তঃসত্ত্বা মোনালিসা

মোনালিসার ত্রিমাত্রিক ছবি বিশ্লেষণকারী গবেষকরা বলেছেন যে, প্রতিকৃতি আঁকার সময় মোনালিসা হয় অন্ত:সত্ত্বা নতুবা সদ্য প্রসূতি ছিল। আর এ ধারণার মূল নিহিত রয়েছে মোনালিসার পোশাকের মধ্যে।[১৯]

স্ক্যান থেকে মোনালিসার কাঁধে মিহি সুতায় বোনা চমৎকার একটি আচ্ছাদনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রখ্যাত ফরাসি মিউজিয়াম গবেষক মিশেল মেনু বলেন যে, এই ধরনের আচ্ছাদন রেঁনেসার সময়কালীন গর্ভবতী বা সদ্য প্রসূতি ইতালিয়ান মহিলারা ব্যবহার করতেন।

ছবিটি পুরোনো হওয়ার সাথে সাথে এই আচ্ছাদন গাঢ় বর্ণ ধারণ করেছে। ঘন কালো বার্নিশের কারণে মোনালিসা কি রঙ এর পোশাক পরে ছিলেন তা বলা দুরূহ। এই রঙ কালো থেকে বাদামী এমনকি সবুজ বলেও কেউ কেউ অনুমান করেছেন। মোনালিসার কাঁধে বিছানো আচ্ছাদনকে কখনো কখনো চাদর বা স্কার্ফ হিসাবেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কিন্তু ইনফ্রা-রেড রিফ্লেক্টোগ্রাফি থেকে প্রাপ্ত ইমেজ ভিন্ন কাহিনী বর্ণনা দেয়। এই স্বচ্ছ আছাদনকে বলা হয় গুয়ারনেলো। স্যান্ড্রো বটিসেলির (Sandro Botticelli) আঁকা পেটের উপর হাত বিছিয়ে রাখা গর্ভবতী মহিলার `Portrait of a Lady'- র আচ্ছাদনের সাথে এর আবিকল মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিদিন মোনালিসাকে নিয়ে লেখা অসংখ্য কবিতা আর প্রেমপত্রে ছেয়ে যায় ল্যুভর মিউজিয়াম্ বাধভাঙ্গা জোয়ারের মতো মোনালিসা প্রেমিকরা ভিড় জমায় ল্যুভরে শুধুমাত্র মোনালিসাকে এক নজর দেখার জন্য, তার সাথে একটা ছবি তোলার জন্য। চিত্রকলার ইতিহাসে এতো আলোচিত এবং সমালোচিত চিত্রকর্ম আর হয়নি। রেঁনেসার মতই চিত্রকলার জগতেও বিপ্লব বয়ে এনেছিল রেনেঁসার সময়কালীন এই প্রতিকৃতি। মোনালিসার চেহারা আজ সারাবিশ্বে সুপরিচিত। বিশ্বের বিভিন্ন মিউজিয়াম থেকে শুরু করে, মদের বোতল, বিলবোর্ড হেন কোন জায়গা নেই যেখানে মোনালিসাকে ব্যবহার করা হয়নি। যুগেযুগে এই চিত্রকর্ম প্রভাবিত করেছে নবীন শিল্পীদের, আগ্রহী করে তুলেছে চিত্রকলার শৈল্পিক ভূবনে। কুজিন বলেন যে :

> 'মোনালিসার পরবর্তী সময়ের প্রতিকৃতির সম্পূর্ণ ইতিহাসই মোনালিসার ওপর নির্ভর করেছে। শুধু ইতালীয় রেঁনেসাকালীন প্রতিকৃতিসমূহই নয়, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পিকাসো থেকে শুরু করে প্রত্যেক শিল্পীরই মোনালিসা নিয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। পাশ্চাত্যের সকল প্রতিকৃতি চিত্রকলারই শেকড় হচ্ছে মোনালিসা।'[২০]

তথ্যসূত্র :

1. Mary Rose Storey, *Mona Lisa*. New York, Harry N. Abrams, 1980.
2. http://www.pbs.org/treasuresoftheworld/a_nav/mona_nav/mnav_level_1/3technique_monafrm.html

Giorgio Vasari, *Lives of Painters, Sculptors and Architects*. London: J.M. Dent & Sons, 1963.

3. http://www.pbs.org/treasuresoftheworld/a_nav/mona_nav/mnav_level_1/3technique_monafrm.html
4. http://www.sfgate.com/cgibin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2000/11/27/MN127339.DTL
5. http://www.livescience.com/history/ap_051215_mona_lisa.html
6. Ibid
7. Ibid

Giorgio Vasari, *Lives of Painters, Sculptors and Architects*. London: J.M. Dent & Sons, 1963.

Stuart A. Kallen and P.M. Boekhoff, The Importance of Leonardo Da Vinci. Lucent Books, 2000.

http://www.theage.com.au/articles/2004/06/24/1088046208817.html?from=storylhs

Ibid

Ibid

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2004/08/01/wmona01.xml&sSheet=/news/2004/08/01/ixworld.html

Ibid

http://iit-iti.nrc-cnrc.gc.ca/projects-projets/monalisa-lajoconde_e.html

Ibid

Ibid

http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/5384822.stm

http://www.pbs.org/treasuresoftheworld/a_nav/mona_nav/mnav_level_1/3technique_monafrm.html

ড. ইউনূস-শান্তিপুরস্কার

মৌ মধুবন্তী

গ্রামীণ ব্যাংক যদি ঋণ না দিতো
বাংলার কতো নারী মারা যেতো
বলো বাংলার অর্থমন্ত্রী ।

এম্বিশানের এক রকেট চড়ে
বাংলার মাঠে ঘাটে বীজ বুনে
যে ছেলে আজ পেলো শান্তি পুরস্কার
কেন আজ তাকে করো হে তিরস্কার ।

অভিনন্দনের নেই ক্রোড়পত্র
সমালোচনার সব অস্ত্র-শস্ত্র
সাজিয়ে নেমেছ মাঠে
উপড়ে দেবে ড. ইউনূসকে
বলো চিৎকার করে বিশ্বকে
সে তোমাদের করেছে অনেক ক্ষতি
নারীকে দিয়েছে জীবনের স্বাদ
তোমার জন্য তো তিক্ত পরমাদ
তুমি হুলো বেড়ালের মতো ছোটো
তুমি মেনী বেড়ালের মতো খাটো
তুমি উলটো রকেটে চড়ো
তাই বোঝ না কে কতো বড়ো
করো চিৎকার করো আরো জোরে
কোলে নিয়ে নাচো অমর্ত্য সেনে
এখনো হয়ে আছো গোবেচারা
বাঙালি
হওনি এখনো অহংকারী বাংলাদেশী
তোমাদের নেই কোনো বাদ্যযন্ত্রী
নেকাবছাড়া বাংলার মন্ত্রী ।

ছাড় বলছি, নারীর আঁচল টানা
বাংলার বুকে শান্তির পতাকা নামা
আনন্দের পতাকা নামা
ছাড় বলছি, বিদেশে বিদেশে ভিক্ষা মাগা
বাংলার বুকে শান্তির পতাকানামা
আনন্দের পতাকা নামা ।

অক্টোবর ১৭, ২০০৬

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা বনাম কোরানিক বিজ্ঞান

জাহেদ আহমদ

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে
আমরা তখনও পিছে,
বিবিতালাকের ফতোয়া খুঁজছি
হাদীস ও ক্বোরাণ চষে।

বাহিরের দিকে যত মরিয়াছি
ভিতরের দিকে তত
গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি
গরু-ছাগলের মত।
-কাজী নজরুল ইসলাম

এক.

ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে কলেজের ইংরেজি এন্থলজিতে পড়া একটি গল্প আমার মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল। অনেকেই গল্পটির কথা জেনে থাকবেন। আমেরিকান লেখিকা মারজারি কিনান রাওলিন্স-এর 'এ মাদার ইন ম্যানভিল' (*A Mother in Manville*)। কাহিনী এ রকম লেখালেখি বিষয়ক একটা এসাইনমেন্ট-এর কাজে লেখিকা মারজারি নর্থ ক্যারোলিনার পাহাড়ে অবস্থিত একটি অনাথ বাচ্চাদের আশ্রমে কিছুদিন কাটান। সেখানে জেরি নামে একটা বাচ্চার সাথে তার পরিচয় ঘটে। জেরি লেখিকাকে প্রতিদিন আগুনপোহানোর কাঠ কেটে দিত। সে ছিল প্রত্যয়ী, পরিশ্রমী এবং অত্যন্ত মেধাবী। জেরি আলাপ প্রসংগে লেখিকাকে জানায়, তার মা জীবিত এবং মাঝে মাঝে তাকে দেখতেও আসেন এটাসেটা উপহার নিয়ে। গল্পের শেষ পর্যায়ে লেখিকা আশ্রমে চাকুরীরত জনৈক মহিলার কাছ থেকে জানতে পারেন, জেরীর মা-বাবা কেউই আসলে জীবিত নেই এবং তাকে কেউ দেখতে আসার কথাও ঠিক না। এখানেই গল্পের সমাপ্তি ঘটলেও পাঠক-পাঠিকার মনে কাহিনীটি একাধিক প্রশ্নের জন্ম দেয়। জেরী কি তাহলে মিথ্যুক? কেন সে ফাঁদিয়ে ওরকম একটি গল্পলেখিকাকে বলতে গেল? সম্ভাব্য ব্যাখ্যা একাধিক, জেরী অনাথ বালক হিসেবে কারো করুণা বা সহানুভূতি নিতে চায়নি। অথবা, লেখিকাকে দেখে তার মায়ের কথা মনে পড়েছে; তাই নিজের একাকিত্ব ও অসহায়ত্বকে চেপে রাখতে কল্পনায় সে একজন মাকে সৃষ্টি করেছে। তা না হলে সম্ভবত তার আত্ম পরিচয়ের সংকট দেখা দিত।

উপরের গল্পটি বিশেষভাবে মনে পড়ল সম্প্রতি যখন পত্রিকার পাতায় একটি 'বিশেষ' লেখার ওপরে চোখ বুলাচ্ছিলাম। উক্ত লেখাটিতে লেখক মরিয়া হয়ে উঠেছেন দেখাতে যে, আল-কোরানের সাথে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের বিস্ময়কর (?) মিল রয়েছে। বেশ কিছু দেশী-বিদেশী রেফারেন্সও তিনি টেনে এনেছেন যা বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান গবেষণার পদ্ধতির সাথে অপরিচিত পাঠক-পাঠিকাদের খুব সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারবে; তাঁরা মনে করতে পারেন, কোরান বোধ হয় একধরনের বিজ্ঞানগ্রন্থ। হয়ত এও ভাবতে পারেন (বা ভাবেন)- প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগেই বিজ্ঞানের এমনসব তথ্য পবিত্র কিতাবে লেখা হয়েছিল, যা আধুনিক জগতে বিজ্ঞানীরা পরিশ্রমলব্ধ গবেষণার মাধ্যমে মাত্র জানতে শুরু করেছেন! তবে এসব বিশ্বাস মুসলমানদের মাঝে একেবারে নতুন নয়। সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, 'আমাদের ক্বোরাণেই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে। এগুতে পারছি না কেবল শয়তানের ওয়াসওয়াসে।' কিংবা 'কাফির-নাসারারা যে এত উন্নতি করছে, তা আসলে আমাদের ক্বোরাণ গবেষণা করে, অথচ আমরা নিজেরা পারছি না সঠিক আমলের অভাবে।' কিন্তু আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন বলে দিতে পারলেন না, 'সঠিক আমল' জিনিসটি আসলে কী কিংবা, বক্তা নিজেইবা কেন 'সঠিক আমল'টি অভ্যাস করে কোটি কোটি মুসলমানদের দুর্দশা লাঘব করতে সক্ষম হচ্ছেন না। একজন শিক্ষিত মুসলমানের কলম দিয়ে যখন এসব বালখিল্যতায় ভরা কথা বা লেখা বেরিয়ে আসে, তখন পাঠকের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি বৈকি। কারণ এরা আবার নিজেদের একই সাথে 'আধুনিক' এবং

'পাক্কা মুসলিম' লেবাসে ঢাকতে পারজ্গাম। কেউ কেউ ভাবেন, ঐসব লেখা মুসলমানদের সামনে এগোনোর পথে অনুপ্রাণিত করবে। কিন্তু আসলে কি তাই? জবাবে বলব, জ্বী-না। বাস্তবতা বড়ই রূঢ়। কোরানে যদি বিজ্ঞানের ব্যাপারে এতই ইঙ্গিত থেকে থাকত, তাহলে প্রশ্ন আসে পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মুসলমান হলেও বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীতে মুসলমান বিজ্ঞানীদের সংখ্যা কেন এক-শতাংশেরও কম? কিংবা, কেন পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশে যত বিজ্ঞানী রয়েছে, অমুসলিম ইসরাইলের একা রয়েছে তার চাইতে দ্বিগুন সংখ্যক বিজ্ঞানী?[1] তবে অর্বাচীন শ্রেণীর যেসব লেখকদের কথা বলছি অর্থাৎ যারা কিনা ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান খুঁজে পান, তাদের মধ্যে সবাই যে কেবল মুসলমান, তা নয়। খ্রিষ্টানদের মধ্যেও একদল মূর্খ রয়েছে যারা একইরকম ভাবে বাইবেলে বিজ্ঞানের সূত্র সন্ধান করে বেড়ায়। ঠিক তেমনি, হিন্দুদের মধ্যে রয়েছে তথাকথিত 'বেদিক সাইনস'-এর একদল প্রবক্তা। গত বিজেপি সরকারের আমলে বেদকে বিজ্ঞান শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে পুরো ভারতে এরা রীতিমত ঝড় তুলেছিল। এদের অনেকে এখনও সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আমি এই লেখায় মূলত 'কোরানে বিজ্ঞান' খোঁজার বিষয়টির অন্তঃসারশূন্য এবং যুক্তিহীনতার দিকেই মনোনিবেশ করব। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান খোঁজার বিষয়ে ইন্টারনেটে সার্চ করলে প্রচুর লেখা পাওয়া যাবে। আমাদের 'মুক্তমনা' হিউম্যানিস্ট ফোরামেও এই বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক লেখা রয়েছে (উৎসাহীরা ইন্টারনেটে এই ঠিকানায় ব্রাউজ করতে পারেন ঃ www.mukto-mona.com)|

দুই

কোরানে কি সত্যি বিজ্ঞান লুকায়িত?

মনে মনে চিন্তা করছিলাম ব্যাপারটি নিয়ে। এমনটি কেন হয়, বিজ্ঞানীরা যখন কোন কিছু আবিষ্কার করে ফেলেন, কেবল তখনি কতিপয় অন্ধ মুসলমান, খ্রিস্টান ও হিন্দু মূর্খরা এটি তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে আছে বলে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, কিন্তু উলটোটি কখনোই দেখা যায় না, অর্থাৎ কোরান-বেদ-বাইবেলের তথাকথিত লুক্কায়িত সূত্র ধরে কেউ আজ পর্যন্ত একটিও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে পারেনি? আমাকে কেউ কি মাত্র একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইনস জার্নাল (যেমন- Science, Nature, etc)এর নাম বলতে পারবেন যেখানে বিজ্ঞানী তাঁর রেফারেনসের তালিকায় কোরান, বেদ, বাইবেলকে উল্লেখ করেছেন? (আমি গবেষণাধর্মী বিজ্ঞান জার্নালের কথা বলছি; 'বাইবেল-কোরান ও বিজ্ঞান' বা 'মহাগ্রন্থ কোরান ও বিজ্ঞান' জাতীয় স্থূল কোন গ্রন্থের কথা বলছি না।) উত্তর খোঁজতে গিয়ে 'এ মাদার ইন ম্যানভিল' গল্পের কথা মনে পড়ল। আমার কাছে ব্যাপারটা বেশ মজার বলে মনে হল। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, সেসব মুমিন-মুসলমান লেখক ক্বোরাণে বিজ্ঞান আছে বলে চেঁচামেচি করেন, তাঁদের সাথে উপরে উল্লিখিত গল্পের মূল চরিত্র জেরীর মননের অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে, অন্তত মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে। আপন অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে বিনয়ী, প্রত্যয়ী এবং বুদ্ধিদীপ্ত হওয়া সত্ত্বেও জেরী যেমন কল্পনায় একজন মাকে সৃষ্টি করেছে-যিনি সন্তানকে ভালবাসেন, উপহারসহ দেখতে আসেন, তার সাথে সময় কাটান; ঠিক তেমনি কতিপয় মুসলমান লেখক-লেখিকা আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে আপন 'উম্মাহ'র পরিত্রাণের উপায় হিসেবে একের পর এক সৃষ্টি করে চলেছেন, কোরানে বিজ্ঞানের অস্তিত্বের গল্প। এই প্রবণতা একজন মানুষের মধ্যে তখনই ততো বেশি দেখতে পাবেন, তার স্বীয় অস্তিত্ব ও পরিচয়ের সংকট যখন যত বেশি হবে। উপরের গল্পে লেখিকার মাতৃসম স্নেহ, ভালবাসা জেরীকে কল্পনায় মা আবিষ্কারের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অমুসলিমদের বিশাল কর্তৃত্ব কতিপয় মুসলমান লেখক-লেখিকাদের ঠেলে দিচ্ছে কোরানে বিজ্ঞান খোঁজার দিকে। এই শ্রেণীর কিছু শিক্ষিত মুসলমানদের ভয়াবহ অজ্ঞতার কিছু বাস্তব উদাহরণ দেয়া যাক।

মুসলিম আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের অনেকে আমাকে নিয়ে আক্ষেপ করেন। জানতে চান, ধার্মিক মুসলমান পরিবারে জন্ম নিয়েও আমি কেন ধর্মে বিশ্বাস করি না। কেউ কেউ রেফারেন্স দিয়ে আমাকে ইম্প্রেস করার চেষ্টা করেন। যেমন-আরে ভাই, এত বই পড়েন অথচ এটাও জানে না, স্বয়ং আমেরিকার একজন মনীষী (?) পর্যন্ত গবেষণা করে রায় দিয়েছেন, মহানবি মুহম্মদ (সঃ) হচ্ছেন সর্বকালের (!) সর্বশ্রেষ্ঠ (!) মহামানুষ (!)। বিশেষণের ভুল প্রয়োগ দেখে আমি অবাক হই। বুঝতে পারি, অজ্ঞতার চেয়ে ভয়াবহ মানবিক অসুখ ধরনীর বুকে খুব কমই আছে। কারণ আমেরিকার সেই তথাকথিত 'মনীষী'র বইটির সরাসরি ইংরেজি ভার্সন আমি পড়েছি আর এঁদের বেশির ভাগই পড়েছেন এর অসম্পূর্ণ এবং ভুল বাংলা অনুবাদ (যা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বাজারে ছাড়া হয়েছে)। বইটি লেখেছেন মাইকেল এইচ. হার্ট (Michael H. Hart) নামের আমেরিকান একজন সাংবাদিক। বইটির তিনি নাম দিয়েছেন The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History। মাইকেল হার্ট নিজেই বইটির ভূমিকায় (যা অবৈধ বাংলা ভার্সনে অনুপস্থিত) পরিষ্কার করে উল্লেখ করেছেন, তিনি যা করতে চেষ্টা করেছেন, তা হচ্ছে ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী (The most influential) লোকজনের একটি তালিকা তৈরি করতে, যার সাথে যে কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেন এবং যা কোনো ক্রমেই 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ' বা The greatest human beings এর তালিকা নয়। যেমন- বইটিতে ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাববিস্তারকারী মানুষ হিসেবে সর্বপ্রথমে যেমনি মহানবি হযরত মুহম্মদ (স.)'কে স্থান দেয়া হয়েছে, তেমনি একই তালিকায় ৩৯নং-এ আছেন স্বয়ং হিটলার! অন্যান্য র‍্যাংকিং-এ এসেছে স্টালিন, চেঙ্গিস খানদের নাম। মজার ব্যাপার, বইটির অবৈধ বাংলা সংস্করণের সংখ্যা একাধিক এবং টাইটেল বইয়ের নাম এসেছে বিকৃত আকারে, 'ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের তালিকা।' বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অনেকে বইটির কেবল বাংলা অনুবাদ পড়েছেন, আর ইংরেজিটা ছুঁয়ে দেখলেও খুব সম্ভবত The most

influential এবং The greatest men in the human history' এর মধ্যে পার্থক্য বোঝার মত বুদ্ধিমত্তা এদের নেই! তারা অহেতুক রেফারেনসে আপ্লুত হন। কমবেশি একই রকম অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটায় অনেক শিক্ষিত মুসলমান যখন তারা মরিস বুকাইলি নামের সৌদী রাজপরিবারে চাকরী-করা একজন খ্রিস্টান ডাক্তারের (কোন বিজ্ঞানী নয়) একটি বইয়ের বিষয়বস্তুতে। বইটির নাম ঃ 'Bible, Quran and Science'(বাইবেল, কোরান এবং বিজ্ঞান)। মজার ব্যাপার বাইবেল, কোরান এবং বিজ্ঞানের মধ্যে কোরানকে চূড়ান্ত সত্য (?) বললেও মরিস বুকাইলি নিজে কিন্তু মুসলমান হননি! হওয়ার অবশ্য দরকারও নেই, কারণ জানা গেছে, কোরানকে আধুনিক পাঠক-পাঠিকার কাছে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে সৌদী শাসকরা বুকাইলিকে এই দায়িত্ব দিয়েছিল যে তিনি যেন একটি ইম্পেপ্রসিভ বই লিখে দেন। বিনিময়ে বুকাইলি পেয়েছেন বিরাট অঙ্কের পেট্রোডলার!!

তিন

একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নমুনা

বিজ্ঞান কার্য-কারণ(cause and effect) নীতি, অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সলিড গবেষণার ভিত্তিতে এগোয়, কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মূল্য নেই এখানে। আর ধর্মগ্রন্থের পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে অগাধ এবং প্রশ্নহীন বিশ্বাস। তেলে জলে কি আর মেশে? বিজ্ঞানীদের এক-একটি আবিষ্কার প্রকৃত অর্থে বহু বছরের নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন, মৌলিক গবেষণা এবং পূর্বসূরিদের একই বিষয়ে রেখে যাওয়া তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এখানে অলৌকিক গ্রন্থাবলির কোন স্থান নেই। আর তা বলা মানে, একজন বিজ্ঞানীর কৃতিত্বকে খাটো করা। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছি, ডি-এন-এ (DNA)আবিষ্কারের এর কথা। ডি-এন-এ অণুর পুরো নাম ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড। একে বলা হয় 'জীব দেহের প্রধান অণু' (The master molecule of life)। কেউ কেউ আদর করে ডি-এন-এ'কে ডাকেন 'প্রচারমাধ্যমের প্রেয়সী' (The darling of the media)। যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র/ছাত্রী না, তাঁরাও জিন থেরাপি, ক্লোনিং, মানব জিনোম প্রকল্প (Human Genome Project) ইত্যাদির নাম শুনে থাকবেন। এ সবগুলি কাজ ও গবেষণার মূল টার্গেট বা অস্ত্র হচ্ছে ডি-এন-এ (যার সাথে জিনের পার্থক্য হচ্ছে, বিশাল দৈর্ঘ্যের একেকটি ডি-এন-এ অণুতে রয়েছে অনেকগুলি আলাদা আলাদা অংশ, যা জিন (Gene) বলে পরিচিত)। এই ডি-এন-এ'র উপাদান ও গঠন আবিষ্কার করতে বিজ্ঞানীদের সময় লেগেছে প্রায় একশ' বছর। যদিও ১৯৫৩ সালের জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক-এর ডাবল হেলিক্স মডেল ডি-এন-এ আবিষ্কারের ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বায়োলজি বা মলিকুলার বায়োলজির যে কোনো ছাত্র/গবেষক মাত্রই জানেন-পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণের সূত্র ছাড়া ১৯৫৩ সালের যুগান্তকারী ঘটনাটি সম্ভব ছিল না। আমি নিচে ডি-এন-এ আবিষ্কারের ক্রোনোলজিকাল সালগুলো উল্লেখ করছি- (সূত্র : nature, human genome issue)

- ১৮৬৯ সাল-সর্বপ্রথম জীব কোষ থেকে ডি-এন-এ পৃথক করা হয়।
- ১৮৭৯ সাল- মাইটোসিস কোষ বিভাজন পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- ১৯০০ সাল- জোহান ম্যান্ডেলের মটরশুঁটি বিষয়ক গবেষণার সন্ধান লাভ।
- ১৯০২ সাল-বংশগতি (Hereditar) বিষয়ে:ক্রোমোজোম তত্ত্বের ধারণার উদ্ভব।
- ১৯০৯ সাল- সর্বপ্রথম 'জিন' শব্দটি চালু হয় (এটি কোরানে বর্ণিত কোন 'জিন' নয়-লেখক)।
- ১৯১১ সাল- ফ্রুট ফ্লাই (Drosophila melanggaster) নিয়ে গবেষণা ক্রোমোজোম তত্ত্বের ধারণাকে শক্তিশালী করে।
- ১৯৪১ সাল-এক জিন এক এনজাইম তত্ত্বের ধারণা।
- ১৯৪৩ সাল-এক্সরে ডিফ্রেকশন (Xray diffraction) টেকনিকের প্রয়োগ করে ডি-এন-এর উপর গবেষণা করা হয়।
- ১৯৪৪ সাল-ডি-এন-এ ট্রান্সফরমেশন (Transformation) নীতির আবিষ্কার।
- ১৯৫২ সাল-জিন যে আসলে ডি-এন-এ দিয়ে তৈরি, তা জানা যায়।
- ১৯৫৩ সাল-জেমস ওয়াটসন, ফ্রান্সিস ক্রিক এবং উইলকিনস ডাবল হেলিক্স মডেল-এর মাধ্যমে ডি-এন-এ'র গঠন ও উপাদান ব্যাখ্যা করেন (সেসময় ওয়াটসনের বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর-লেখক)। ১৯৬৩ সালে সে জন্য তাঁদেরকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, ওপরের উদাহরণ দ্বারা আশা করি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, কোরান-বেদ-বাইবেলের সাথে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সামঞ্জস্য খোঁজা একধরণের অজ্ঞতা ও আহাম্মকি বৈ অন্য কিছু নয়। অথচ কেউ কেউ তাই করছেন। আর এ হীন কাজে তাদের সঙ্গী হচ্ছেন স্বার্থান্বেষী, লোভী এবং নামসর্বস্ব প্রচারপ্রিয় বিজ্ঞানী। যেমন-বাংলাদেশে ড. শমসের আলী "Scientific Indications in The Holy Quran" নামক বইটির তৃতীয় কভার পেজে কোরানের একটি আয়াত উল্লেখ করে তার সাথে বড় করে ডি-এন-এ অণুর ছবি জুড়ে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে, কোরানে ডি-এন-এ ব্যাপারে পর্যন্ত ইঙ্গিত রয়েছে। আয়াতটি এ রকম- "*এবং তোমাদের এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের গঠন-প্রকৃতিতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে সংবাদ*"(৪৫ঃ৪)

বলুন তো, এর সাথে ডি-এন-এ অণুর সম্পর্কটা কোথায়? এই মূর্খতা (নাকি, শঠতা) শেষ হবে কবে? এবার ভ্রুণতত্ত্বের সাথে ক্বোরাণের

তথাকথিত মিলের ব্যাপারে একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

ভ্রুণতত্ত্ব (Embroyology) কি ক্বোরাণ থেকে এসেছে?

ক্বোরাণের বহু জায়গায় বলা হয়েছে, জমাট রক্ত থেকে মানুষের সৃষ্টি করা হয়েছে (২৩ঃ১৪; ৭৫ঃ৩৮; ৯৬; ২); যার সাথে বিজ্ঞানের অমিল ছাড়া কোনো মিল নেই। 'জমাট রক্ত' প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে বার বার কেন কোরানে আসল? এ রকম প্রশ্ন মনে আসতেই পারে। এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের একটুখানি দৃষ্টি দিতে হবে হজরত মুহম্মদের পূর্ববর্তী সমাজ ও ইতিহাসের দিকে। মুহম্মদের জন্ম (৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের জন্মের (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪) প্রায় একহাজার বছর পরে। দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান তখনও (এমনকি এর পরেও) এরিস্টটলের চিন্তা-চেতনার মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছিল। স্বাভাবিক কারণেই এরিস্টটলীয় এসব ধারণা কম বেশি মুহম্মদকেও প্রভাবিত করেছিল। এক্ষেত্রে মুহম্মদের নিরক্ষরতা বড় কোন বাঁধা হওয়ার কথা নয়। যিশু, গৌতম বুদ্ধও নিরক্ষর ছিলেন। জমাট বাঁধা রক্ত (আলাক্বা, আরবীতে) থেকে জন্মের তত্ত্বটি এসেছে মূলত গ্রীকদের কাছ থেকে। এরিস্টটলকে জীববিজ্ঞানের জনক বলা হলেও জীব সম্পর্কিত তাঁর অনেক তত্ত্বই কালক্রমে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যেমন-মানব প্রজনন সম্পর্কে এরিস্টটল এই ভ্রান্তধারণাতে বিশ্বাস করতেন যে, যৌবনবতী মহিলার ঋতুস্রাব (menstrual blood) এর ওপর পুরুষের বীর্যের ক্রিয়ার ফলেই মাতৃগর্ভে শিশুর জন্ম হয়ে থাকে! জমাট-বাঁধা রক্ত থেকে জন্মের কোরানিক তত্ত্বে এরিস্টটলের এই ভ্রান্ত ধারণারই প্রতিফলণ ঘটেছে। সন্দেহ নেই, কোরানের এই ধারণাটি মারাত্মকভাবে ভুল। অথচ অনেক মুমিন এই সত্যকে মেনে নিবেন না কেবলমাত্র এই অন্ধবিশ্বাসের কারণে-'কোরান আল্লাহর বাণী, কাজেই ভুলত্রুটির ঊর্দ্ধে।' মূলত ভ্রুনের পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরে এমন কোন পর্যায় নেই, যেখানে ভ্রুনকে জমাট রক্ত সদৃশ মনে হতে পারে, যখন মিসকারেজ (miscarriage) বা প্রাকৃতিক উপায়ে গর্ভপাত ঘটে। তর্কের খাতিরেও যদি মেনে নেই ভ্রুনটি জমাট রক্ত সদৃশ, তাহলেও ভুলে যাওয়া চলবে না-এটি কেবল মৃতভ্রুণের ক্ষেত্রে ঘটে অর্থাৎ যেটির আর পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে রূপান্তরিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

জমাট রক্ত আসলে কী, সে সম্পর্কে প্রাণ রাসায়নিক (Biochemical) ব্যাখ্যাটা এখানে জেনে নেয়া ভাল, যাতে তথাকথিত ধর্মীয়-বিজ্ঞানের সমর্থকরা মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা বারবার আমাদের বিভ্রান্ত করার সুযোগ না পান। আঘাত বা দুর্ঘটনার ফলে রক্তক্ষরণ ঘটলে শরীরে স্বাভাবিক নিয়মেই ক্ষত বা আঘাতের স্থানে রক্ত জমাট বাঁধে। কৈশিক রক্তনালীর (capillary blood vessels) চাইতে বড় যে কোন রক্তনালী থেকে রক্তক্ষরণ ঘটলে জখম বা আঘাতের স্থানে রক্ত জমাট বাঁধে যাতে অতিরিক্ত ক্ষরণ আর না ঘটতে পারে। এ ক্ষেত্রে অনুচক্রিকা বা প্লেটলেট (তিন প্রকার রক্তকোষের একটি) এর ভূমিকা সর্বপ্রধান এবং সর্বপ্রথম। যখন শরীরে কোথাও কোন জখম বা আঘাত ঘটে, স্বাভাবিক অনুচক্রিকাগুলি তখন সক্রিয় অনুচক্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এ গুলির তখন আকৃতির পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং এরা আঠালো হয়ে রক্তনালীর দেয়ালে জমা হয়ে প্লাগ(Plug) তৈরী করে। এই সক্রিয় অনুচক্রিকাগুলি থেকে একই সময়ে রক্তপ্লাজমায় বিশেষ এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ ঘটে থাকে। অনেকগুলি জটিল প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে ফাইব্রিনোজেন তখন ফ্রাইব্রিনে পরিণত হয়। ফ্রাইব্রিন হচ্ছে এক ধরণের অদ্রবণীয় প্রোটিন যা ফাইব্রিল নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুতা জাতীয় বস্তুর সমন্বয়ে জটিল জালিকার সৃষ্টি করে। রক্তকোষ এবং প্লাজমা (উভয়ের সমন্বয়েই রক্ত গঠিত) তখন ফাইব্রিলের এই জালে আটকা পড়ে গিয়ে ক্লট বা জমাট রক্তের সৃষ্টি করে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং কোরান

গ্রহ-নক্ষত্র এবং জ্যোতিষ্কমন্ডলী সম্পর্কে 'আল-ক্বোরাণের' ব্যাখ্যা একটু পর্যালোচনা করা যাক; কেননা ভ্রুণবিদ্যার মত এটিও 'ধর্মীয়-বিজ্ঞানী' এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক মুমিন বান্দাদের আরেকটি অতি প্রিয় বিষয়। সন্দেহ নেই, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) অনেক মুসলিম-মনীষীদের মৌলিক গবেষণা এবং অধ্যয়নের নিকট প্রভূতভাবে ঋণী। উদাহরণস্বরূপ আল-সুফী, আল-বিরুণি, আল-জারকালি প্রমুখ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নাম করা যায়। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, এসব মনীষীরা কোরান বা অন্য কোন ধর্মীয়গ্রন্থের সূত্র ধরে কিছুই আবিষ্কার করেননি। কেননা ক্লাসিক্যাল ইসলাম বা স্বর্ণযুগে (ঞযব এড়ষফবহ অমব ড়ভ ওংষধস) মুসলমান মনীষীরা যতটা না ছিলেন আচারসর্বস্ব মুসলমান, তার চাইতে অধিক তাঁদের পরিচিত ছিল 'যুক্তিবাদী' মনীষী হিসেবে। এঁদের সম্পর্কে পাকিস্তানের বিখ্যাত নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানী এবং কায়েদে-এ আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পারভেজ হুডবয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য[2] : ".... ইসলামের স্বর্ণযুগে বিজ্ঞান অগ্রগতি লাভ করেছিল কারণ-ইসলামের অভ্যন্তরে তখন ছিলেন মুতাজিলা নামধারী শক্তিশালী যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের ধারক একদল চিন্তাবিদ। "সবকিছুই পূর্ব-নির্ধারিত এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ব্যতিত মানুষের অন্য কোন উপায় নেই"- নিয়তিবাদীদেও এ মতবাদের তীব্র বিরুদ্ধাচরণ করে মুতাজিলারা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মুতাজিলারা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতায় ছিলেন, জ্ঞান তখন সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে গোঁড়া ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আল-গাজ্জালীর নেতৃত্বে ইসলামী রক্ষণশীলতার পুনরার্বিভাব ঘটে। আল-গাজ্জালী যুক্তির স্থলে দৈববাণী এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির স্থলে নিয়তিকে তুলে ধরেন। কার্য এবং ক্রিয়ার (cause and effect) সম্পর্ককে তিনি অস্বীকার করেন এই বলে যে, মানুষের ভবিষ্যৎ জানার শক্তি নেই, কেবল সৃষ্টিকর্তা এ বিষয়ে অবগত। গণিতশাস্ত্রকে আল-গাজালি 'ইসলাম বিরোধী' এবং 'মানবমনের জন্য ক্ষতিকারক' বলে মন্তব্য করেন। গোঁড়ামির জালে ইসলামের সমৃদ্ধি আটকা পড়ে যায়। মহামতি খলিফা আল-মামুন এবং হারুন-আল-রশিদ এর শাসনামলে রাজদরবারে মুসলিম, খ্রিস্টান এবং ইহুদী

মনীষীদের একত্রে জড়ো হয়ে জ্ঞান-চর্চা এবং মত-বিনিময় করার যে প্রবণতা বহাল ছিল, তা পরবর্তীকালে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বে সহিষ্ণুতা, মেধা এবং বিজ্ঞানের মৃত্যু ঘটে। যুক্তিবাদী ধারার সর্বশেষ মুসলিম মনীষী হচ্ছেন চতুর্দশ শতাব্দীর আবদাল রাহমান ইবনে খালদুন।"

ক্ল্যাসিক্যাল ইসলাম যুগের অনেক মুসলমান মনীষীর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ কোরানের অনেক আয়াতকে 'অযৌক্তিক' এবং 'অবৈজ্ঞানিক' প্রমাণ করেছে। যেমন: কোরানের বর্ণনা অনুযায়ী, সূর্য অস্তমিত হয় একটি 'পঙ্কিল জলাশয়ে' বা muddy spring- এ (১৮:৮৬), তেমনি উদিত হয় একটি বিশেষ স্থান থেকে (১৮:৯০)। আমরা জানি, খালি চোখে সূর্য পূর্বাকাশে উদিত হয় এবং পশ্চিমাকাশে অস্ত যায় বলে মনে হলেও বিজ্ঞানের বিচারে তা আসলে সত্য নয় কেননা মহাশূন্যে অবস্থিত রয়েছে আমাদের সৌরজগতটি এবং সূর্য সেটির কেন্দ্র। পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন অবিরত ঘুরছে, ঠিক তেমনি এরা নিজেদের কক্ষপথে হচ্ছে আবর্তিত অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান লাটিমের বেলায় যেমনটি হয়। প্রায় ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী নিজস্ব কক্ষপথে একবার ঘুরে। এই কারণে সৌর জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত সূর্যের সকল আলো একই সাথে এসে গোলাকার ও ঘূর্ণায়মান পৃথিবী গায়ে এসে পড়তে পারে না। যেখানে পড়ে, সেখানটায় হয় দিন; বাকি জায়গায় অন্ধকার অর্থাৎ রাত। কিন্তু কোরানে বর্ণিত গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কিত বক্তব্যের সাথে বিজ্ঞানের এসব তথ্যের কোনো মিল নেই। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। গ্রীক ধারণার বশবর্তী হয়ে সেসময় প্রায় সকলে অজ্ঞতাবশত বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীর আকার গোলাকৃতি নয়, বরং চ্যাপ্টা; এবং পৃথিবী হচ্ছে মহাবিশ্বের কেন্দ্র (একে বলা হয় এরিস্টটলের ভূকেন্দ্রিক মহাবিশ্ব সম্পর্কিত মতবাদ বা Geocentric theory of universe)। তবে মুসলিম গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ আল-বিরুনি সে সময়ও (মৃত্যু ১০৪৮ সাল) বিশ্বাস করতেন যে, ঘূর্ণনশীল মহাবিশ্বের আকৃতি হচ্ছে গোল এবং মোটেও চ্যাপ্টা নয়। তাই বিজ্ঞানী বলতে হলে আল-বিরুণিকে বলা উচিৎ, কোনো পয়গম্বরকে নয়।

উপরের তথ্যগুলি দ্বারা এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা হয় যে, কোরান আসলে বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, ধর্মীয় গ্রন্থই (কেউ কেউ আবার দাবি করেন এটি আসলে মানুষেরই তৈরি একটি গ্রন্থ)। তাদের যুক্তি, তা না হলে মহাজ্ঞানী আল্লাহ কী করে সক্রেটিসের ভ্রান্তমতবাদগুলি পবিত্র আল-কোরানের পাতায় নিয়ে আসলেন? কোরানে এরকম অবৈজ্ঞানিক এবং অসামঞ্জস্যে ভর্তি বর্ণনার আরও কিছু উদাহরণ রয়েছে। কোরানের একটি আয়াত (২:২৯) অনুযায়ী, আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বেহেস্ত বা স্বর্গ সৃষ্টিতে মনোযোগ দিয়েছেন। আবার একই ক্বোরাণের অন্য স্থানে (৭৯:২৭-৩০) বলা হয়েছে, প্রথমে স্বর্গ বা বেহেস্ত তৈরীর কাজে আল্লাহ হাত দেন। অতঃপর দিন-রাত এবং সবশেষে পৃথিবী। আরেক জায়গায় বেহেস্ত এবং পৃথিবী তৈরির মোট সময় সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ ভুল করেফেলেছেন! যেমন : কোরানের কিছু কিছু আয়াত (৭:৫৪, ১০:৩, ২৫:২৯) অনুযায়ী আল্লাহ সর্বমোট ছয় দিনে বেহেস্ত ও পৃথিবী বানিয়েছেন; কিন্তু একই ক্বোরাণের ৪১: ৯ আয়াত অনুযায়ী, আল্লাহ দুই দিনে পৃথিবী তৈরি করেছেন এবং সেখানে প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরিতে সময় লেগেছে আরও চারদিন (আয়াত ৪১:১০)। সবশেষে বেহেস্ত ও পৃথিবী সৃষ্টিতে মোট ব্যয়িত সময় হচ্ছে (২+৪+২) সর্বমোট ৮ দিন। তাহলে বেহেস্ত ও পৃথিবী সৃষ্টিতে সর্বমোট ব্যয়িত সময়ের ক্ষেত্রে মহাসত্য গ্রন্থ আল-কোরানের কোন বিবরণটি আসলে সত্য? ছয় (৬) দিন, নাকি আট (৮) দিন?

চার

বেদ চার-পাঁচ হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে আছে, কোরানের বয়সও দেড়হাজার বছরের কাছাকাছি; সেই তুলনায় আধুনিক বিজ্ঞানের বয়স মাত্র কয়েকশ বছর। অথচ দেখুন, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, টেলিভিশন, রেল-কার উড়োজাহাজ, কম্প্যুটার-সবই কিন্তু গত দু'তিনশ বছরেই আবিস্কৃত হয়েছে। কেন আমাদের এতো 'মহাবিজ্ঞানী' পয়গম্বররা এগুলির একটিও আবিষ্কার করতে পারেননি? চিন্তা করে দেখুন, সামান্য একটা মোটরযান সে সময় থাকলে সংবাদবাহককে উটের পৃষ্ঠে চড়ে কষ্ট করে রোদ-বৃষ্টি পোহায়ে নবির সংবাদ নিয়ে এখানে-সেখানে যেতে হত না। রিমোর্ট কন্ট্রোলড ফাইটার প্লেন বা মিসাইল থাকলে ঘর থেকেই শত্রু নাশ করা যেত, অকারণে সাহাবিরা মারা যেতেন না; কেউ নিজের দন্তগুলিও খোয়াতেন না শত্রুর পাথরের আঘাতে! তথাপি, বিশেষ বাহনে চড়ে সাত আসমানের ওপরে বেহেস্ত-দোযখ দেখার কাহিনী শুনে আবেগে অনেকের চোখে জল চলে আসে, কিন্তু মস্তিষ্কে কোনো প্রশ্ন আসে না! কাজেই কার্য-কারণ (cause and effect) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে কোরাণ- বেদ-বাইবেলকে না মেলানোই উত্তম।

কোনটি বিজ্ঞান আর কোনটি ভূঁয়া বিজ্ঞান?

এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও অনেক মুসলিম মনে করেন, আমাদের নবি সাধারণ রক্তমাংসের কোন মানুষ ছিলেন না, ছিলেন নূরের তৈরি (এই কারণে বাংলাদেশে একবার কেউকেউ দাবি তুলেছিল, হাইস্কুলের বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলী লিখিত 'মানুষ মুহম্মদ' প্রবন্ধটি নিষিদ্ধ করার জন্য; যদিও লেখাটি নবি মুহম্মদের সম্পূর্ণ পক্ষে ছিল), নবীর আঙুলের ইশারায় চাঁদ দু' টুকরো হয়ে গিয়েছিল। দেশে তো বটেই, এমনকি প্রবাসেও বাঙালী মুসলিমরা এরকম বয়ান শোনার জন্য অল্পশিক্ষিত মোল্লাদের হাজার হাজার পাউন্ড-ডলার খরচ করে দেশ থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসেন। সম্প্রতি আমরা জেনেছি, কেবল সৌরজগতের একা (মিলিয়ন মিলিয়ন সৌরজগৎ নিয়ে তৈরি এক-একটি গ্যালাক্সী আর মহাবিশ্বে এ রকম বহু বিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে। আমাদের সৌরজগত মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে অবস্থিত) রয়েছে কমপক্ষে ২১টি উপগ্রহ বা চাঁদ (সূত্র: ন্যাশনাল জিওগ্রাফী)। নিশ্চয় সেসময় এই ২১টি চাঁদের খবর জানা থাকলে, আজ হয়তোবা আমরা শুনতাম কোনো মহাপুরুষের আঙুলের ইশারায় ২১টি চাঁদ দু' টুকরো হয়ে গিয়েছিল! তখন নিশ্চয় কারো-কারো সারাজীবন চোখের জল ফেলতে হত ভাবাবেগের ঠেলায়।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোন বিষয়টি বিজ্ঞান আর কোন বিষয়টি বিজ্ঞান নয়-এ ব্যাপারটি একজন সাধারণ মানুষ বুঝবেন কী করে? বিষয়টি সুরাহার জন্য বিশ্বজনীন বিজ্ঞান গবেষণার অনেকগুলি নীতিমালা (criteria) চালু আছে। এদের একটি, যাকে ইংরেজিতে replicability বলা হয়, বাংলা হচ্ছে- গবেষণার ফলাফলের অভিন্নতা। ব্যাপারটি হাইপোথেটিক্যালি একটু ব্যাখ্যা করা যাক। ধরুন, কেউ একজন দাবি করে বসলেন, তিনি ক্যান্সার বা এইডস নিরাময়ের একটি ওষুধ পেয়ে গেছেন এবং সেটি ১০০% কার্যকরী। এখন লোকটির সেই দাবি কি একজন বিজ্ঞানী মেনে নেবেন, নাকি স্রেফ পাগলামি বলে বাতিল করে দিবেন? এই ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণা ছাড়া কোন মন্তব্যই করার অধিকার রাখেন না। কিন্তু প্রশ্ন হল, পরীক্ষা করতে হলে তাঁকে কিভাবে এগুতে হবে? এই ক্ষেত্রে যিনি ওষুধটি আবিষ্কার করেছেন, তাঁকে প্রয়োজনীয় তথ্যের যোগান দিতে হবে। তবে গোপনে তা করতে হবে না। যেকোন স্ট্যান্ডার্ড সাইন্স জার্নালে তিনি ওষুধটি আবিষ্কারের পদ্ধতি এবং কার্যকারিতা বিষয়ে যেসব রোগীদের ওপর গবেষণা চালিয়েছেন, সেসবের সংশ্লিষ্ট বিবরণ এবং উপাত্ত (statistical data) ছাপাবেন। এখন অন্য আরেকজন বিজ্ঞানী (পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের) একই পদ্ধতি এবং পরিবেশে গবেষণা করে যদি ওষুধটির কার্যকারিতার বিষয়ে একইরকম বা প্রায় কাছাকাছি রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন, কেবল তখনই একজন বিজ্ঞানী বলতে পারেন ক্যান্সার বা এইডসের ওষুধটি আসলেই একটি নতুন আবিষ্কার এবং ১০০% কার্যকরী। এরই নাম replicability। কথিত 'মিরাজ' এর কাহিনী, বা যীশুর 'পুনুরুত্থান' এর কাহিনী বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত নয়, কারণ এটি কখনই কোন বিজ্ঞানী কর্তৃক তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক- কোন ভাবেই প্রদর্শন বা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। একই রকম কথা বলা যায়-'স্বপ্নে পাওয়া গাছ দিয়ে চিকিৎসা' জাতীয় পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত পীর-তান্ত্রিক-বাবাদের প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন সম্পর্কে। নর্থ আমেরিকার বিখ্যাত ম্যাজিসিয়ান (যিনি 'মুক্তমনা'র একজন লেখকও বটে) জেমস র‍্যান্ডির এ বিষয়ে একটি মজার চ্যালেঞ্জ আছে। যেকেউ বিজ্ঞানের নীতিমালা মেনে নিয়ে অলৌকিকত্ব বা সুপারন্যাচারাল বিষয়ে প্রমাণ দিতে পারলে নগদ এক মিলিয়ন ডলার পুরস্কার পাবেন।[3] আমাদের দেশের তথাকথিত 'পীর' এবং 'আধ্যাত্মিক সাধক-সাধিকারা' চাইলে র‍্যান্ডির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রবীর ঘোষও অনুরূপ চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছেন বহুদিন থেকে। বাংলাদেশের জনপ্রিয় ম্যাজিশিয়ান জুয়েল আইচেরও এ ব্যাপারে একটি ঘোষণা আছে। ল্যাবরেটরিতে কেউ অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপারের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারলে তাকে একাধিক লক্ষ টাকা (রিয়েল ফিগারটা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না-লেখক) পুরস্কার দেয়া হবে। বাংলাদেশে হাজার-হাজার পীর-ফকির-তান্ত্রিকদের কেউই আজ অবধি জুয়েলের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন বলে আমার জানা নেই। অথচ প্রতিনিয়ত পত্রিকায় প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপণের মাধ্যমে হতাশাগ্রস্থ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন পাবলিকের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

প্রশ্ন আসতে পারে, বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষায় কি ভুল হতে পারে না? কিংবা, বিজ্ঞানের কথাই কি সর্বদা ধ্রুব সত্য বলে মানতে হবে? উত্তরে বলব: বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবশ্যই ভুল হতে পারে, অনেক সময় হয়ও; কিন্তু একজন বিজ্ঞানী বা তাঁর তত্ত্বকে যদি অন্য আরেকজন বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (পরীক্ষা-নিরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা) দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ভুল প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে প্রথম বিজ্ঞানীকে নতুন তথ্য উপাত্ত-ফলাফলের ভিত্তিতে তার থিওরী অবশ্যই পর্যলোচনা করতে হবে, তা তিনি প্রফেসর স্টিফেন হকিংনস বা ডঃ কদম আলী, যেই হোন না কেন। বিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ট্যটি যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদীদের বেশি আকৃষ্ট করে থাকে, তা হচ্ছে এই ব্যাপারটি। সে জন্যই বলেছি, বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত মতামতের মূল্য নেই। ধর্মগ্রন্থের সাথে বিজ্ঞানের এটিই মূল তফাৎ। কোরান অপরিবর্তনীয়, অলংঘনীয়; বিজ্ঞান তা নয়, কেননা পরিবর্তনশীলতা হচ্ছে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য আর সতত পরিবর্তনশীল সেই প্রকৃতির রহস্যের উন্মোচন হচ্ছে বিজ্ঞানের মহান লক্ষের একটি।

শেষ কথা

ধর্ম সম্পর্কীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং অতি-প্রাকৃতিক কাহিনী সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করলে অনেকে আমাকে প্রায়শই এই বলে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন, ভাই যার যার বিশ্বাস তাঁর কাছে। কেন খামোখা মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করে তাঁদের কষ্ট দেন? বলতে ইচ্ছা হয়, মানুষকে অহেতুক কষ্ট দিয়ে যাঁরা চিত্তে সুখ অনুভব করেন, তারা স্যাডিস্ট এবং আমি মোটেও তাদের একজন নই। তবে কেন আমি ক্বোরাণ এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে এতসব কথা লিখছি? এতে কি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে আঘাত লাগতে পারে না? প্রশ্ন আসতেই পারে। আর তার জবাবও রয়েছে।

মুসলমানরা সংখ্যায় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। মোটেও চাট্টিখানি কথা নয়। এক বিলিয়নের মত মুসলমানদের ঘরে শিশু-কিশোরদের সংখ্যা কত হতে পারে? নিশ্চয়ই তা সংখ্যার মাপে বিশাল এবং গুরুত্বপূর্ণ। এখন এই কয়েক শতকোটি কিশোরেরা কি করে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হবে যদি তাদের মাতা-পিতা, গুরুজনদের সকলেই বিশ্বাস করেন যে, আল-কোরানেই রয়েছে সকল বিজ্ঞান? তাঁরা কি জবাব দেবেন (বা দিচ্ছেন) যদি তাদের স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানের ক্লাশ এটেন্ড করে এসেই জিজ্ঞাস করে: আচ্ছা, আব্বু-আম্মু, বিজ্ঞানের কার্য-কারণ (cause and effect) নীতির সাথে ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আদম-হাওয়া-শয়তান, ফুঁক দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি কি মেলে? কিংবা, ঝড়-বৃষ্টিতো প্রাকৃতিক কারণে ঘটে থাকে, এর সাথে ফেরেস্তা মিকাইলের কি সম্পর্ক? আমার খুব জানতে ইচ্ছা হয়, মুসলমান বাবা-মায়েরা এসব প্রশ্নের উত্তরে কি বলেন তাদের সন্তানদের। তাঁরা কি বলেন, 'বিজ্ঞানের ক্লাশে যা শিখেছো সব মিথ্যে আর ধর্মগ্রন্থের বর্ণনাই সত্যি?' নাকি, 'বিজ্ঞান এবং ধর্মগ্রন্থ দুটোই সত্যি?' এই দুটো উত্তরই মিথ্যা। আমার বিশ্বাস, সকলে না হলেও মুসলমান মাতা-পিতার অন্তত কেউ কেউ সন্তানদের সামনে সত্য গোপন করাটাকে প্রশ্রয় দেন না এবং সরাসরি বলে দেন, 'কার্য-কারণ নীতি'র উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের

সাথে ধর্মগ্রন্থের কোনো মিল নেই। মিল খোঁজার চেষ্টা করা বৃথা। এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয়।' যে সব মাতা-পিতা এই সত্যটি তাঁদের সন্তানদের কোন রাখ-ঢাক ছাড়াই বলার ক্ষমতা রাখেন, তাঁরা কেবল নিজেদের সন্তানদের সত্য, সুন্দর এবং বিজ্ঞানধর্মী মানসিকতা বিকাশের পথটিই সুগম করেন না; তাঁরা এ ক্ষেত্রে মানবতারও একটি উপকার করছেন। কেননা, আমরা সবাই জানি আগামীদিনের সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি আমরা আজই শুরু করতে পারি, তা হচ্ছে- আমাদের নতুন প্রজন্মকে সত্য, সুন্দর এবং বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা।

Z_" ZwjKv:

১ Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality by Pervez Hoodbhoy
২ Pervez Hoodbhoy, "Muslims and the West After September 11," Washington Post (2002).
৩. www.randi.org

যুক্তিবাদ : একটি দর্শন একটি আন্দোলন

মফিজুর রহমান রুন্নু

'যুক্তিবাদ' কথাটির উৎস দর্শন। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক রেনে দেকার্তের (১৫৯৬-১৬৫০) দর্শনকেই আধুনিক যুক্তিবাদের ভিত্তি বলা যায়। স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭), লাইবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬) প্রমুখ ছিলেন যুক্তিবাদী দার্শনিক। পাশ্চাত্য দর্শনের এই 'যুক্তিবাদ' কথাটিকেও ইংরেজিতে `Rationalism' বলা হয়েছে। এই `Rationalism' শব্দটির বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে 'যুক্তিবাদ' বা 'বুদ্ধিবাদ'। তবে আমরা অর্থাৎ যুক্তিবাদী কর্মী সংগঠকগণ 'যুক্তিবাদ বলতে যেটা বুঝি সেটা আর আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের 'যুক্তিবাদ' কথাটির অর্থ এক নয়, বরং বিপরীত।

কোনো বিষয়ে আমরা যদি যথার্থভাবে জানতে না পারি তবে, সে বিষয় সম্পর্কে আমাদের যথার্থ জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। কোনো বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারলে অর্থাৎ শুধু বিশ্বাস নয়, সে বিশ্বাসের সমর্থনে যদি সাক্ষাৎপ্রমাণ বা শক্তিশালী যুক্তি না থাকে তবে সে বিষয়ে আমাদের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। ধারণা থেকে বা বিশ্বাস থেকে জ্ঞানলাভ হয় না। জ্ঞান মানে নিশ্চিতিবোধ। যে সব বিষয় সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা চলে তাকে আমরা সত্য বা নিশ্চিত জ্ঞান বলে দাবী করতে পারি না। সত্যকে সন্ধান করা দর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ। আমরা কীভাবে সত্যে উপনীত হতে পারি বা সঠিক জ্ঞানলাভ করতে পারি সে পথ বা পদ্ধতি সম্পর্কে পাশ্চাত্য দর্শনে প্রধানত চারটি ভিন্ন মতবাদের জন্ম হয়েছে :

১. যুক্তিবাদ বা বুদ্ধিবাদ (Rationalism)
২. প্রত্যক্ষবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism)
৩. বিচারবাদ (Critical Theory) ও
৪. দ্বান্দ্বিকবাদ (Dialectic Theory)

পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিবাদ বা বুদ্ধিবাদের মূলকথা হলো–আমাদের বুদ্ধি বা মস্তিস্কজাত যুক্তিবোধই সঠিক জ্ঞানলাভের সব থেকে নির্ভরযোগ্য। এ ক্ষেত্রে পঞ্চইন্দ্রিয়ের ভূমিকা গৌণ। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে জ্ঞানের পর্যায়েই ফেলতে চাননি। তাঁরা বলেন–ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের সর্বক্ষেত্রেই সঠিক তথ্য দেয়, এটা বলা যাবে না। বরং প্রায়শই সেগুলো আমাদের ভুল তথ্য দেয়। অনেক সময় আমাদের রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম হয়। সুতরাং সত্যে উপনীত হতে বা সঠিক জ্ঞান লাভের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হলো আমাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা যুক্তি। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বুদ্ধিবাদ বা যুক্তিবাদ ভাববাদী দর্শনের আওতাভূক্ত। ভাববাদী দার্শনিকগণ গুরুত্ব দেন মানুষের বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা স্বজ্ঞাকে। ভাববাদীদের মতে বিশ্বজগতের বাস্তব অস্তিত্বের থেকে বিশ্বাসযোগ্য হলো আমাদের বুদ্ধি বা চেতনা। বাস্তব বা দৃশ্যমান জগৎ মায়া, আমাদের চেতনাটাই প্রধান। এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণও ভাববাদী ছিলেন, বস্তুবাদী নন। তাঁদের ঈশ্বর বা ধর্ম বিশ্বাসও ছিল গভীর।

সুতরাং পাশ্চাত্যের 'যুক্তিবাদ' আর আমাদের 'যুক্তিবাদ' স্পষ্টতই ভিন্ন, এটা আমাদের কাছে পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কয়েক দশক ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুক্তিবাদী সংগঠনগুলো ভিন্নধারার যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তা বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান নির্ভর যুক্তিবাদের ভিত্তিতেই। পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিবাদ ভাববাদেরই অংশ। আবার যাকে পাশ্চাত্য দর্শনে 'বিজ্ঞানবাদ' বলা হয় সেটার মধ্যেও বিজ্ঞান নেই, আছে ভাববাদ। আমরা জানি যুক্তিও নানা রকমের হতে পারে। সবাই নিজ যুক্তিকে অভ্রান্ত মনে করে। কোনো কোনো মাওলানাকেও নিজ নামের শেষে 'যুক্তিবাদী' কথাটি জুড়ে দিতে দেখা যায়।

আমাদের 'যুক্তিবাদ' স্পষ্টতই বস্তুবাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়েছে এবং তা আধুনিক বিজ্ঞানকেই তার শক্তির উৎস বলে মনে করে। যুক্তিবাদীরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বস্তুবাদের উপরেই নির্ভর করে। তারা মনে করে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক–এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই বস্তুগত ধারণা লাভ করা যায়। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ছাড়া সঠিক জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি চোখ-কান বুজে বস্তুজগতের সাথে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তার পক্ষে সত্যের সন্ধান পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যের 'প্রত্যক্ষবাদ' (Empiricism) সমর্থনকারী দার্শনিকগণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত ধারণাকেই জ্ঞানের উৎস বলে মনে করেন। জন্মের সময় মানুষের মন একেবারে অলিখিত সাদা কাগজের মতো থাকে, সেখানে ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলো একে একে ছাপ ফেলে। আমরাও এই প্রত্যক্ষবাদীদের মতোই মনে করি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রাথমিকভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতিরূপে নিম্নতর স্তরে থাকে, পরে এটাই মস্তিস্ককে প্রভাবিত করে আমাদের সঠিক তথা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানলাভে সাহায্য করে। চোখ বুজে, ধ্যান করে বা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে জানা যায় না। আর সেভাবে কোনো কিছুকে ব্যাখ্যা করতে গেলেই ভুল হবে। যুক্তিবাদীরা বিশ্বজগৎকে 'মায়া' মনে করে না, তা বাস্তব অস্তিত্বশীল বলেই মানে। মানুষের আবির্ভাবের আগেই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তু জগৎ আমাদের চেতনার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং আমাদের

চেতনাই বস্তুজগতের ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বজগৎ আমাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষ ভাবেই বিরাজ করে। এ বিশ্বজগৎকে জানা যায়, তার বিভিন্ন বিষয়কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োগের মাধ্যমে বোঝা যায় এবং তার বিধিনিয়ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়। এভাবেই আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রাথমিক জ্ঞান ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং যাচাই-এর মাধ্যমে বিজ্ঞানে উন্নীত হতে পারে। এ কারণে যুক্তিবাদীদের দার্শনিক ভিত্তি বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান। এ কারণেই যুক্তিবাদীরা সমস্ত অধ্যাত্মবাদ, অলৌকিকতা ও ভাববাদ প্রকৃত অলীক কল্পনাকে অস্বীকার করে। তারা তাদের সমস্ত সিদ্ধান্তে যুক্তিনিষ্ট অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানভিত্তিক নির্মোহ জ্ঞানকে প্রাধান্য দেয়। বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে কোনো যুক্তিবাদের অস্তিত্ব নয়।

'যুক্তিবাদ' নতুন কোনো মতবাদ নয়, বা হঠাৎ গজিয়ে উঠা ভুঁইফোড় কোনো বিষয়ও নয়। প্রাচীন যুগ থেকেই চিন্তাশীল মানুষের চিন্তা চেতনায় বিভিন্ন সময়ে এর স্পূরণ ঘটেছে। মানুষ চিন্তাশীল জীব; যুক্তিবাদীতা তার চিন্তাধারার একটি স্বাভাবিক দিক। কোনো নির্দিষ্ট একজন মানুষ 'যুক্তিবাদে'র প্রবর্তক নন। আমরা প্রাচীন আইওনীয় দর্শন, চার্বাক, সাংখ্য, মীমাংসা, যোগ দেহাত্মবাদ, বাউলতত্ত্ব, মোতাজিলা ইত্যাদি মতবাদেও আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে বার বার 'যুক্তি'র আত্মপ্রকাশ দেখেছি। অবশ্য তার মাত্রা এবং বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে এটুকু বলা যায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আজকের আধুনিক যুক্তিবাদ তার রসদ সংগ্রহ করেছে। দর্শনের ক্ষেত্রে আজকের যুক্তিবাদ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ওপর এবং পদ্ধতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাজগৎ ও দর্শনে যুক্তিবাদী চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে অনেকবারই। আমরা সে ধারাবাহিকতার উত্তরসূরী। সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ছিল নাস্তিক্যবাদী। চার্বাক দার্শনিকরা আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক, শাস্ত্র ইত্যাদিকে অস্বীকার করেছিলেন। সাংখ্য দর্শনে বস্তুজগতের বিকাশ ও কার্য ব্যাখ্যায় 'স্বভাববাদ' অনুসরণ করা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনে বলা হয় :

নাবস্তনো বস্তুসিদ্ধিঃ
(সাংখ্যকারিকা ১/৭৮)
অবস্তু থেকে বস্তুর, অভাব থেকে ভাবের
নিরাকার ব্রহ্ম থেকে সাকার জগতের
উৎপত্তি হতে পারে না।

ভারতীয় ন্যায় দর্শন যুক্তিতর্ক ও বিচারমূলক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায় দর্শনে প্রমাণকেই যথার্থ জ্ঞানের উৎস বলে মনে করা হয়। প্রত্যক্ষকেই 'প্রমাণ জ্যেষ্ঠ' বলা হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক কনাদ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বর বা কোনো পুরুষকে জগতের কারণ বলে উল্লেখ করেন নি। মীমাংসা দর্শনে মনে করা হয়–নানা বৈদিক দেবতারা শুধু কতকগুলো শব্দমাত্র, এগুলোর উপাসনা করা বৃথা এবং সুখ লাভ করার নামই স্বর্গ, যা এই মর্ত্যেই সম্ভব।

চার্বাক দার্শনিকরা বিশ্বজগৎ সৃষ্টির জন্য ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ–এই চতুর্ভূতের ভূমিকাকেই দায়ী বলে মনে করেন। দেহের বাইরে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং প্রত্যক্ষের বাইরে কোনো অলৌকিক শক্তিতে তারা বিশ্বাস করেন নি।

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও ঈশ্বর অস্বীকৃত হয়েছে। প্রাচীন বৌদ্ধপন্ডিতগণ যুক্তিকেই বিচারের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা বলেন–'যুক্তিমদ্ বচনং গ্রাহ্যম'। অর্থাৎ কোনো বচন বা আপ্তবাক্যকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে যুক্তির দ্বারা যাচাই করে তবেই গ্রহণ করতে হবে। পাশ্চাত্যের পন্ডিত ওয়াল্টার রুবেন ছান্দোগ্য–উপনিষদে বর্ণিত উদ্দালক আরুনিকে ভারতের প্রথম বস্তুবাদী দার্শনিক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর দর্শনে গ্রীসের প্রথম দার্শনিক থ্যালেস-এর মতো বস্তুবাদ বা প্রাচীন বিজ্ঞানের প্রভাব ছিল।

বাউলের দেহাত্মবাদও বস্তুবাদী দর্শন প্রসূত। তারা মানুষকেই শ্রেষ্ঠ জীব বলে মানে। তাদের মতে এই মানব দেহেই সত্য, তা-ই পবিত্রতম। 'যা আছে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে, তা আছে এই দেহভান্ডে'। চৈতন্য বা আত্মা বলে যদি কিছু থেকে থাকে তা দেহের অভ্যন্তরেই থাকতে পারে, দেহের বাইরে কোনো আত্মা বা চৈতন্য নেই। তাই বাউল দেহতত্ত্ব বা কায়াসাধনার অনুরাগী। দেহস্থিত চৈতন্যরূপী আত্মাকে পাওয়ার সাধনায় সে ব্যাকুল হয়। পরকালে বাউলের আস্থা নেই, শাস্ত্রে-মন্ত্রে সে অনুগত নয়, অলৌকিকতায় তার বিশ্বাস নেই। প্রাচীন বাঙালি একদিন বলেছিলেন–

কিংতো দীবে কিংতো নিবেজ্জে
কিংতো তিত্থ–তপোবন জাই
মোক্খ কি লবভই পানী হ্মাই।

অর্থাৎ–কী হবে তোর দীপে আর নৈবেদ্যে? মন্ত্রের সেবাতেই বা কী হবে তোর? তীর্থ-তপোবনই বা তোকে কী দেবে? পানিতে স্নান করলেই কি মুক্তি মেলে?"

প্রত্যক্ষবাদী বাউলেরা ইহজাগতিকতায় বিশ্বাসী। যা অপ্রত্যক্ষ ও অপ্রমাণিত তা বাউলের বিশ্বাস উৎপাদন করেনি। তাই তারা বলে–

অদৃশ্য ভজনা করা
অন্ধকারে সর্প ধরা"
অথবা,
"যে দেখেছে বর্তমানে

অনুমান সে মানবে কেনে?

প্রাচীন বাঙালির ধর্মবিশ্বাসও ছিল ইহজাগতিক, সে ধর্মে পারলৌকিক জীবন কল্পনার দরকার হয়নি। সে নিজের পার্থিব ও বৈষয়িক প্রয়োজনেই নানা লৌকিক দেব-দেবী সৃষ্টি করে নিয়েছিল। স্মরণাতীত কাল থেকে বিদ্রোহী বাঙালি বহিরাগত ও আরোপিত ধর্মকে ওপরে ওপরে গ্রহণ করলেও মনে-প্রাণে সম্পূর্ণ মানেনি। সে আজও তার লৌকিক দেব-দেবীকে বিসর্জন দেয়নি। বাঙালি ছিল মূলত ইহজাগতিক আচারে অভ্যস্ত। এ কারণে বাঙালির চিন্তা-চেতনায় প্রচুর যুক্তিবাদী উপাদান পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা এদেশীয় চিন্তাজগৎ থেকে যুক্তিবাদের অনেক উপাদান সংগ্রহ করতে পারি।

বলা হয়ে থাকে–মানুষের সমগ্র জ্ঞানভান্ডারকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়–বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম। বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে দু'টি পায়ের উপর–একটি সুষ্ঠু যুক্তিবিচার, অপরটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা। দর্শন দাঁড়িয়ে আছে একটি পায়ের উপর–তা হলো সুষ্ঠু যুক্তিবিচার। কিন্তু ধর্মের দাঁড়িয়ে থাকার মতো কোনো পা নেই। ধর্মের ভিত্তি একটাই–তা হলো মানুষের বিশ্বাস। কিন্তু শুধু বিশ্বাস মানুষকে জ্ঞান দিতে পারে না। বরং তা সর্বক্ষণ বিভ্রান্ত করে। সমস্ত ধর্মে বিশ্বাস বা ঈমানের ওপর জোর দেওয়া হয়। বলা হয়–"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর"। রামকৃষ্ণ বলতেন–"তাঁর কাছে বলতে হয়–আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও। বিশ্বাস হয়ে গেলেই হলো। বিশ্বাসের চেয়ে আর কোনো জিনিস নাই।"

যুক্তিবাদীরা সমস্ত অন্ধবিশ্বাস বর্জন করে, তারা বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলোর বিপরীতে মানবতা বা মনুষ্যত্বের ধর্মকে গ্রহণ করে। যুক্তিবাদীরা একারণেই জাত, বর্ণ, লিঙ্গ ও ধর্মভেদে বিশ্বজনীন মানবতাবাদকে ধারণ করতে পারে। প্রথাগত কোনো ধর্ম বিশ্বাস নয়, বরং যুক্তিবাদীদের নৈতিকতার উৎস তার জাগ্রত বিবেক এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা।

যুক্তিবাদীরা ইহজাগতিকতায় বিশ্বাসী। পারলৌকিক জীবনে তাদের আস্থা নেই। এ জীবনই সত্য, এ জীবনের বোঝাপড়া ও হিসেব-নিকেশ এ জীবনেই শেষ। পারলৌকিক পুরস্কার বা শাস্তির প্রলোভন বা ভয় তাকে বিচলিত করে না। তার লক্ষ্য এই বাস্তব দুনিয়াকেই বাসযোগ্য করে তোলা।

যুক্তিবাদী মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক। বিজ্ঞানে তার আস্থা আছে। কারণ বিজ্ঞান না জেনে জানার ভান করে না। যুক্তিবাদী মানুষ সংস্কারমুক্ত, অনুসন্ধিৎসু; বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিপ্রমাণকে গ্রহণ করে, সে ধর্মীয় আবেগ বা শাস্ত্রবাক্য অনুযায়ী নিজেকে চালনা করে না।

যুক্তিবাদী মানুষ কুসংস্কারের অসারতাকে উন্মোচন করতে পারে। অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও আদিম বিশ্বাসপ্রসূত নানা কুসংস্কার সমাজে ছড়িয়ে আছে। গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ায় অনেক কুসংস্কার ধর্মের অন্তর্ভূক্ত হয়ে শাস্ত্রীয় গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, আবার অনেক কুসংস্কার ধর্মের গন্ডীকে বাইরে থেকে বেস্টন করে টিকে আছে। যে বিশ্বাসগুলো বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তি-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, মানুষের আদিম চিন্তাপ্রসূত এক নেতিবাচক উপাদানরূপে মানব সমাজে টিকে আছে সেগুলোকে কুসংস্কার বলা যেতে পারে। এটা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত, এমনকি প্রতারিত করে। যুক্তিবাদীরা সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

সাহসী না হলে যুক্তিবাদী হওয়া যায় না। কারণ তাকে প্রচলিত ধর্ম, চিন্তা-চেতনা ও অন্ধবিশ্বাস প্রসূত গড্ডালিকা প্রবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়। এ সমাজে যুক্তিবাদীরা সংখ্যালঘু হলেও নৈতিক শক্তি ও মনুষ্যত্বের ধারক হিসেবে তারা বড় মাপের মানুষ। তারা সংকীর্ণ জাত, সম্প্রদায় ও ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে আলোকিত মানুষ।

আজকের পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে। মানুষ জয় করছে অজানাকে, উন্মোচন করছে পৌরাণিক অতিকথা ও কুসংস্কারের অন্ধকার যবনিকা, ছড়িয়ে পড়ছে সমুদ্রতল থেকে মহাকাশের অসীম দূরত্বে, ক্ষুদ্রতম পরমাণু থেকে বিশাল নক্ষত্রমন্ডল তার গবেষণার আওতায়। দৈত্য-দানো, দেবতা–অপদেবতা, ভূত-প্রেত ও ভক্তি-বিশ্বাসের দিন অবসিত। মানুষ আজ বিশ্বাসের (ঈমানের) গালিচায় আকাশ পথে ভ্রমণ নয়, বরং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আকাশযানে চড়ে ভ্রমণ করাতেই আস্থা রাখে। প্রার্থনা নয়, বরং পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়কেই তার সাফল্যের কারণ বলে মনে করে। অপদেবতা বা কারো অভিশাপে রোগ-ব্যাধি হয় না, বরং তা ভাইরাস বা ব্যাকটোরিয়া কারণেই ঘটে। রক্ত-পাথরে কারো ভাগ্য ফেলে না, পানি পড়া বা তেল পড়াতেও রোগ নিরাময় হয় না।

আমাদের সমাজকে যদি এগিয়ে নিতে হয় তবে সমস্ত অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান ও ধর্মীয় বিশ্বাসপ্রসূত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্পকে রুখতে হবে, বিজ্ঞানভিত্তিক গণশিক্ষা ও এক বিরামহীন সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালাতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে আমরা এগিয়ে চলার গতি পাবো না।

আলোকবিন্দু

অরুণকান্তি দাশ

প্রোটাগোরাস বলেছিলেন "দেবতা আছেন বা নেই তা জানবার আমার কোন উপায় নেই। অতোটা জানবার পথে অনেক বাধা রয়েছে: কারণ একে তো প্রশ্নটাই ধোঁয়াটে ধরনের, তার ওপর আমাদের আয়ুও সীমিত।" মানুষের বিচারেই মানুষের মূল্য নির্ধারিত হতে হবে। আপন উপলব্ধিজাত সত্যই সত্য। মানুষের উপলব্ধিতে যা ধরা পড়েছে তারই শুধু অস্তিত্ব আছে। যা মানুষের আপন অনুভবে-উপলব্ধিতে ধরা পড়েনি তা অস্তিত্বহীন। অজ্ঞেয় অস্তিত্বহীন বস্তুকল্পনা বাতুলতামাত্র।

তারই সমসাময়িক ছিলেন হিপিয়াস। হিপিয়াসের মতে–জীবনকে সর্বোত্তম শিল্পরূপে গড়ে তোলাই মহত্তম আদর্শ। সে শিল্পে হবে সব শিল্পের অধিষ্ঠান। জগৎ কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষ। জগৎ ও জীবন একার্থক। এ ধরনের মতবাদের সূচনা ঘটে প্রাচীন গ্রীসে যাদের ধারক বাহকগনকে বলা হয় 'সফিস্ট' (Sophist)। এ মতবাদের মূল সত্য হলো বাস্তব যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে খুঁজে পেতে হবে জ্ঞানকে। যাকে চোখে দেখছি, যাকে ভোগ-উপভোগ করছি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এ জগৎ ও জীবন মিথ্যে হতে পারে না। স্তোকবাক্য বা প্রশ্নাতীত স্বতঃসিদ্ধ বিধান কোনো সমাজের নিয়ামক হলে তা হবে বৃত্তাবদ্ধ অচল সমাজ। চলন্ত জল স্বচ্ছ, আবদ্ধজল অস্বচ্ছ। চিন্তাহীন মস্তিস্ক জড়বৎ; সৃষ্টিশীল মস্তিস্ক মৃত অতীতাশ্রিত নয় কখনো।

'মানুষ' পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি। আবার বিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টির স্রষ্ঠা মানুষ। কালিক বিচারে আগে মহাবিশ্ব তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; তারপর পৃথিবী, তারপর মানুষ, তারপর ধর্ম এবং সবশেষে বিজ্ঞান। শ্রমলব্ধ মননশীল প্রত্যক্ষবাদই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে আছে বিরুদ্ধ প্রকৃতি। অজ্ঞেয় বিরুদ্ধ প্রকৃতিই মানব ভাবনার মূল প্রেরণা। প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ জয়ের ফলই বিজ্ঞান। আলোর পথে বাধা থাকে প্রচুর; কিন্তু অন্ধকারের পথে কোন বাধাই থাকে না। অন্ধকার ঠেলেই আলোকে অগ্রসর হতে হয়। অগ্রগতিতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানসিক ঊর্ধ্বতন। শ্রমলব্ধ মননশীল ভাবনা ভাবতে না পারলে মানুষকে আজোও থাকতে হতো পাহাড়ের গুহায় কিংবা গাছের কোটরে। গুহা থেকে সুরম্য অট্টালিকায় উত্তরণের পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তার পেছনে রয়েছে হাজারো বলিদান ও আত্মোৎসর্গ। স্বাধীন বুদ্ধি প্রয়োগে মানুষই মানুষের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এবং আজো আছে। মানুষ চালিত হয় সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তা দ্বারা নয়তো বা অনিয়ন্ত্রিত চিন্তা দ্বারা। সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তার ফল কল্যাণ; অনিয়ন্ত্রিত চিন্তার ফল অকল্যাণ। চরম ও পরম সত্য এই যে, অন্ধকারকে আমন্ত্রণ জানাতে মানুষের কোনো চেষ্টার বা আয়োজনের প্রয়োজন হয় না কিন্তু আলোর জন্য থাকতে হয়ে বৌদ্ধিক প্রচেষ্টা ও মজবুত সংরক্ষণ উপকরণ।

আমরা বাস করি মিথ্যের মোহময় কলারাজ্যে। হাজার বছরের সংস্কারবদ্ধ উত্তরাধিকারী পৈতৃক মন সহজে কল্পনার আকাশচারিতা পরিহারে ব্যর্থ। কল্পনার ভাবরাজ্য থেকে বাস্তবের পৃথিবীতে অবরোহণে প্রধান অন্তরায় আমাদের পিতৃপুরুষের তৈরি অন্ধকার লৌহ নিগড়, মায়াময় শিকল, যা আজকের বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের যুগেও প্যারাডাইম শিফটের শক্তিশালী অবস্থানে অবস্থিত।

আমাদের মধ্যে ভন্ডালিজম খুবই প্রকট। আমরা বেঁচে আছি বিজ্ঞানের কল্যাণে কিন্তু মনে করি এবং প্রতিনিয়ত ভাবি যে, আমাদের জীবন ঐশী শক্তির উপর নির্ভরশীল। বাস করি বিজ্ঞানের যুগে এবং অবলম্বন বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক উপকরণ। বিশ্বাস বাঁধা থাকে কোন অশরীরী আত্মার ওপর। অথচ বিজ্ঞান সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে আত্মা বলতে কিছু নেই; অতিপ্রাকৃত শক্তি বলতে কিছু নেই; তা শুধু অজ্ঞান মনের ভ্রম-বিলাস মাত্র। অদৃশ্য কোনো কল্পরাজ্যের রাজপুরুষের নির্দেশে ধুলোমাটির মানুষকে চলতে হবে তা নির্মম পরিহাস ও উলঙ্গ উপহাস ছাড়া অন্য কিছু নয়। ব্যক্তির চালিকা শক্তি হতে হবে বৌদ্ধিক জ্ঞান ও বিবেকের নির্দেশ। লক্ষ্য যদি থাকে সামনে চলা তবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে হবে বাস্তবের কোন আলোকবিন্দুতে; অতীতের কোনো মরুভূমিতে বা বৃক্ষতলের কোন কঠিন ও নিরেট পাথরে নয়। মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে আপন শ্রেষ্ঠত্বের মাহাত্য। ঘটাতে হবে আপন শক্তির জয়যাত্রা। অস্থির চিরসঞ্চল ব্রহ্মান্ড গতিময় পৃথিবী, গতিশীল গ্রহ-তারা-নক্ষত্র। গতিশীল ও পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মননকে অতীত কেন্দ্রীয় বিন্দুতে স্থির রাখা মূর্খতার শামিল।

মানুষকে তার নিজের অযুত-সম্ভাবনাময় শক্তির উপর আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে যে, সে নিজেই নিজের ভালোমন্দ পাপপূণ্যের নির্ধারক। মানুষকে অনুধাবন করতে হবে সে দায়িত্ব তার একান্তরূপে নিজের। কৃতকর্মের ভার তার নিজেকেই বহন করতে হবে। মানুষকে নির্ভর করতে হবে তার আপন সত্তার ওপর। নির্ভর করতে হবে নিজের বুদ্ধির ওপর; বিবেকাশ্রিত যুক্তির ওপর। এ করেই মানুষকে অর্জন করতে হবে পূর্ণ মনুষ্যত্ব।

রাশার খণ্ডিত পৃথিবী

মাহ্‌মুদ আলী

শ্রাবণ। বিকাল। আকাশ। রঙিন মেঘ।

এসব কিছুর মিলন মোহনায় কিশোরী রাশা একদিন তন্ময় হয়ে আকাশ দেখল, এ আকাশ কখনও তার চোখে পড়েনি। এ কেমন করে হল? একই সময় দক্ষিণ আকাশ লাল, হলুদ, নিলাভ, সবুজ, কমলা। আমার চোখ কি ফালি ফালি হয়ে গেল? এক চোখ থেকে এতগুলো রঙ বের হয়ে মেঘে মেঘে ছড়িয়ে পড়ল?

রাশা বসে পড়ে। শ্রাবণের ঘাসে। একেবারে জানু গেড়ে। ঘাসের গন্ধ আকাশের বিচিত্র রঙ তাকে মিশিয়ে দেয় প্রকৃতির রাজ্যে।

চেয়ে থাকে দক্ষিণ আকাশে। আকাশ রঙ বদলায়। রাশারও মনের রঙ বদলে যায়। সুকান্তের কবিতা পড়ছিল। ছাড়পত্র। কবিতার শব্দগুলি যেমন বদলে দিচ্ছে কবিতার প্লট, তেমন বদলে যাচ্ছে রাশার ভাবনা। কবিতার মাঝপথে একবার উচ্চস্বরে বলে যায়–

'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি–
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গিকার।'

এ কয়েকটি শব্দ মিলে যে বিষয়টি তৈরী হয়েছে, তা রাশার মনের ভিতরে হুড়মুড় করে ভেঙে ছুটে উল্কার মত জ্বলে ওঠে এবং মুহূর্তে শরীর থেকে ভীষণ বেগে বের হয়ে যায় দূরে অবস্থিত বস্তির দিকে।

সুকান্ত অঙ্গিকার করেছেন? না আমি অঙ্গিকার করব না, প্রতিজ্ঞা করব। অঙ্গিকার আর প্রতিজ্ঞার মধ্যে অনেক ফারাক।

রাতে রাশার ঘুম আসে না–এ বাড়িতে এমনিতেই ঘুম নেই, কারণ মানুষ নেই। ঘুমও সম্ভবত এখানে বাস করে না। তাই রাশা মাঝে মাঝে ঘুমহীন বাস করে। এ বাড়ি লোকালয়ে নয়, খুব নির্জনে, লোকে বলে পাঠান বাড়ি। পাঠান বাড়ি কবে কিভাবে নাম পড়েছে তার ইতিহাস কেউ জানে না। কেউ বলে মোঘল রাজত্বে এখানে এক প্রতাপশালী পাঠান বীর বাস করত, তাবৎ অঞ্চল এ বীরের দখলে ছিল। খুব অত্যাচারী ছিল এ বীর–মানুষকে খুব অত্যাচার করত, পাঠানের নাম শুনলে এক সময় মানুষের শরীরে লোম খাড়া হয়ে যেত। এ কু-কীর্তির জন্য মানুষ নাম রেখেছে পাঠান বাড়ি। এখন পাঠান-মাঠান কেউ নেই, শুধু বাড়ির সদর গেইটে একটা পাথরের ফলকে ফারসি অক্ষরে লেখা পাঠান বাড়ি, এ বাড়ির ইতিহাস বহন করে।

দশ বছর তার বাস এ পোড়া বাড়িতে–

কলকাতা আর্ট কলেজের মেধাবী ছাত্রী রাশা। অবিরাম ছবি আঁকে, স্কুল কলেজে গিয়ে বিনা পয়সায় ছাত্রদের মাঝে বিলিয়ে আসে। ছাত্ররা এ ছবি কেউ বুঝে কেউ বুঝে না। কেউ ছিড়ে ফেলে কেউ বইয়ের ভেতর ভাঁজ করে রাখে।

রাশা বর্তমান ভাবে না–ভবিষ্যৎও না। এ ভাবার বিষয় নয়, এ না-ভাবার বিষয়। অতীত রাশা খোঁচা দেয়, তবে পেছনের দিকে নয়–সামনে। একেবারে বুকে। রাশা কড়া কড়া কথা পথজনদের মাঝে উত্থাপন করে যায়, কিন্তু কেউ প্রশ্ন করে না। মানুষের কাছে প্রশ্ন অপেক্ষা বাঁচার তাগিদ ঢের বেশি। রাশা তো অর্ধ পাগল, মানুষ তাতো মেনেই নিয়েছে, অর্ধ পাগলকে প্রশ্ন কিসের? নগদ জীবনে বিশ্বাস নেই রাশার। সে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় নিজের কাছে, মানুষের জীবন এরকম কেন? ব্যবধান আকাশ-পাতাল। মানুষ না জন্মালেও তো পারতো? কি ক্ষতি হত? কার ক্ষতি হত? বন্যার স্রোতের মত মানুষের আগমন! এত মানুষ নিয়ে পৃথিবী মহাশূণ্যে ঘুরে বেড়ায়, পৃথিবী কি এটা বুঝে? কতদিন বহন করবে এটাও কি বুঝে?

রাশাদের পোড়া বাড়ির ছাদেও তার মত বেওয়ারিশ অনেক গাছ জন্মেছে, গাছের ফাঁকে চৌকুনো একটুকরো ঘাসেল জায়গা, রাশার বসার যোগান দেয়। এখানে সূর্যোদয়ে বসে-সূর্যাস্তেও বসে। জোছনায় বসে অমাবস্যায় বসে। এক জোছনায় রাশা জন স্টেইনবেকের The moon is down পড়ার আলো পাচ্ছে এক মোমবাতি থেকে। বইয়ে সে ডুবে আছে, কিন্তু-চাঁদও ডুবে গেছে–খেয়াল নেই। মোমবাতি পুড়ে নিভে যাওয়ায় রাশা আকাশ দেখে–কিন্তু আকাশে চাঁদ নেই। একবার চারদিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল–সত্যিই তো চাঁদ ডুবে গেছে! শুয়ে পড়ছিল, তেমনি শুয়ে যেখানে চাঁদ ডুবে গেছে দৃষ্টি তার সেখানে অপলক চেয়ে রইল। কতক্ষণ চাইল বুঝতে পারে না, সে হিসেবও তার দরকার নেই। যেন মনে হচ্ছে চাঁদের কতগুলি আলো বাকি আছে সে হিসেব বাহির করা তার দায়িত্ব। রাশা সে হিসেবের মধ্যে না গিয়ে তার জীবনের অতীতে পাড়ি

জমাল ।

তখন তার বয়স চার হবে-

মায়ের বুকের উপর তার বাসা ।

মা একা বাস করে-

মানুষের সাথে মিলমিশ কম ।

কথা বলে আরও কম ।

স্বরে-অ, স্বরে-আ পড়ে এক সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়ে রাশা ।

হঠাৎ পুরুষালি কণ্ঠের চেঁচামেচিতে জাগে রাশা ।

আমি বাচ্চার ভার নেব না? তোমাকে বলি নাই তুমি এব্যরশন কর?

আমি তো এব্যরশনের জন্য তো বাচ্চা পেটে নেইনি?

নেওনি তো তুমি এখন বহন কর, আমি ভার নেবনা ।

কিন্তু বাচ্চা তো তোমার!

বিয়ের আগে বাচ্চা প্রসব দিলে, বাচ্চা পুরুষের হয়না, হয় মায়ের ।

আমাকে তুমি বিয়ে করবে না?

না এরকম শর্ত আমার ছিল না ।

মিথ্যে বলছ!

ধুম ধুম করে শব্দ হয় মায়ের পিঠে ।

লাথি পড়ে পর-পর, পাছায় ।

ঘুষি পড়ে নাকে–

এক ফালি রক্ত ছিটঁকে পরে রাশার নীল জামার উপর । চোখ তুলে তার জন্মদাতার দিকে তাকায় । বুঝে না ও তার বাবা । শুধু কাঁদতে থাকে । হিংস্র মনে হয় তাকে । গো-গো শব্দ তুলে বলে, আর কোন দিন আমকে ডাকবে না । তারপর হন হনিয়ে চলে যায় ।

মায়ের উপর কষ-কষ আঘাত

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মায়ের কান্না,

এক অদ্ভুত লোকের বকা-ঝকা

কেমন মনে হচ্ছে রাশার, মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে । কেন কাঁদে বুঝে না । কি করবে তাও বুঝে না । মা কিছুক্ষণ অন্ধকারে ঘুরে আসে, বক বক করল অনেকক্ষণ, কি বললো বুঝা যায় না । রাশাকে বুকে চাপিয়ে ঘুমিয়ে পরে । রাশা ছোট হলেও ঘুম পায়নি সেদিন । মা অবিরাম কাঁদছে । তার বাবা এসে আরো দুই ফালি বকা দিয়ে যায় । বাপরে! কেমন সাহস! বলছিলামনা মাইয়া । বুঝলি না, আমার মান মর্যাদা পুড়ালে । এখন বুঝ পৃথিবী সাদা না কালো ।

আরো বড় হয়ে দেখেছে বাবার জন্য মায়ের নিত্য অপেক্ষা-কিন্তু বাবাকে সহ্য করা কঠিন হতো রাশার । এ এক ভিন্ন ভালোবাসা মায়ের বুকে দেখেছে । বাবার ওপর রাশার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সূচনা তখন থেকে ।

কড়া রোদ । কর্মস্থলে কাজ করছে আজ কম সময় । দশ ঘন্টা রুটিন ফেল করে দুপুরে বাড়ি ফিরছে । যেখানে কাজ করে আসলে এ কোন কর্মস্থল নয়, সে নাক উঁচিয়ে বলে এ আমার কর্মস্থল ।

পাঠান বাড়ির তিন কিঃমিঃ দূরে উঁচু এক পর্বত । এর উপর বিশাল এক খণ্ড পাথর, এ পাথর হচ্ছে রাশার কর্মস্থল । যার দৈর্ঘ ×প্রস্থ (৪০২×৩৮৮) ফুট । এটাকে কেটে কেটে পৃথিবীর মানচিত্র তৈরি করছে । পাথর কেটে তৈরি করতে চায় তার স্বপ্নের পৃথিবীর মডেল । এখানে সে সারাদিন হাতুড়ি বাটালি দিয়ে পাথর পেটায় । কেটে বের করে নিজের পৃথিবী ।

কড়া রোদে আজ বাড়ি ফিরছে । বাড়ির গেটে দেখে এক পাগলি । জটা চুল । শরীর উলঙ্গ । দুই বছর আগে এই যৌবনা পাগলিকে দেখা যেত বক-বক করে যাচ্ছে ।

'আমি দুই দুনিয়ার বাসিন্দা' ।

'আমি দুই দুনিয়ায় বাস করি' ।

আজ তাকে অন্য রূপে দেখা যায় । পাঠান বাড়ির গেটে উলঙ্গ বসে, নিজের ছয় মাসের মেয়ে শিশু কোলে । রাশার শরীর ঘর্মাক্ত, পেন্ট, টি-শার্ট পাথরের গুড়োয় ধূসর । চুল ধূসর । হাতে শাণিত বাটালি হাতুড়ে । পাগলির এ দৃশ্য দেখে চমকে থামে রাশা । পাগলির উপর রাশার অদ্ভুত ছায়া পরে । অদ্ভুত এক প্রসব দৃশ্য রাশাকে করে তন্ময় । পৃথিবীর সমস্ত শ্লীল-অশ্লীল দৃশ্যের শব কাফনে মুড়িয়ে কফিনে ভেসে বেড়ায় রাশার ভাবনায় ।

কাছে এসে প্রশ্ন করে–এ শিশু তোমার?

কোন উত্তর আসে না ।

শিশুটি মায়ের কোল চেঁপে ধরে। অনেকক্ষণ ধরে বায়না চেপে আছে দুধ খাবে। এক ফুটা দুধ জমা নেই মায়ের বুকে। রাশা একটি পঞ্চাশ টাকা বের করে দেয়। পাগলি ছুড়ে মারে মহা সড়কের উপর। এমনি ভাব, নোটে ক্ষিধে মিটে? বুকে দুধ জমে?

রাশা ফের ভাবল–দশ বছর হল ও পাগল কিন্তু এ কোন জানোয়ার ওর পেটে বাচ্চা দিল! এ শিশুটির এখন কি হবে? কে তার বাবা? কে বহন করবে তার জীবনের ভার? যে জন্মদাতা সে অবশ্য জামা কাপড় পরে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, ওকে উলঙ্গ করে পেটানো উচিত।

রাশা পাগলিকে ঘুমুতে দেয় তার পাশের রুমে। ঘুমের আগে জিজ্ঞেস, তোমার নাম কি?

পাগলি নাম বলে না। খিলখিল করে হাসির ফোঁয়ারা তুলে। যেন ও পাগল নয়। রাশা আর পাগলির রক্তাক্ত বেদনা যেন হাসির ফোঁয়ারায় ভেসে যায় লোকালয় ছেড়ে।

রাশা নাম দেয়–নিশিতা।

নিশিতার সন্তান বুকে ঘুমায়।

রাশা ছাদে তার নিশালয়ে বসে ভাবে, এমন কার বিবেক! এ পাগলির পেটে সন্তান জন্ম দিল। হে প্রকৃতি এ জানুয়ারের বিবেক তুমি টুকরো টুকরো করে দিতে পারলে না? হে আকাশ তুমি ওকে চাপা দিতে পারলে না! রাত্রি! অন্ধকার! ওর শ্বাস টিপে ধরতে পারলে না? মাটি! তোমার বিবেক ছিল না? বাতাস, বাতাস তুমি কেন বহ? এ যদি ঠেকাতে পারলে না? নদী, তুমি দরিদ্রের বাড়ি ভেঙে নিয়ে যেত পার, পারলে না ওর বুক ভেঙে নিতে?

এ শিশুর ওপর আমার জীবনের ছায়া পড়েছে হুবহু। এ লৌকিক না অলৌকিক।

কোথায় খুঁজবে তার বাবাকে?

এ শিশুর তো একটা নাম চাই?

নাম-বিন্তা।

এ বিন্তা বড় হলে সমাজ তাকে ঘিরে বসবে, যে জানোয়ার তাকে জন্ম দিয়েছে ওই তাকে বলে বেড়াবে জারজ সন্তান।

অপমানে লাল হতে হবে মানুষের ভীড়ে। ঢেকে রাখতে হবে নিজের অস্তিত্ব। সমাজ মানবে না তার মতামত। কেন এমন হয়? এরা পৃথিবীতে আসে নি? গর্ভ থেকে আসিনি আমরা? আমাদের শরীরে তো অন্য গ্রহের রক্ত নয়, অন্য উপাদানের মাংস নয়?

হাতুড়ি বাটালির ব্যাগ পিঠে চেপেই ট্রেন চড়ে রাশা। ট্রেন দিক-দিগন্ত কেটে কেটে চলছে। কতটুকু পথ পাড়ি দিল ট্রেন এ হিসেব পায় না রাশা। তার দেহ ট্রেনে যাচ্ছে, ভাবনা পরে আছে কর্মস্থলে, ঐ গোল পাথরটির কঠিন শরীরে। প্রাণহীন কঠিন বস্তুটি এখন রাশার নিত্য দিনের দোসর। ভাবনার মডেল। কথা বলে একা একা এর সাথে। পাথরটিও রাশার ভাবনা খুলে দেয়। পর্বতের একটি চূড়ায় অবস্থিত, একটু উঁচু হয়ে আছে ভূমি থেকে। উত্তর দক্ষিণ আড়া আড়ি দাড়িয়ে। ইতোমধ্যে পাথরটি এবড়ো থেবড়ো ছিল। রাশা পাথটি কেটে বিশাল একটা গ্লোবের আকারে নিয়ে এসেছে। দূর থেকে দেখলে মিনি পৃথিবীর মত দেখায়।

ট্রেন হেকে যাচ্ছে।

ঘুম পালানোর প্রহর। এ প্রহর কাটে না।

দ্বীপের মত দুজনের আসনে একা বসে আছে।

এক স্টেশনে এক যাত্রী রাশার সহযাত্রী হল।

সহ যাত্রীর চেহারা পন্ডিত-পন্ডিত। দু-একটা পাকা চুল আলোয় ঝিলিক পাচ্ছে। পুরো চশমা চোখে। বিপরীত লিঙ্গের একজনের পাশে বসে কোন সংকোচ হল বলে মনে হল না। রাশা চোখ চশমার উপর রেখে বলে– আপনার টিকিট কোন স্টেশন পর্যন্ত?

চশমার ভেতর থেকে-ঢাকা।

তুমি ঢাকা যাচ্ছ?

না ঢাকা নয়, প্রথমে আখাউরা তারপর অন্যখানে।

কোন শব্দ হয় না অপ্রান্ত থেকে।

ঢাকা কি করেন?

আমি একটি কলেজে পড়াই–

অধ্যাপক কৌতুহলী হয়ে বললেন–তোমার নাম?

আমি রাশা।

কি কর?

ছবি আঁকি স্যার। এখন একটা বড় কাজে হাত দিয়েছি।

কি বড় কাজ!

আমার নিজস্ব পৃথিবীর মডেল। পাথর কেটে একটি গ্লোব তৈরি করছি, তারপর আমি কি রকম পৃথিবী চাই তার চিত্র পাথর কেটে কেটে নমুনা তৈরি করব।

অধ্যাপক বললেন তুমি কেমন পৃথিবী চাও?

আমার পৃথিবীতে কোন দেশ থাকবে না। গোটা বিশ্বটা হবে একটি দেশ। থাকবে না রাজা, মহারাজা। মানুষের নিজের কোন সম্পদ থাকবে

না, সব সম্পদ সব মানুষের। যার যার যোগ্যতায় সমান বেতনে সবাইকে চাকরি করবে–যোগ্যতা নির্ধারণ হবে যান্ত্রিক ব্যবস্থায়। কোন কাগজি মুদ্রা নয়, মুদ্রা হবে যান্ত্রিক। আধুনিক মোবাইলের মত। লেখ্য এবং কথ্য ভাষা হবে এক। নাগরিক সুবিধা সমান সব মানুষের। কোথাও কোন শহর থাকবে না, কোন গ্রাম থাকবে না, সারা পৃথিবী পুরো একটি গ্রাম। সারা পৃথিবী হবে একটি শহর। সব জাতিভেদ ত্যাগ করে আমাদের পরিচয় হবে আমরা সবাই মানুষ।

সব মারণাস্ত্র পুড়িয়ে ফেলা হবে।

মানুষ, মানুষ হত্যা করবে না–পৃথিবীটা ছাব্বিশটি অঞ্চলে ভাগ করা হবে। ইংরেজি অক্ষরে নাম করণ হবে প্রতিটি অঞ্চলের।

অধ্যাপক ভাবলেন, মেয়েটি কি মাতাল!

অধ্যাপকের মুখে হতাশা দেখে রাশা ম্লান হাসে। অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে?

রাশার নাকের ওপর দৃষ্টি রেখে অধ্যাপক বলেন–ভাবনার একটা সীমাবদ্ধতা আছে, তোমার ভাবনার গতিটা সীমাবদ্ধতার দেয়াল অতিক্রম করে গেছে না?

স্যার, পৃথিবীতে যতকিছু আবিস্কার হয়েছে আবিস্কারক প্রথমে এইভাবে সীমাবদ্ধতার দেয়াল ভাঙাকে খুব কঠিন ভেবেছেন। কিন্তু, তাই বলে কি আবিস্কার হয়নি টেলিফোন, টেলিভিশন, কম্পিউটার?

স্যার আমি আজ ভাবলাম। বিজ্ঞান হয়ত একদিন এ সূত্র আবিস্কার করে ফেলতে পারে, অথবা ভিন গ্রহ থেকে উন্নত মস্তিস্কের একদল প্রাণী এসে পৃথিবীকে এভাবে আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে।

আখাউরা নামার সাইরেণ বাজতে থাকে–

স্যার আমার নামার সময় হল–

অধ্যাপক ঘাড় কিছু কাত করে বললেন–'ঠিক আছে'।

রাশা প্লাট ফর্মে নেমে অগ্রণি ধানি মাঠ ধরে পশ্চিম দিকে চলে, প্রকৃতি তার দিনের ডানা গুটিয়ে রাতের কয়েকটা পালক মেলে দিয়েছে মাত্র, চাঁদের ওপর থেকে বাধার আবরণ সরে পরায় জোছনা গলিয়ে মাঠে। মেয়েলি বাতাস জোছনার সাথে মাঠে সাঁতার কাটছে। রাশার শরীরে ফুর ফুর লাগে।

রাশার মা মাঠের ওপারে শ্যামপুর গ্রামে বাস করে। এ গ্রাম রাশার জন্মস্থান। মায়ের কাছে থাকেন তিনি। একটা জারজ সন্তানের জননী হওয়ার অপরাধ কুঁড়ে ঘরের সীমানায় অনুভব করছে খণ্ডিত জীবনে। মানুষের তিরস্কারের তীর ফালি ফালি করে মায়ের জীবন। দ্বীখণ্ডিত হয়ে পরে থাকে কুঁড়ে ঘরের মসৃণ মেঝে। দ্বীখণ্ডিত শরীর থেকে রক্ত বহে না, বহে প্রতিবাদ।

আমার এ সন্তান আমার শরীরের অংশ–

তার বাবার শরীরের অংশ,

তার সোনালী দেহে আমার ভাবনা।

এ প্রতিবাদের শক্তি সমগ্র ঘরকে উড়িয়ে নেয় মহাশূন্যে, ঘুরে বেড়ায় ছায়া পথে, পৃথিবীর শিরায় শিরায় এ চিৎকার ধ্বনিত হয়, কিন্তু কারো কানে পৌঁছায় না। যদি বা কেউ এ চিৎকার শুনে তবে থু থু ছুড়ে আমার ওপর।

মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে এক ঝলক।

মা সুমন্তা কাঁদে না-

রাশার জন্মাবধি থেকে বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় ভেসে আছে তার এ কঠিন জীবন। কত কেঁদেছে তার হিসেবের এখন ধার ধারে না সুমন্তা। তিরস্কারে কেঁদেছে, রাশার বাবার আচরণে কেঁদেছে, রাশার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভেবে কেঁদেছে। রাশা কলিকাতা আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে এসে ভেবেছিল মায়ের কাছে থাকবে, মা কে সুখি করবে। কিন্তু সমাজের তিরস্কার গঞ্জনার পরিমাণ এতই বেড়ে যায় শ্যামপুরে রাশা আর থাকতে পারেনি। পালাতে হয়েছে জন্মস্থান থেকে ত্যাগ করতে হয়েছে প্রিয় মাকে।

এক বিছানায় আজ ঘুমিয়ে মাকে বলে, মা আমি চব্বিশ বছরের রাশা। এতগুলি বছর আমার জীবন থেকে কেটে গেল, তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি কম হলে কয়েকশ বার। আমার বাবা কে? এখন কোথায় থাকেন? কিন্তু মুখ খোলনি। আজ বলতে হবে কে আমার বাবা-আর কোথায় থাকেন?

মার চোখ কিছুটা মিহি হয়ে আসে-

মুখের চিত্রটার রঙ বদলে যায়।

কড়া ভাষায় বলেন, 'তোমার কোন বাবা নাই'।

মায়ের এ তিক্ত বাক্য রাশাকে অবশ করে দেয়। মায়ের বুকে হাত রেখে গুম হয়ে থাকে।

মাঠের রূপালি জোছনার গন্ধ, অধ্যাপকের পুরো চশমা, ট্রেনের গঠর গঠর সব যেন একসাথে এসে রাশাকে নির্বোধ করে দেয়।

মাকে বলে, তুমি বুঝ মা, বাবাহীন জন্ম নেওয়ার সামাজিক যন্ত্রণা?

তুমি বুঝো মা, সমাজে আমার কোন শেঁকড় নাই?

সমাজ আমার কোন মত গ্রাহ্য করে না-

মানুষের তিক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ হয় আমার শরীরে।

সমাজ বলে আমার পায়ের তলার মাটি অপবিত্র!

আমার হাসি ভেঙে দেয় পৃথিবীর শান্ত অট্টালিকা।

এতগুলি পাপের সৃষ্টিকর্তা যে বাবা, তাকে আমি দেখব না? অস্তিত্বটা অনুভব করব না? আমি কি জোর করে তোমার পেট দখল

করেছিলাম?

সুমন্তার শরীর রাগে গিজ গিজ করে।

রাশাকে থামিয়ে দেন।

রাশা, আগুন পেটে রেখেছিলাম আমি। আগুন বের করে নিস্তার পাইনি, এর দাহে আমার জীবন পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছে। একটি জারজ সন্তানের জন্মদানের যন্ত্রণা তুমি বুঝো রাশা? সমাজ তো দুরে থাক, দুর্বা ঘাসও আমাকে ঠাঁই দেয়নি। সমালোচনার তিক্ত কালো চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত হচ্ছে মাতৃত্বের সোনালী শরীর।

রাশা কাঁদে।

সুমন্তা কাঁদেন না।

মা ঝগড়া করতে আসি নি। যন্ত্রণা যেমন তোমার তেমন আমারও।

অস্থির সময় স্বপ্নহীন ভবিষ্যৎ

অ.আ.ম. রেজা

'অসুস্থ তুমি, অসুস্থ শহর, অসুস্থ দেশ/দেশের পাজরে পূঁজা শহরের বুকে জমে আছে বেদনা বরফ–'

অস্থির সময়ের মধ্যে বাস করছি আমরা। চারদিকে কেবল অস্থিরতা, ভাঙন, অসুস্থ প্রতিযোগিতা। সব কিছু ভেঙে পড়ছে ক্ষয় ধরেছে সমাজে, মনুষ্যত্বে। এক দুর্বিসহ সময়ের মুখোমুখি আমরা। সময়টা খুবই অস্বস্থিকর, সংকটের, মনে গভীর আশংকা। দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া মোটেও ভাল নয়। বড় অসহায় আমরা। নেতাদের আলোচনা চলছে, চলবে কিন্তু কেউই দেশের কথা ভাবেনা, ভাববেন না। এই অবস্থায় আমাদের দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

চারদিকে ঘটে যাওয়া ঘটনা, মানুষের হাহাকার, সামাজিক অস্তিরতা, নাগরিক জটিলতা, গ্রামীণ জীবনের সমস্যা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার সাথে যোগ হয় ব্যক্তিগত অস্থিরতা, সামাজিক বিবর্তন, ধর্মীয় গোঁড়ামি। এসব আমাদেরকে ভাবায়। ভাবনাগুলো নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আমরা যখন কিছু একটা করার চেষ্টা করি তখন নিষ্ঠুর সমাজ আমাদের দিকে হা করে থাকিয়ে থাকে এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ছে কিন্তু ঠিক মতো পরীক্ষা হয় না, পড়ানো হয় না। তরুণ, তরুণীরা পাস করে বেরোয় কিন্তু চাকুরী পায় না। যার জন্য হতাশায় ভোগে। এ অবস্থায় অশুভরা অশুভ আচরণ করছে প্রতিনিয়ত। যারা নষ্ট, যারা খুব খারাপ তারা আজ সমাজে শক্তিশালী এই সমাজে ভালো মানুষের স্থান নেই। খারাপরা দখল করে আছে ভালো মানুষের স্থান। সময় বদলেছে, পটভূমি বদলেছে অথচ মনোভাব বদলায়নি।

নারীদের সামাজিক মর্যাদা আজো অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। সীতা যে তিমিরে ছিলেন, তার কন্যারাও সে তিমিরেই রয়ে গেছেন। সম্প্রতি যুক্তরাজ্য প্রবাসী একজন লেখিকা সমাজে নারীদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন–'নারী হচ্ছে পুরুষের মাল্টি প্রোডাক্টস, ড্রয়িং রুমের শো পিস'। এটা এসেছে মেধাহীন, বুদ্ধিহীনদের মগজ থেকে। অনেকে এ উক্তিটির বিরোধিতা করলেও উক্তিটি সম্পূর্ণ সত্য।

আমাদের চোখ, কান, জিহ্বায় মরচে ধরেছে। আমরা কুঁজো হয়ে যাচ্ছি। অচল, অক্ষম, অনাথ হয়ে পড়ছি দিন দিন। আজো আমরা মুক্ত চিন্তা করতে পারি না। নিঃশ্বাস নিতে পারি না মুক্ত হাওয়ায়। দেশ ছেয়ে যাচ্ছে সাম্প্রদায়িকতায়, নিষ্ঠুরতায়, অত্যাচারে, অবিচারে। সুপরিকল্পিতভাবে প্রগতিশীলদের জব্দ করা হচ্ছে। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কথা বলবার অধিকার।

সমাজপতিরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। ধর্মের নামে, কর্মের নামে, শিক্ষার নামে, মনুষ্যত্ত্বের নামে। সমাজের সব জায়গায় ভুলের ক্রমবিকাশ। মানুষ এগুতে চায় সামনে, সত্যানুসন্ধানী মানুষ আলোর পথে পৌঁছতে চায়, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় কিন্তু তাঁদেরকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে দেওয়া হয় না। সুন্দর ও কল্যাণের প্রস্তুতির জন্য যাঁদের আন্দোলন, সমাজ থেকে পশু তাড়ানোর সংগ্রামে যাঁরা সদা প্রস্তুত। যাঁদের চোখে মুখে মানবতার অবিনশ্বর দৃপ্তি তাঁদেরকে এ সমাজ মেনে নেয় না। সত্য বলার অপরাধে সমাজ তাদের মেরে ফেলে।

লেখকের কলম তরবারির চেয়েও সহস্রগুণ ধারালো। কলমের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, সবচেয়ে নিপুন, সবচেয়ে ধারালো অস্ত্রও ব্যর্থ হয়ে যায়। একাত্তরের পর মনে করা হয়েছিল শত্রু পরাজিত হয়েছে; কিন্তু না। তারা আজো বাংলার উর্বর পলিমাটিতে নিঃশব্দে বুক টেনে হাঁটছে। রাষ্ট্র থেকে ওরা নির্বাসিত করছে মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিকৃত করছে ইতিহাস, সত্যকে ঢেকে দিয়েছে আবরণে। ধর্মের কথা বলে তারা অবস্থান নিয়েছে প্রগতির বিপক্ষে। কথা বলছে বাঙলার বিপক্ষে। তাদের কলঙ্কিত রক্ত ক্রমশই তাদের বর্বর হতে শিক্ষা দিচ্ছে। তারা চায় দেশ তাদের হাতে বন্দি থাকুক, দেশের বিবেকবান মানুষ হোক তাদের হাতের পুতুল। ওদের বিরুদ্ধে কলম ধরতে গিয়ে আজ প্রাণ দিতে হয়েছে প্রগতিশীলদের।

ইতিহাসের পাতায় আজ সত্য উপস্থিত নয়। ইতিহাস বিকৃত, মানুষ সন্ত্রস্ত, প্রাণ ওষ্ঠাগত, কণ্ঠ-রূদ্ধ। মানুষের ভিতর আজ মানবিকতা অনুপস্থিত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দানবের হাঁক-ডাক, শিক্ষকের রক্ত ঝরে ছাত্র নামধারী কিছু অসভ্যদের হাতে। এ অবস্থায় কারো যেন দায় নেই, দায়বদ্ধতা নেই। প্রতিশ্রুতি নেই।

স্বাধীন দেশে আমাদের কি চাওয়া পাওয়ার ছিল। দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু থাকবে, ধনী দরিদ্রের বৈষম্য কমে আসবে। হত্যা, রাহাজানি, ধর্ষণ, সন্ত্রাস হবে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখতে পাই, ধনী গরিবের বৈষম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের আশি ভাগ সম্পদ ভোগ করছে দশ ভাগ লোক। দেশের সম্পদ পাচার হচ্ছে বিদেশে। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলছে। ইসলামি শাসন কায়েম করার জন্য অসংখ্য দল প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে অনৈসলামিক পন্থায়। ধর্মের নামে মানুষকে ধর্মান্ধ করা হচ্ছে। তারা বলছেন ধর্মে সব সমস্যার সমাধান আছে। কিন্তু নিজেরাই তা বিশ্বাস করেন না। ধর্মকে তারা ব্যবহার করছেন ফায়দা লুটার জন্য।

দেশ আজ দু'ভাগে বিভক্ত। এক দিকে প্রগতিশীল অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল। আলোর দিকে অগ্রসরমান প্রগতিশীলরা। তাঁরা যে সমাজের ছবি আঁকেন; সেখানে শিশুর হাসি, নারীর রূপ, ফুলের রূপ, রস, ঘ্রাণ, কবিতার মাধুর্য জীবনকে করে তাৎপর্যমন্ডিত। কিন্তু বিরোধীরা-এর সম্পূর্ণ বিপক্ষে। তাদের কাছে অন্ধকারটাই সত্য। তারা এদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। তারা নিজের রক্তকে বিশ্বাস করে না। তাই তারা নিজেদের বাঙালি পরিচয়ে আবদ্ধ করতে চায় না। প্রতিক্রিয়াশীলরা কোন দিনই বুদ্ধি প্রজ্ঞায় পেরে উঠেনি; এই পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে তাই দেখা গেছে। তারা আশ্রয় নিয়েছে বুদ্ধির বিরুদ্ধে শক্তির। তারা শক্তি দিয়েই বার বার রুদ্ধ করতে চেয়েছে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে।

রাষ্ট্র ও সমাজের শাসক যারা তাদের জন্য অন্ধকার খুবই প্রয়োজনীয়। দৃষ্টিহীনতা সৃষ্টি করতে তারা তৎপর। দৃষ্টিহীনতা কম হলে মানুষের মনে বিশ্বাসের জন্ম হয়। তখন মানুষ সাম্প্রদায়িক হয়। শিশুর মতো বিশ্বাস করে সবকিছু। কারণ সে তখন তার চিন্তা শক্তি হারিয়ে ফেলে।। সমাজপতিরা আলো চায়নি, চায়নি আলোকিত মানুষ। তারা চায়নি দর্শন স্বতন্ত্র হোক ধর্ম থেকে, বিজ্ঞান বিকশিত হোক স্বাধীনভাবে। তারা চেয়েছে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য আর মানুষের হতাশা।

এই অবস্থা থেকে যারা নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছেন তারা হয়েছেন আলোকিত। অন্ধকারকে বলতে পেরেছেন অন্ধকার থেকে টেনে তুলবার চেষ্টা করেছেন অন্ধকারে নিমজ্জিতদের। আবার আঘাতও করেছেন সংস্কারের বিভিন্ন দুর্গে।

দেশের আজ যে অবস্থা তা আরো মারাত্মক হতো যদি সৃষ্টিশীলরা স্বোচ্ছার না হতেন। আমাদের চারদিকে যখন বিষের বলয় তখন প্রগতিশীল লেখক কবি সাহিত্যিকরাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন যে হচ্ছেনা তা নয়। এই মুক্ত চিন্তার আন্দোলন আরো বেগবান হওয়া চাই। এই আন্দোলনে আসতে পারে তরুণরা যারা এখনো স্বার্থ চিনে নি। এখনো যারা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি।

দাজ্জালের কথা

জাহিদ রাসেল

হুমায়ুন আজাদের 'আমার অবিশ্বাস' বইটি পড়া শেষ করে যেই না কোলের ওপর রাখলাম তখনি দেখলাম আমার পাশে বসা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক পাশ ফিরে আমার কোল থেকে বইটি তুলে নিলেন। নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সাথে বইটির কয়েকপাতা উল্টিয়ে আমাকে ফেরত দিলেন। আমাকে নাম জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছি জানতে চাইলেন। তিনিও তাঁর নাম জানালেন। আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা। আরো জানালেন, তিনি নিউইয়র্কের মদীনা মসজিদের খতিব। তাঁর কাছে ধর্মীয় প্রসঙ্গে লেখা অনেকগুলো বই দেখতে পেলাম। যেহেতু আমার হাতের কাছে আর পড়বার মতো কোন বই নেই, তাই তাঁর বইগুলো থেকে 'কান দাজ্জালের আবির্ভাব' বইটি তুলে নিলাম। শিরোনামটাই, আমাকে বোধহয় বইটা হাতে তুলতে আকৃষ্ট করলো। বইতে লেখকের নাম দেখে নিশ্চিত হলাম আমার পাশে বসা ব্যক্তিটিই এই বইয়ের লেখক। তারপরও তাঁকে প্রশ্নও করলাম তিনি লেখেছেন কি-না? তিনি মাথা নেড়ে জানালেন তিনিই লেখেছেন। তিনি আরো জানালেন, এটি নাকি ইতিপূর্বে মাসিক 'পরওয়ানা' নামক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়ে খুব পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিল, তাই এটিকে বই আকারে বের করেছেন। হুদা সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারলাম– হযরত আদম সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব-পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে মারাত্মক ফিতনা আর নেই।'

আমি আমার সংশয়বাদী পরিচয় প্রকাশ না করে তার সাথে কথা চালিয়ে যেতে লাগলাম :

মু আ হুদা : আমি এই বইটি লেখেছি ঈসা (আঃ) এর পুনরাগমনের এবং ইমাম মেহদীর আত্মপ্রকাশের পরের সর্বশেষ দাজ্জালকে নিয়ে। এই দাজ্জালের আগমনের পূর্বে আরো ২৯ জন দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "ততোদিন কেয়ামত হবেনা যতোদিন না (কমপক্ষে) ত্রিশজন মিথ্যা নবুয়ত এর দাবিদার দাজ্জালের আবির্ভাব না হয়েছে"।

জাহিদ : ও, দাজ্জাল তাহলে একজন না। তা, সর্বশেষ এই দাজ্জালের আবির্ভাব কখন হবে?

মু আ হুদা : হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন,–"ততোদিন পর্যন্ত দাজ্জাল বের হবে না যতোদিন না মানুষ বেমালুম দাজ্জালকে ভুলে যাবে এবং মসজিদের ইমামগণ মিম্বরে দাঁড়িয়ে দাজ্জালের কথা বলা ছেড়ে দেবে।" দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হবে প্রাচ্যের খোরসান বা তৎপাশ্ববর্তী এলাকায়। মনে করা হয়, সিরিয়া এবং ইরাকের মধ্যবর্তী কোন জনপদ থেকে সে বের হবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরো বলেছেন–"ত্রিশ বছর যাবত দাজ্জালের মা-বাবার কোন সন্তান সন্তানাদি হবে না; ত্রিশ বছরের পর তাদের একটি কানা, অত্যধিক মন্দ স্বভাবের একটি ছেলে সন্তান হবে। তার দুই চোখ ঘুমাবে কিন্তু অন্তর ঘুমাবে না। তার পিতা লম্বা হীনকায়, গাঁইতির মতো দীর্ঘ নাসিকা বিশিষ্ট হবে। তার মা বিশালকায় উন্নত বক্ষ, লম্বা হাত বিশিষ্ট হবে। বিভিন্ন হাদিসে মুহাম্মদ দাজ্জালের দৈহিক পরিচয় দিয়েছেন এভাবে, সে একজন পুরুষ, এক চোখ ফোলা, এক চোখের উপর মোটা চামড়া থাকবে, দুই চোখের মাঝখানে কাফ, ফা, রা অর্থাৎ কাফির লিখা থাকবে, সে হবে নিঃসন্তান।

[আমার মনের মাঝে ভেসে উঠলো ৪/৫বৎসর আগে বিটিভিতে প্রচারিত সিন্দাবাদ সিরিয়ালে সেই সমুদ্রদস্যু "কেহেরমানের" মুখখানি। তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যও অনেকটা দাজ্জাললের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। বিভিন্ন গল্প উপন্যাসে ভিলেনের চরিত্রগুলোর প্রতি পাঠক-পাঠিকার মনে ঘৃনা ও ভীতি সঞ্চায়ের জন্য যেমন তাদের শারীরিক দিকটিকে কদর্য ও ভয়াবহ করে তোলা হয় দাজ্জালের শারীরিক কাঠামো বর্ণনা সেই একই রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।]

জাহিদ : দাজ্জাল সর্ম্পকে আর একটু বলুন, শুনি।

মু আ হুদা : দাজ্জালের বাহন সর্ম্পকে বলা যায় "তার বাহন হবে এমন একটি গাধা যার দুই কানের মধ্যে ব্যবধান হবে চল্লিশ হাত। সে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো দ্রুত গতিসম্পন্ন"।

[দাজ্জালের গাধার বর্ণনা শুনে আমি হা হয়ে গেলাম। যেই গাধার দু-কানের মধ্যে ব্যবধান (মাত্র) ৪০ হাত, সে ঘোড়া কথিত অন্য আসমান থেকে পড়বে নাকি ডারউইনের তত্ত্ব সত্য প্রমাণ করে এই সময়ের ছোট খাটো গাধাগুলো দানবীয় রূপ লাভ করবে, তা ভাবতে লাগলাম।]

মু আ হুদা : (হুদা সাহেব মনে হয় আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন তিনি বলতে লাগলেন) আরে এইটা নিয়ে এতো ভাবনার কিছু নাই। আসলে দাজ্জালের বাহনটি রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে হয়তো। এটা হতে পারে কোন সে সময়ের কোন বিশেষ বাহন। তাছাড়া দাজ্জালের অনুসারী হবে ইহুদিরা, এদের তো আল্লাহপাক গাধা বলেছেন। আর যে গাধার ঘাড়ের প্রস্ত ৪০ হাত তার

গতিতে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো হতেই পারে।

[আজ যখন মানুষ শব্দের বেগ পরাজিত করে আলোর বেগে ছুটে চলার বাহন তৈরি করতে প্রস্তুত তখন আজ থেকে আরো পরে কেয়ামতের আগে (মরা মানুষ জীবিত করার মতো ক্ষমতাধারী) দাজ্জাল কেন যে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো ধীরগতির বাহন নিয়ে চলবে, তাও ভাববার বিষয়। এক্ষেত্রে পাঠকদের মনে রাখা দরকার এই গাধা দ্বারা ৪০ দিনে তিনি পৃথিবীর সব স্থানে যাবেন। আসলে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে মরুভূমিতে প্রধান বাহন ছিল উট। তাই সেই সময় বায়তাড়িত মেঘের বেগে চলা বাহন অপেক্ষা দ্রুতগতির বাহন কল্পনা করা সম্ভব হয়নি।]

জাহিদ : তা, দাজ্জাল রাজত্বের স্থায়িত্ব কত দিন হবে।

মু আ হুদা : দাজ্জালের রাজত্বের স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে মুহাম্মদ বলেন–"যে দুনিয়ায় চল্লিশ দিন থাকবে। এই চল্লিশ দিনের একদিন হবে একবছরের সমান, একদিন একমাসের সমান, এক দিন এক সপ্তাহের সমান, অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের স্বাভাবিক দিনের সমান"।

[হুদা সাহেব তার বইয়ের ২৫ পৃষ্ঠা খুলে আমাকে দাজ্জালের রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কে পড়তে দিলেন। আমি দেখলাম, বইয়ে উল্লেখিত কোনো কোনো হাদিসে বলা হয়েছে, দাজ্জালের রাজত্বের মেয়াদ ৪০ দিন আবার কোথাও বলা হয়েছে ৪০ বছর। কিন্তু এই কথার গড়বড়কে রূপকে হিসেবে ধরে নিয়ে বিভিন্ন ইসলামি মুহাদ্দিসগণ নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। মুসলমানেরাও খুব ভালো ছেলে; ওরা প্রশ্ন করে না, যা পায় তাই খায়।]

জাহিদ : তা, দাজ্জাল আর কী কী করবে?

মু আ হুদা : ঈমানের সর্বোচ্চ পরীক্ষা হবে দাজ্জালের সময়। যেমন–দাজ্জাল এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করবে, তাকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে বলবে। তারপর তাকে আবার জীবিত করে তুলবে এবং তাকে প্রশ্নও করবে–"তোমার প্রভু কে"। লোকটি উত্তর দেবে আল্লাহ। সেই লোকটি হবে জান্নাতে রাসুলের উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। দাজ্জাল আসবে লাখো পাপ পঙ্কিলতায় পূর্ণ তাগুতি বিশ্বকে নাফরমানিতে পূর্ণ করতে। আর অন্যদিকে ইমাম মাহদী আসবেন আল্লাহর দুনিয়াকে এসকল নাফমানির প্রভাত থেকে মুক্তি দিয়ে দুনিয়াতে আল্লাহর শাসন কায়েম করতে। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বলা যায়–কানা দাজ্জালের শাস্তির বিশ্ব কায়েম হয়ে গেছে। আমরা মুসলমানেরা যেমন ইমামমেহদী আত্মপ্রকাশ এবং ঈসা (আ.) এর পুনরাবির্ভাবের জন্যে অপেক্ষা করছি তেমনি কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ দাজ্জালের জন্যে অপেক্ষা করছে he is coming স্লোগান নিয়ে। দাজ্জাল আসার আগে তার রাজত্ব কায়েম হয়ে যাবে। বিশ্বের আনাচেকানাচে যেকোনো ভাবে তার বাহিনী পৌঁছে যাবে। আপনি যদি বাংলাদেশের দিকে তাকান তবে দেখবেন-বাংলাদেশে বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন পরিচয়ে, বিভিন্ন কায়দায়, বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাসী কতিপয় লোক অতিসম্প্রতি তাদের বিশেষ কাজ শুরু করে দিয়েছে। তাদের দেখে মানবতার পরম হিতৈষী বন্ধু মনে হয়। কিন্তু এরা দাজ্জালের রাজ্যের বিস্তারে সাহায্য ছাড়া কিছুই করছে না।

জাহিদ : আমি ঠিক বুঝলাম না আপনি কাদের কথা বলছেন?

মু আ হুদা : অনেকেই তো আছে, কেন এই যে নামে বেনামে এনজিও গড়ে উঠছে এরাইবা কম কিসের।

জাহিদ : কেন ওরা তো অনেক ভালো কাজ করছে, যেমন মানুষকে স্বনির্ভর, শিক্ষা বিস্তার, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীদের...

মু আ হুদা : নারী স্বাধীনতা? জাহিলিয়া যুগের লক্ষণই হলো, নারীরা ঘরের বাইরে বের হয়ে আসবে-ব্যভিচার শুরু হবে। এই এনজিও এগুলো বৃদ্ধি করছে।

জাহিদ : দাজ্জালের অনুসারি কারা হবে?

মু আ হুদা : দাজ্জালের অনুগামীরা মূলত ইহুদিদের থেকেই হবে। তারপর বেদুইন পল্লীবাসী এবং মহিলারা।

জাহিদ : আলাদাভাবে মহিলাদের কথা বলার কী দরকার?

মু আ হুদা : ভণ্ডপীর, ভণ্ডনবী আর ভণ্ডবাদের তাবেদারিতে মহিলারা হরহামেশাই পুরুষের চেয়ে পাকাপোক্ত। দাজ্জালের ডাকে তাই মহিলারা সবচেয়ে বেশি সাড়া দেবে। দাজ্জালের ডাকে সাড়া দেবে তাই তখন মানুষ তার স্ত্রী, মা, মেয়ে, বোন ও ফুফুকে দড়ির সাহায্যে বেঁধে রাখবে।

[নারীদের ব্যাপারে একটা নতুন তথ্য জানা গেল! অবশ্য ধর্ম নারীদের পর্দার নামে বোরকা বন্দি করে রাখে, সে ধর্ম নারীদের ব্যাপারে এ ধারনা পোষণ করতেই পারে, তাতে অবাক হবার বেশি কিছু নেই।]

জাহিদ : দাজ্জালের কাহিনীটা শুনি তাহলে।

মু আ হুদা : দাজ্জালের অভ্যুত্থান সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে হবে। ইস্পাহানের ৭০ হাজার তলোয়ারধারী ইহুদি তার তাবেদার হবে। অনেক দেশ জয় করবে এবং ধর্ম ভ্রষ্টও লোক তার অন্তর্ভূক্ত হবে। সে মক্কা ও মদিনায় প্রবেশের চেষ্টা করলে আল্লাহর নিযুক্ত ফেরেস্তা তাকে বাধা দেবে। দাজ্জাল তখন সিরিয়ার অভিমুখে যাত্রা করবে। দামেস্কে তখন ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি

নেবেন। একদিন আছরের সময় হঠাৎ ঈসা দু-জন ফেরেস্তার কাঁধের উপর ভর করে আসমান হতে অবতীর্ণ হবেন। দামেস্কের জামে উমাওয়ী মসজিদের পূর্ব দিকের মিনারের উপর এসে দাঁড়াবেন। ইমাম মাহদী তার উপর যুদ্ধের সমস্ত ভার ন্যস্ত করতে চাইবেন। কিন্তু তিনি বলবেন, ভার তো সব আপনার উপর থাকবে, আমি শুধু দাজ্জালকে বধ করবার জন্য এসেছি। ঈসা একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে একটি বল্লম/বর্শা হাতে দাজ্জালের দিকে ধাবিত হবেন। অন্যান্য মুসলমান সৈন্যগণ দজ্জালের সৈন্যগণের উপর আক্রমণ করবে। ভীষণ যুদ্ধ হবে। ঐ সময় ঈসার নিঃশ্বাসের মধ্যে এমন এক তাছির হবে যে, যতদূর দৃষ্টি যাবে ততো দূর শ্বাস যাবে এবং যে কাফিরের গাঁয়ে শ্বাসের একটু বাতাস লাগবে সে হালকা হয়ে যাবে। দাজ্জাল ঈসাকে দেখে ভাগবে। ঈসা তাকে পিছু নেবেন। 'বাবে লোদ' নামক স্থানে গিয়ে দাজ্জালকে বধ করবেন এবং তার বর্শায় দাজ্জালের রক্ত দেখাবেন। তারপর ঈসা যত জায়গায় দাজ্জাল অশান্তি স্থাপন করেছে, সেই সব স্থানে গিয়ে জনগণকে শান্তি দান করবেন। আল্লাহ ইহুদিদের নির্মূল করবেন, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু থাকবে না যার আড়ালে গিয়ে প্রাণে বাঁচবে। পাথর, গাছ, দেয়াল, চতুস্পদ জানোয়ার সবাই মুসলমানদের ডেকে লুকিয়ে থাকা ইহুদিদের দেখিয়ে দিয়ে হত্যার কথা বলবে। শুধু গারক্বাদ বৃক্ষ কোন কথা বলবে না। কারণ এটা ইহুদিদের গাছ।

জাহিদ : তাহলে গাছেরও আলাদা ধর্ম আছে!

মু আ হুদা : কী বলে নাই আবার। তুলসি গাছও তো একটা হিন্দু গাছ। আর সব গাছপালাও তো আল্লাহর ইবাদত করে।

জাহিদ : যুদ্ধে তাহলে তলোয়ার, বর্শা ও ঘোড়া ব্যবহৃত হবে। আজকের দুনিয়ায় যুদ্ধে যেখানে পারমানবিক-রাসায়নিক আধুনিক অস্ত্র, বিমান-রাডার ব্যবহৃত হচ্ছে সেখানে কেয়ামতের পূর্বে যে যুদ্ধ হবে তাতে কেন মধ্যযুগ বা প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত তলোয়ার বর্শা ও ঘোড়া ব্যবহৃত হবে এটা হাস্যকর নয় কি? আসলে আমার মনে হয় প্রাচীনকালে যারা এই ধরনের গল্প ফাঁদেন বা অন্য কোনো প্রাচীন গল্প থেকে সংগ্রহ করেন, তারা ভাবতেও পারেননি, দেড় দু-হাজার বছর পর পৃথিবীটাকে মানুষ কতোটা এগিয়ে নেবে। অবশ্য তার শুন্য মস্তিষ্কের অধিকারী অনুসারীরা এসকল গাঁজাখুরি গল্পের ফাঁক-ফোঁকর ঢাকতে বিভিন্ন রূপক অর্থ খোঁজায় খুবই দক্ষ। আর এই যে আপনি বলেছেন কেয়ামতের বিভিন্ন আলামত দেখা যাচ্ছে, দাজ্জালের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, এই সব আলামতের লক্ষণ আপনারা বহু শ বছর ধরে পেয়ে আসছেন আরো বহু শ বছর পাবেন। কিন্তু চোখের পর্দাটা সরালে দেখতে পাবেন মানুষ সেই প্রাচীন অন্ধার সভ্যতাটাকে আলোর পথে অনেকদূর টেনে নিয়ে এসেছে, টেনে নিয়ে যাবে হয়তো আরো বহু দুর। আর এই সভ্যতা এগিয়ে যাবার পথে প্রধান সমস্য আপনাদের কাল্পিক দাজ্জাল নয়। প্রধান বাধা আপনাদের অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার। এই সব গাঁজাখুরি গল্প অনেকটা রোগের মতো। এর সব গল্পে বিশ্বাস করে অনেকে নিজেকে মানবসমাজের উদ্ধারকারী হিসেবে নিজেকে ইমাম মাহদী ঘোষণা করবে, ঘৃণা জন্মাবে ইহুদি সহ অন্য ধর্মালম্বীদের প্রতি। গত বৎসর ও পাকিস্তানে এমনি এক স্বঘোষিত ইমাম মাহদী তার কিছু অনুসারী সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। দাজ্জালের মতো কাল্পনিক শত্রু তৈরি করে আর এধরনের গাঁজা খুরি গল্পে বিশ্বাস করে কাজের কাজ যা হয়েছে তা হলো মানুষে মানুষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়েছে...

মু আ হুদা : বেয়াদপের মতো কথা বলবে না। খুব বেশি বুইজ্জা ফেলছো, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, যে ছেলে হুমায়ুন আজাদের মতো একটা নাস্তিকের বই পড়ে তার সাথে এসব জ্ঞানের কথা বলতে যাওয়া মানে সময় নষ্ট করা। আল্লাহপাক তোমার হেদায়েত করুন।

উনি রেগে হন হন করে চলে গেলেন।

[একটি কাল্পনিক আলাপচারিতা]

সিলেটি মৌলবাদ

সুমন তুরহান

'মৌলবাদ' সম্ভবত আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যাপক ব্যবহৃত শব্দ। আদিতে এই শব্দটি বেশ নির্দোষ ছিলো, কিন্তু ভাষা ও সভ্যতার বির্বতনে এখন এটি হয়ে উঠেছে চরম নিন্দার্থক এবং ভীতিকর। এখন মৌলবাদ বলতে আমরা বুঝি–প্রতিক্রিয়াশীলতা, রক্ষণশীলতা, কূপমণ্ডুকতা, আদর্শিক উগ্রতা, চরমপন্থা, প্রগতি ও আধুনিকতা বিরোধিতা ইত্যাদি। মৌলবাদের সমার্থক শব্দে ভরে উঠেছে অভিধান। আজকের প্রেক্ষাপটে বলতে পারি, যা কিছু আধুনিকতা ও প্রগতি ও বিকাশের বিরোধী তা মৌলবাদ এবং যারা এই প্রগতিবিরোধী তন্ত্রে বিশ্বাসী তারা মৌলবাদী। দশকে দশকে আমরা অজস্র প্রজাতির মৌলবাদের উত্থান ও পতন লক্ষ্য করছি। যেমন, খ্রিস্টান ক্যাথলিক মৌলবাদ, সমাজতান্ত্রিক মৌলবাদ, নাৎসি মৌলবাদ, হিন্দু মৌলবাদ, জাতীয়তাবাদী মৌলবাদ প্রভৃতি। আমরা আরো শিখেছি যে, কোনো মৌলবাদই চিরস্থায়ী নয়। আজকের পরিবর্তিত বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত কট্টরপন্থার নাম 'ইসলামি মৌলবাদ'। তবে আজ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এসব আলোচিত মতবাদ নিয়ে পুনঃ আলোচনা নয়; আজ আমরা আলো ফেলে দেখতে চাই বাঙলাদেশের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন মতবাদের ওপর, যার যথার্থ ব্যবচ্ছেদ ইতঃপূর্বে ঘটেনি, যার নাম আমরা দিতে পারি– 'সিলেটি মৌলবাদ'।

অন্য যে কোনো মৌলবাদের মতোই 'সিলেটি মৌলবাদ' শব্দগুচ্ছটি বেশ ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে, যা এককথায় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। তবু সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগতে পারে, সিলেটি মৌলবাদ বলতে আমরা কী বুঝি? এটি এমন একটি প্রপঞ্চ যা ধর্মীয়, আঞ্চলিকতা, জাতীয়তাবোধ এমন আরো বহু চেতনার কিম্ভুত সমষ্টি; যার স্বরূপ উদঘাটন করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে একটু পেছনে, ব্যবচ্ছেদ করে দেখতে হবে সিলেট এবং সিলেটিদের ইতিহাস স্বরূপ-প্রকৃতি।

একথা আমরা সবাই মোটামুটি জানি যে, সিলেটের আদি নাম ছিলো–'শ্রীহট্ট'। শ্রীহট্টের আদি বাসিন্দারা মুলত মুণ্ডা, অহমিয়া, দ্রাবিড় বংশোদ্ভুত ইন্দো-আর্য হিন্দু বাঙালি। প্রাচীন হিন্দুদের তান্ত্রিক ধর্মগ্রন্থ 'শক্তি সঙ্গম তন্ত্র'–তে সিলেটকে শিলগট্ট' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল সিলেটের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলো। সিলেট বস্তুত তখন ছিলো প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। পরবর্তীতে শাহজালাল ও তার অনুচরদের প্রভাবে সিলেটের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। মুসলমান শাসনামলে সিলেটকে সরকারি দলিলপত্রে 'জালালাবাদ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতার রচনাবলিও একই সাক্ষ্য দেয়।

১৭৬৫ সাল থেকে বার্মাকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসকেরা সিলেটকে ভৌগলিক মর্যাদা দিতে শুরু করে। পরবর্তীতে সিলেটকে আসামের অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এটি আসামের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। দেশ বিভাগের সময় রেফারেন্ডামের মাধ্যমে প্রায় পুরো সিলেট পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়। শুধু মাত্র করিমগঞ্জ, কাছাড় ও শিলচর মিলে করিমগঞ্জ সাবডিভিশন ভারতেই রয়ে যায়।

সিলেটের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে ভাষার কথা। মূল সিলেট ছাড়াও ভারতের গৌহাটি, শিলচর, শিলং, কাছাড়, বরাক উপত্যকা, করিমগঞ্জ, আগরতলা, লন্ডন, মধ্যপ্রাচ্য মিলে সারা বিশ্বের প্রায় ১০ কোটি ৩ লক্ষ মানুষ সিলেটি উপভাষায় কথা বলেন। বাঙলার সাথে অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও এডওয়ার্ড গেইট তার 'হিস্ট্রি অব আসাম'–গ্রন্থে সিলেটি ভাষাকে পূর্ব ভারতীয় ভাষাবংশের অর্ন্তভূক্ত এবং অহমিয়া ভাষার অপভ্রংশ রূপ বলে দাবি করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানী জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনও একই মত পোষণ করেন। তবে, সমসাময়িক ভাষাবিদ রেইমন্ড গর্ডন সিলেটি উপভাষার সাথে বাংলার ৭০ শতাংশ মিল রয়েছে বলে মনে করেন। উত্তর প্রদেশ ও বিহারের 'কাইথি' লিপির অনুকরণে সিলেটি ভাষা এককালে 'নাগরি' লিপিতে লিখিত হতো, তবে এসব লিপি এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে কালের ধুলোয়। বিপুল পরিমাণে হিন্দি, আরবি ও ফারসি শব্দের উপস্থিতি সিলেটি উপভাষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সিলেট বাঙলাদেশের অন্যতম প্রাচুর্যশালী অঞ্চল। বাঙলাদেশের সবচেয়ে বেশি প্রবাসীর সংখ্যা সিলেট অঞ্চলে এবং অসংখ্য পরিবার প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার ওপর নির্ভর করে থাকেন। সিলেটি প্রবাসীদের অপচয়প্রবণতা সর্বজনবিদিত; তারা প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করেন কিন্তু শিল্পকারখানা তৈরিতে কখনো খরচ করেন না, শিল্পায়নের চাইতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণে তাঁরা সাধারণত বেশি উদ্যোগী। সিলেটিরা ভ্রমণপিপাসু নন, সিলেটের বাইরে একমাত্র লন্ডন সম্পর্কেই তাঁরা খোঁজখবর রাখেন আর বাঙলাদেশ সম্পর্কে অনেকের জ্ঞান শোচনীয়ভাবে সীমিত। একবার সারা বাঙলাদেশ ভ্রমণে গিয়ে আমি আবিস্কার করেছিলাম দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সিলেটিরা বেশ অলস। উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গের মানুষ যেভাবে প্রতি ইঞ্চি জায়গা কাজে লাগিয়ে সারা বছরব্যাপী কৃষিকাজ করেন সিলেটে তা বিরল, এখানে একরের পর একর জমি আবাদহীন পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই অলস সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব দেখতে পাই সিলেটের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে, লন্ডন যাওয়া ছাড়া আত্মনির্ভর হওয়ার আর কোনো পথ তাদের জানা নেই। সিলেটের শিরায় শিরায় সবসময় প্রবাহিত

হচ্ছে লন্ডন আর মধ্যপ্রাচ্যের মুদ্রা, ওই দু-টি অঞ্চলের আর্শীবাদ ছাড়া সে অচল।

সিলেটের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সিলেটিরা বেশ সচেতন ও স্পর্শকাতর। স্বাজাত্যবোধ এ অঞ্চলের মানুষের মাঝে জন্ম দিয়েছে এক কট্টর আঞ্চলিক মৌলবাদের, যার প্রমাণ পাই নন-সিলেটিদের প্রতি সিলেটিদের বৈষম্যমূলক আচরণে। বাঙলাদেশের বাসিন্দা হয়েও সিলেটিরা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষকে নির্বিচারে 'নোয়াখালি' বলে গালমন্দ করেন। সিলেটিদের কাছে নন-সিলেটি মাত্রই 'নোয়াখালি'! কেউ হয়তো বগুড়ার বাসিন্দা, কেউ পাবনা-রংপুর-খুলনার; কিন্তু সিলেটিদের কাছে নিজেরা ছাড়া বাকি ৬০টি জেলার সবাই 'নোয়াখালি'। এই আচরণ সিলেটিদের মূর্খতার প্রচণ্ড প্রকাশ। আঞ্চলিক মৌলবাদের ভয়াবহতম রূপটি ধরা পড়ে সিলেটি ভাষাতেও। সিলেটিরা অবলীলায় নিজেদের 'সিলেটি' এবং অন্যদের 'বেঙ্গলি'বলে আজো অভিহিত করেন, যদিও জাতিত্বের পরিচয়ে বাংলাদেশের উপজাতি সম্প্রদায় ছাড়া বাকি প্রত্যেকেই 'বেঙ্গলি' বা বাঙালি। তবে উন্নাসিক সিলেটিরা এসব যুক্তি বুঝতে রাজি নন, তাঁরা নিজেদের ছাড়া বাকি সবাইকে নিম্নশ্রেণীজাত বলেই মনে করেন। কুয়োর ব্যাঙ আর কাকে বলে! সিলেটি অঞ্চলে যে সকল নন-সিলেটিরা কাজের উদ্দেশ্যে বা বেড়াতে আসেন তাঁদের অধিকাংশই তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যান। স্থানীয়রা অনেক সময় তাঁদের সাথে চলিত বাঙলায় কথা না বলে সিলেটিতেই কথা চালিয়ে যান। আরেকটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক সত্য হচ্ছে যে–এসব কর্মজীবীদের সন্তানেরা সিলেটের স্কুল-কলেজে সিলেটি সহপাঠীদের মৌখিক নির্যাতনের স্বীকার হয়। 'পারলে আমাদের মতো কথা বলো, নইলে কথা বলতে এসো না', 'তুই তো একটা নোয়াখালি'–ইত্যাদি। এটা বলা অন্যায় হবে যে সব সিলেটিরা বৈষম্যমূলক আচরণ করেন, তবে অধিকাংশরাই সচেতন বা অসচেতনভাবে এমনটি করে থাকেন।

সিলেটি মৌলবাদের অন্যতম শিকার হচ্ছেন উত্তরবঙ্গের রিকশাচালকেরা, যাঁরা পেটের দায়ে এ অঞ্চলে রিকশা চালাতে আসেন। এদের মধ্যে অনেকেই খণ্ডকালীন রিকশাচালক, নিজের দেশে হয়তো অনেকেরই জমিজমা ও ফসল রয়েছে। সিলেটে এসে তাঁরা প্রথমেই মুখোমুখি হন ভাষিক এবং আঞ্চলিক নির্যাতনের। আমি নিজেও বহুবার মৌলভীবাজারের রাস্তায় রিকশাচালকদের নির্যাতনের শিকার হতে দেখেছি। আরোহী হয়তো তাঁকে যেতে বলেছেন একদিকে, তিনি গিয়েছেন আরেকদিকে,–সিলেটি ভাষা বুঝতে পারেননি বলে। রংপুরের তারাগঞ্জে তাঁর গায়ে কেউ হাত তুললে তিনি হয়তো অপরাজেয় নূরলদীনের মতো 'জাগো বাহে' বলে প্রতিবাদটুকু অন্তত করতে পারতেন; তবে সিলেটে তিনি তা করবেন না, এখানে তাঁর কথা-বলারও অধিকার নেই।

নাট্যকার শাকুর মজিদের 'লন্ডনি কইন্যা' নাটকটি নিয়ে সিলেটবাসীরা রীতিমতো গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে ফেলেছিলেন। এই উন্মাদনার কারণটি আমার কাছে আজো অস্পষ্ট। এই সত্যটি অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই যে, অধিকাংশ সিলেটি তরুণেরা 'লন্ডনি চেতনা' নিয়ে বেড়ে ওঠে, লন্ডনই তাদের প্রথম প্রেম এবং লন্ডন যাওয়াই তাদের জীবনের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে খালাকে মা ডেকে, ভাবীকে বৌ ডেকে লন্ডন যাওয়ার উদাহরণও বিরল নয়; অন্তত ব্রিটিশ হাইকমিশনের বাৎসরিক রিপোর্ট সে কথাই বলে। তবে লন্ডন যাওয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় পন্থাটি হচ্ছে 'লন্ডনি কইন্যা' বিয়ে করা; স্থানীয়ভাবে যার আরেক নাম হচ্ছে 'পেটিকোট ভিসা'। অধিকাংশ সিলেটি অভিভাবকই নিজেকে ধন্য মনে করেন যদি তাঁদের এস.এস.সি ফেল সুপুত্রটি অথবা কলেজের সুদর্শন গুন্ডাটি কোনো 'লন্ডনি কইন্যা' বিয়ে করে লন্ডন যেতে পারে। এই অপ্রিয় সত্যগুলো সবাই জানেন, এমনকি যাঁরা শাকুর মজিদকে সিলেটে 'অবাঞ্চিত' ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদেরও অজানা থাকার কোনো কারণ নেই। দুঃখজনক হলো, এই সত্যগুলো জেনেও সিলেটিরা চমৎকার ভন্ডামো করেন। তাঁরা কিছুতেই আত্মসমালোচনা করতে রাজি নন, নিজেদের ভাবমূর্তির ব্যাপারে তাঁরা খুবই উদ্বিগ্ন থাকেন নিরন্তর। কী শোকাবহ এই স্ববিরোধিতা! সাহিত্য-নাটক-চলচ্চিত্র কি জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়? যদি তাই-ই হয়ে থাকে তাহলে সত্য প্রকাশে বাধাটা কোথায়? লন্ডনপ্রেম খারাপ কিছু নয়, লন্ডন খুবই চমৎকার নগরী, লন্ডন যাওয়াতেও আমি আপত্তির কিছু দেখি না। লন্ডন প্রবাসীদের কল্যাণে সিলেট অনেক আর্থ সুবিধা উপভোগ করে আসছে। তবে সময় এসেছে, লন্ডনপ্রেমের নেতিবাচক দিকগুলো বিচার করে দেখার। আমরা কি পেরেছি বাঙলাদেশকে একটি আধুনিক, পরিশীলিত ও শিক্ষিত প্রজন্ম উপহার দিতে যা নিয়ে সিলেটবাসী গর্ব করতে পারেন? তুলনামূলক বিচারে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় আমরা পিছিয়ে আছি শিক্ষাক্ষেত্রে। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি প্রতিটি সৃষ্টিশীল এলাকাতেই আমাদের অবস্থান শোচনীয়। এখানে শিল্পকারখানার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া কঠিন। লন্ডনপ্রেমের হুজুগ সিলেটকে যতোটা কলঙ্কিত করেছে, অন্য আর কিছু ততোটা করেনি। আমাদের তরুণদের লন্ডনমোহের অবসান ঘটা জরুরি, অভিভাবকদের মোহমুক্তি ঘটা আরো বেশি জরুরি।

আমাদের সিলেট বাঙলাদেশের সবচেয়ে রক্ষণশীল এলাকা বলা যায়। প্রগতির কথা বলা এখানে অত্যন্ত বিপদজনক। এখানে কবি শামসুর রাহমান নিষিদ্ধ, 'লাল সালু' নাটক নিষিদ্ধ, সম্প্রতি ডক্টর জাফর ইকবালও নিষিদ্ধ হয়ে গেছেন। সিলেট নিয়ে কিছু বলা বা করাই মুশকিল। হেলাল খান পরিচালিত 'হাছন রাজা' ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর সিলেটে ব্যাপক তোলপাড় হয়, পরিচালকের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করা হয়েছিলো। লন্ডনপ্রবাসী সিলেটিরাও রক্ষণশীলতায় পিছিয়ে নেই, সেখানেও পাই সিলেটি মৌলবাদের প্রবল রূপ। সম্প্রতি, বাঙালি বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ লেখিকা মনিকা আলি তাঁর বহুলবিক্রিত 'ব্রিকলেন' উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়নের ঘোষণা দিলে সিলেটিরা প্রচন্ড খেপে ওঠেন, অশান্ত হয়ে উঠে কার্ডফ-ব্রিকলেন-টাওয়ার হ্যামলেট। মনিকা আলির মা ইংরেজ, বাবা নন-সিলেটি বাঙালি-এটাই কি অশান্তির কারণ? মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখন বিপন্ন পাশ্চাত্যেও, আর তা আমাদের হাতেই।

তবে শুধু নন-সিলেটিরাই নন, সিলেটি মৌলবাদের শিকার কখনো কখনো সাধারণ সিলেটিরাও। এ অঞ্চলে বসবাসকারী 'সৈয়দ' বংশীয়দের কৌলিন্য ও জাত্যভিমান বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। ইসলামে জাত্যভিমান সাধারণত নিরুৎসাহিত করা হলেও, আদিম সৈয়দদের মধ্যে তা অত্যন্ত প্রকট; তাঁরা তৃপ্তি পান সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞা করে। বাঙলার পলিমাটিতে জন্ম নিয়েও সৈয়দরা নিজেদের আরব-ইরান-তুরস্কের

বংশধর বলে দাবি করেন, ভোগেন প্রান্তিক মানসিকতায় । এটি একটি অচিকিৎস্য মানসিক রোগ । অনেক 'শিক্ষিত' সৈয়দরাও নিজেদের গোত্র ছাড়া অন্য কোনো গোত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক মেনে নেন না । এতে অবশ্য তাঁদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়, সিলেট অঞ্চলে সৈয়দ-অধ্যুষিত গ্রামের অভাব নেই । আমার শহর মৌলভীবাজারে একটি গ্রাম আছে, যেখানে অবিশ্বাস্য হলেও প্রতিটি পরিবারই নিজেদের সৈয়দ পরিবার বলে দাবি করেন । এই দাবির ওপর অবশ্য কোনো কথা নেই! সিলেটি মৌলবাদের সবচেয়ে করুণ, হাস্যকর, ভয়াবহ রূপ দেখতে পাই আরেকটি ক্ষেত্রে । বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের বাসিন্দারা নির্দ্বিধায় দেশের যেকোনো প্রান্তে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে রাজি থাকেন, কিন্তু সিলেটিরা এর পুরোপুরি বিপরীত । দেশের অন্য কোথাও বিয়ের কথা উঠলে আজো সিলেটিদের রক্ত জমে বরফ হয়ে যায় । এই অদ্ভুত মানসিকতা সমাজ ও মনোবিজ্ঞানীদের জন্য চমৎকার গবেষণার বিষয় বলে গণ্য হতে পারে । সিলেটিরা কোনোভাবেই তাঁদের বিশুদ্ধ অমলিন রক্তকে মলিন করতে চান না, যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে এই বিশুদ্ধতা । এই কপট ভন্ডামোর কোনো ভিত্তি নেই, এটিও একটি অসুস্থ মানসিকতা । এ জাতীয় কট্টর রক্ষণশীলতা কখনো কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না, বরং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মীয়তার প্রচলন হলে সিলেটিদের গোঁড়ামি অনেকটা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো ।

আমাদের জন্মস্থান সিলেটে একটি সামাজিক পরিবর্তন খুব দরকার এই মুহূর্তে আর তা আসতে হবে প্রগতিশীল সিলেটিদের মধ্য থেকে, আমাদের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যেই । ঐশ্বর্যের অভাব দেখতে পাই না সিলেটে, কিন্তু সুশিক্ষা ও মেধার অভাব খুবই প্রকট । 'মেধা প্রকল্প', 'নির্ঝর'–জাতীয় সংগঠনগুলো একসময় বেশ সাড়া জাগিয়েছিলো, এখনো কোনো কোনোটি ধুঁকে ধুঁকে টিকে আছে, ওভাবে টিকে থাকা মৃত্যুর চেয়েও মর্মান্তিক । শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজ করছে অত্যন্ত হতাশাজনক পরিস্থিতি–যেদিকেই তাকাই দেখতে পাই চরম বন্ধ্যাত্ব । শ্রেণীকক্ষে স্থানীয় শিক্ষকেরা চমৎকার কমলালেবুর গন্ধযুক্ত সিলেটি বলেন; ভুলে যান বহিরাগত ছাত্রদের কথা, আর আঞ্চলিক রাজনীতি মারপ্যাঁচ কষে কোণঠাসা করে রাখেন নন-সিলেটি শিক্ষকদের । এই প্রবণতা স্থানীয় ছাত্রদের পরিশীলিত বাঙলা শেখার ক্ষেত্রে সহায়ক নয় । উচ্চারণে অশুদ্ধতা ও প্রবল সিলেটি প্রভাবের ফলে বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতায় আবৃত্তি-বিতর্ক থেকে শুরু করে আরো নানা ক্ষেত্রে আমাদের অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে ব্যর্থ হয়; বিপুল উৎসাহ নিয়ে তারা প্রতিযোগিতায় যায় এবং সাধারণত অশ্বডিম্ব নিয়ে ফিরে আসে । শুধু শিক্ষক বা অভিভাবক নন, আমাদের অর্থমন্ত্রীকেও মাঝেমধ্যেই দেখি টিভিতে অবলীলায় সিলেটিতে কথা বলছেন, সিলেটিতে সাংবাদিক সম্মেলন করছেন, সিলেটিতেই করছেন বাজেট পেশ । এমনকি দাতা সংস্থাগুলোর সঙ্গে বৈঠকেও তিনি সিলেটি সুরেই ইংরেজি বলেন । তাঁর কল্যাণে আজ বাঙলাদেশের এমন অনেকেই সিলেটি শিখে বসে আছেন, যাঁদের কখনো শেখার প্রয়োজন ছিলোনা । সমভাষী বন্ধুদের সাথে আড্ডায় বা ঘরোয়া পরিবেশে নিজস্ব উপভাষায় কথা বলাটা অবশ্যই কোনো অপরাধ নয়, বরং সেটাই স্বাভাবিক; কিন্তু শ্রেণীকক্ষে, মঞ্চে, সংসদে, সাংবাদিক সম্মেলনে পরিশীলিত বাঙলা বলতে না চাওয়া, লিখতে না পারাটা কি অপরাধ বলেই গণ্য করা উচিত নয়?

সিলেট, মহাসমুদ্রের একটি ক্ষুদ্রতম চর, আর আমরা সেই চরের অধিপতিরা, আর কিছু করতে না পারলেও জন্ম দিয়েছি একটি স্বতন্ত্র মৌলবাদের । সিলেটি মৌলবাদ, অত্যন্ত নীরবে, বহুদিন ধরেই ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ মহামারি আকারে, এখনই এই প্রগতিবিরোধী আঞ্চলিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দরকার । প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদের গোষ্ঠীবদ্ধ করে রেখে কোনো ইতিবাচক অর্জন আনা সম্ভব নয় । কোনো মুক্তমনের মানুষই আঞ্চলিক মৌলবাদে দীক্ষিত হতে পারে না; পারেন না সংকীর্ণতার দেয়ালে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে । পৃথিবীটা অনেক বড়ো, তবে আমাদের সুশীল ভণ্ডরা এখনো বেশ আদিম, তাঁদের সময় এসেছে কুয়োর বাইরে বেরিয়ে এসে বিশাল বিশ্বটাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার । আমরা প্রত্যেকে মানুষ, এবং আমরা প্রত্যেকেই বাঙলাদেশের বাঙালি–এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করতে সিলেটবাসীর আর কতোকাল লাগবে?

তথ্যসূত্র

১. মতিউর রহমান চৌধুরী, সিলেট ও সিলেটি ভাষা, মার্চ ১৯৯৯ । স্টার প্রকাশনী ।

Edward Gate, History of Assam, p274, spink & Co.

George Abraham Grierson, Language survey of India, 2nd Vol, Part 1, Page 224, Royal Asiatic Society.

2. Sanjib Barua, India against itself; Assam and the politics of nationality, p42. University of Pensilvenia Press.

3. Monika Ali, Briclane, Black Swan 2004

Indian Council for cultural relations: The Indo-Asian Culture. p29;

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল- এর কাছে খোলা চিঠি

ফাতেমা রেজমিন

শ্রদ্ধেয় জাফর স্যার,

অনেক দিন ধরেই ইচ্ছে ছিলো আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে কিংবা আপনার সাথে সরাসরি দেখা করে, কয়েকটি কথা বলবো। দুটোই আমার জন্য তেমন কঠিন ছিল না, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক নানা অস্থিতিশীল অবস্থা এবং তা নিয়ে আপনার ব্যস্ততা-মূলত এই দুয়ের কথা ভেবেই আজকে *যুক্তির* মাধ্যমে আমার এই খোলা চিঠির অবতারণা। স্যার, কিছুদিন আগে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের ওপর অসাধারণ একটি বই পড়ার। সৌভাগ্য বলছি এ কারণেই যে, বর্তমান সময়ে বইটি হয়তো আর সহজলভ্য নয়; বইটি হলো, ''একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়'' (মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত, পঞ্চম মুদ্রণ : ১৯৯২ সাল) আজকে আমার খোলা চিঠিটি এই বইটিকে কেন্দ্র করে।

আমার বিশ্বাস, বইটি আপনি পড়েছেন অথবা বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনি সম্পূর্ণ অবগত। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের কুৎসিত-কলংকিত ঘাতক, দালাল, রাজাকার-আলবদরদের সম্পর্কে ছোটবেলা থেকে আমার একটু একটু ধারণা থাকলেও বিশদভাবে এদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতাম না। তাই যখন এই অসাধারণ বইটি হাতে নিলাম আমি এক নিঃশেষে পড়তে পারিনি। ধীরে ধীরে বইটি পড়ার সময় আমার কখনো ঘৃণায় মুখ কুঁচকে গেছে, কখনো সারা শরীর শিউরে উঠেছে, তীব্র যন্ত্রণায় কখনো কেঁপে উঠেছি, আবার কখনোবা নিষ্ফল আক্রোশে প্রচণ্ড কষ্ট মনে চেপে, বই বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলাম। আমাদের প্রাণপ্রিয় বাঙালি সংস্কৃতি, বাঙলা ভাষা টিকিয়ে রাখার জন্য পরিচালিত মহান মুক্তিযুদ্ধকে যে সকল ঘৃণা চক্রান্তকারী রাজাকার-আলবদর-দালালের দল ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছিল, এদেশের গণমানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ইসলামের নাম নিয়ে কৌশলে লাম্পট্য-ভন্ডামি করে 'পাকিস্তান' নামক হিজড়ে রাষ্ট্র টিকিয়ে রেখে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছিল, এদেশের লাখো নারীকে ভোগের সামগ্রী বানিয়েছিল, এদের পরিচয় জেনে আমি চোখে পানি ধরে রাখতে পারিনি, ঘৃণায় সারা শরীর রি রি করেছে। এরা কী করে এতো জঘণ্য কাজ করতে পারলো? বিবেক, মনুষ্যত্ব কি এদের বিন্দু পরিমাণও ছিল না?

আজকের এই নির্বাচনী ডামাঢোলের সময় বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক দাবিদার কতিপয় রাজনৈতিক দলগুলো এই সকল কুখ্যাত খুনী সাথে কী করে আপোসের কথা বলে, একত্রে বাংলাদেশের একমঞ্চে দাঁড়িয়ে সরকার গঠনের প্রত্যয় নিয়ে রাজনৈতিক স্লোগান দেয়, শহিদ মিনারে-স্মৃতিসৌধতে গিয়ে ফুল দেয়? ছি! ছি! আজকে আলবদরের দল শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করে, এর থেকে নোংরা তামাশা এই বাংলাদেশে কি আর কখনো হয়েছে? এখনো তো এদেশ থেকে সকল মুক্তিযোদ্ধারা মারা যাননি, একাত্তরের শহিদের রক্তের দাগ এখনও রাজাকারের হাত থেকে মুছে যায়নি, মাটিতে এখনও মুক্তিযোদ্ধাদের লাশের গন্ধ, বাতাসে ভাসে একাত্তরে সন্তানহারা মায়ের করুণ ক্রন্দন, বিচার না-পাওয়া ধর্ষিত নারীর আর্তনাদ। কতশত মা আজো মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের কবর খুঁজে বেড়াচ্ছেন, একটি বার দেখবেন শুধু। তবে, কেমন করে ওরা আজ বাংলাদেশকে *বাংলাস্থান* বানিয়ে দিতে চায়? রাজপথে জঙ্গি হুঙ্কার দেয় 'বাংলা হবে আফগান, আমরা হবো তালেবান'। আমার ধারণা, আমাদের মতো মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্মের প্রায় সবারই এই সব ঘৃণ্য অপরাধী সম্পর্কে এবং তাদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তেমন কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই। যার জন্যে, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে এই সকল যুদ্ধাপরাধীদের রাজনৈতিক-সামাজিক শক্ত অবস্থান তৈরি-হওয়ার পেছনে আমাদের এই অজ্ঞানতাও অনেকটা দায়ী। তাই আপনার কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ, অতীতে আপনি যেভাবে পত্রিকার পাতায় আপনার কলামে বর্তমান প্রজন্মের পাঠের জন্য মুক্তিযুদ্ধের ওপর কিছু বইয়ের নাম উল্লেখ করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই এই বইটি পড়ার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন। কারণ, শুধুমাত্র আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবগাথা জানলেই চলবে না মুক্তিযুদ্ধের কলংকিত-ঘৃণ্য দালাল, রাজাকারদের কথাও আমাদের জানতে হবে, তাদের কে চিনতে হবে, তাদেরকে সামাজিকভাবে-রাজনৈতিকভাবে বয়কট করতে হবে; তাহলেই আমরা আমাদের শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমাদের ঋণ কিছুটা শোধ করতে পারব। যদিও বলা হয়ে থাকে, পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়। কিন্তু এই সকল রাজাকার, যুদ্ধাপরাধীদেরকে ঘৃণা করা, তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো আমাদের দায়িত্ব। আমার মতো এ দেশের বহু কিশোর-তরুণের আদর্শ আপনি, তাই আপনি যদি তাদেরকে ''একাত্তরের ঘাতক ও দালারো কে কোথায়'' বইটি পড়তে বলেন, তবে আমি মনে করি, তারা অবশ্যই আপনার কথা গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করবে। এবং অবশ্যই '*একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়*' ধরনের গ্রন্থ আরো বেশি করে প্রকাশ করতে হবে।

এখন একাত্তরের ঘাতক-দালাল যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের বিচার নিয়ে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে, সেই প্রশ্নগুলোই উত্থাপন করবো :

- ১৯৯২ সালের দিকে শহিদ জননী জাহানারা ইমাম ঘৃণ্য রাজাকার-আলবদরদের বিচারের জন্য যে গণআদালত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আপনারা যারা তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন, তাঁরা কি সেই গণআদালতের রায় বাস্তবায়ন করার জন্য আবার এই আন্দোলন শুরু করতে পারেন না?
- মুক্তিযুদ্ধ চেতনাবিকাশ কেন্দ্র, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত সংগঠনগুলোতে কি আবার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনা একেবারেই অসম্ভব?
- গণআদালত বা আমাদের প্রচলিত আদালতের মাধ্যমে একাত্তরের এই সকল চিহ্নিত দালালদের বিচার কি কেনোদিনই হবে না? আমাদের বাঙালি সমাজে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার জন্য অতীব প্রয়োজনীয় হচেছ, রাজাকার- আলবদরদের যুদ্ধাপরাধীর তালিকা তৈরি করা-এদের বিস্মৃত হওয়ার আগেই তৈরি করতে হবে। এই ধরনের উদ্যোগ কবে নেয়া হবে?
- একাত্তরের ঘৃণ্য অপরাধীদের ভোটাধিকার, রাজনীতি করার অধিকার কি কেড়ে নেয়ার আন্দোলন কি আর কোনদিনই সম্ভব হবে না? তারা কি কখনোই তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে না?
- যে সাহসিকতা নিয়ে আপনারা বিগত সরকারের 'একমুখী শিক্ষানীতি' নামে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, একই রকম সাহস নিয়ে কি আবারও একাত্তরের ঘাতকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করা যায় না?

জানি, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের আন্দোলনের পথ অনেক দুর্গম, এমনটি এই ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে চিন্তা করাও বৃথা, কারণ একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে চাইলে সরকার, এবং সরকারি প্রশাসন থেকে বিন্দুমাত্র কোনো সহযোগিতা পাওয়া যাবে না এবং আমাদের নব্যরাজাকারেরা পেশিশক্তি দিয়ে এই আন্দোলন স্তব্ধ করতে চাইবে। কিন্তু তারপরও আমার স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করে, একদিন বাংলাদেশের হাজারো বদ্ধভূমিতে আমার চিৎকার করে বলব, আমরা অকৃতজ্ঞ নই ..... আমরা ওদের সাথে আপোস করিনি ..... আমরা রাজাকারদের ক্ষমা করিনি, আমারা ওদের বিচার না করে ক্ষমা করব না ..... করতে পারি না।

আমার এই লেখা যদি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে আশা করি আপনি আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দেবেন। আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি। সবশেষে, আবারো আমি ওই সকল ঘৃণ্য রাজাকার-আলবদর-আলশাম্সদের উদ্দেশ্য বলি-

... আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধূলিতে
অভিশাপ দিচ্ছি।
আমাদের বুকের ভেতর যারা ভয়ানক কৃষ্ণপক্ষ
দিয়েছিলো সেঁটে,
মগজের কোষে কোষে যারা
পুঁতেছিলো আমাদেরই আপনজনের লাশ
দগ্ধ, রক্তাপ্লুত,
..... আমাকে করেছে বাধ্য যারা
আমার জনক জননীর রক্তে পা ডুবিয়ে দ্রুত
সিঁড়ি ভেঙে যেতে
ভাসতে নদীতে আর বনবাদাড়ে শয্যা পেতে নিতে,
অভিশাপ দিচ্ছি আজ সেই খানে দজ্জালদের।

-- অভিশাপ দিচ্ছি / শামসুর রাহমান।

মুসলিম দর্শনে মুতাজিলাবাদ

মনির হোসাইন

দর্শন :

সুদীর্ঘকাল ধরেই মানুষের চিন্তাজগতে জগৎ ও জীবনের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও পরিণতি সংক্রান্ত কিছু কিছু মৌলিক বিষয়াবলি নিয়ে নানা বিস্ময়, কৌতুহল, জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয়েছে। এই বিস্ময়বোধ, কৌতুহল–জিজ্ঞাসার তাগিদেই মানুষ নামক প্রজাতি চালিত হয়ে আসছে অজানাকে জানার, বিশ্ব-মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের, মানবজীবনের বিবিধ রহস্য উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে। ছোট্ট একটি পাখি যেমন ডানা মেলে উড়ে যায় দূর থেকে অনেক দূরে, আকাশের মেঘ যেমন পাড়ি দেয় লোক থেকে লোকান্তরে, তেমনি যুগে যুগে কৌতুহলী মানুষ তার শত সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে ব্রতী হয়ে জ্ঞানানুশীলন আর সত্যানুসন্ধানের দুঃসাহসিক কাজে। এই জ্ঞানানুশীলন আর সত্যানুসন্ধানের আন্তরিক প্রচেষ্টা মানবসত্ত্বার এক অলঙ্ঘনীয় আবেদন এবং এই আবেদনে সাড়া দিয়েই যুগে যুগে চার্বাক, কপিল, বৌদ্ধ, যাজ্ঞবাল্ক্য, শঙ্কর, এপিকিউরাস, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, আল্লাফ আবুল হুজায়ল আল-আল্লাফ, নজ্জাম, জাহিজ, মুআম্মর, আবু হাসিম, হেগেল, স্পিনোজো, কান্ট, টমাস হাক্সলি, কার্ল মার্কস, রাসেল, আরজ আলী মাতুব্বর প্রমুখ ভাবুক-চিন্তাবিদ-দার্শনিক নির্মাণ করেছেন দর্শনের আঁকাবাঁকা ইতিহাস; এবং এই ইতিহাসের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় রচিত হয়েছে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির সুদীর্ঘ বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য।

আমাদের মানবসভ্যতার মতোই দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস সুপ্রাচীন। কিন্তু এর কোন সরল সোজা সংজ্ঞা নেই। তবে স্বরূপ লক্ষণ বা সংজ্ঞা নির্ণয় সরাসরি সম্ভব না হলেও দর্শনের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিদগ্ধ পণ্ডিতজনেরা মোটামুটি একমত। ইংরেজি 'Philosophy' এবং `Philosopher' শব্দ দু'টি গ্রিক শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। গ্রিক শব্দ `Philos' এর অর্থ হলো অনুরাগ (Loving) এবং `Sophia' শব্দটির অর্থ হলো জ্ঞান (Knowledge) । সুতরাং 'Philosophy' শব্দের ধাতুগত অর্থ হল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বা সত্যের প্রতি অনুরাগ। কাজেই `Philosopher' বলতে আমরা বুঝি সেই ব্যক্তিকে যিনি জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী বা সত্যের প্রতি অনুরাগী। পাশ্চাত্য দেশে যাকে 'Philosophy' বলা হয়, তাকেই আমরা 'দর্শন' নামে অভিহিত করি। 'দর্শন' শব্দটির উৎপত্তি 'দৃশ' ধাতু থেকে। দৃশ মানে দেখা। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'দর্শন' বলতে 'কোন কিছুকে চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করাকে বুঝায়। এজন্যই Oxford Dictionary- তে 'Philosophy' শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছে এভাবে "Use of reason and argument in seeking truth and knowledge of reality, esp. knowledge of the causes and nature of the things and of the principles governing existence" দর্শনের এরূপ সজ্ঞা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, দর্শন হচ্ছে–'যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কোনো বিষয় সম্পর্কে মুক্তচিন্তার মাধ্যমে জ্ঞান অন্বেষণ।' তাহলে বোঝা যায় যে, কোন ধরনের আপ্তবাক্যে বিশ্বাস সংশয়হীন মনোভাব থেকে চিরাচরিত প্রথার প্রতি অন্ধ-আনুগত্যশীল জ্ঞান কখনো দর্শন হতে পারেনা। কিন্তু তারপরও নানা সময়ে নানা পবিত্র (!) কেতাব দ্বারা আশ্রিত বক্তব্য নানা জ্ঞানীগুণীর কাছে দর্শন হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। সেগুলো আসলেই কি কোন দর্শন, এটি প্রশ্নসাপেক্ষ। এর উত্তরে বলতে হয়, মানুষের চিন্তা, চেতনা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, শ্রম ইত্যাদি মানব ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দর্শন বিকাশে মুখ্যভূমিকা পালন করে থাকে।

মুসলিম দর্শন ও ইসলামি দর্শন :

'ইসলাম' শব্দের উৎপত্তি আরবি 'সালম' ধাতু থেকে। সালম মানে শান্তি, উৎসর্গ, আত্মসমর্পণ। এ আত্মসমর্পণ জগতের স্রষ্টা নিয়ন্তা মহান আল্লাহর ইচ্ছা, আদর্শের কাছে; কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে নয়। ইসলামি মতে, পরম স্রষ্টা আল্লাহর কাছে তাঁরই সৃষ্ট মানুষের নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া এবং সমগ্র সৃষ্টির ব্যাপক কল্যাণের লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করা প্রতিটি মুসলমানেরই লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। ইসলাম অনুসারে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং মানবজীবন যা কিছু আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এসব আদর্শ অনুসারে এবং এগুলো রূপায়নের প্রচেষ্টার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের দিয়েছেন পবিত্র কোরআন শরিফ। এছাড়া আমাদের জন্য রয়েছে মহানবি হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর জীবনাচরণ (হাদিস)। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (Complete Code of Life) ।

তাহলে ইসলামি দর্শন বলতে আমরা বুঝি, পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সকল দার্শনিক ধারণাবলি। যে কোনো মুসলমানের চিন্তা-ধ্যান-ধারণা দৃষ্টিভঙ্গি নয়। আবার 'মুসলিম দর্শন' কথাটির অর্থ একটু ব্যাপক। এটি এদিকে যেমন পবিত্র কোরআন ও

হাদিসে বিস্তৃত দর্শনকে বোঝায়, তেমনি আবার ইসলামি চিন্তার বিকাশে নানা পর্বের নানা সম্প্রদায় ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও চেতনাকে নির্দেশ করে। যেমন মুতাজিলাবাদ।

মুতাজিলাবাদ :

হযরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ইসলাম ধর্ম ও রাজ্যসীমা আরবের বাইরে বিস্তৃত হয়েছে এবং পরবর্তী দুশতাব্দীর মধ্যে মিশর, সিরিয়া, ইরাক (বাগদাদ), উত্তর আফ্রিকা, মরক্কো এবং স্পেন ইসলামি রাজ্যের আওতাভূক্ত হয়। এসব নতুন অনারব রাজ্যের অমুসলিম (ইহুদি ও খ্রিস্টান) ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে তারাও 'কেতাবিমানুষ' হিসেবে পরিচিত হয়। বিজিত রাজ্যের মধ্যে মিশর ও সিরিয়া এই দুটি রাজ্যই ছিল গ্রিক-অধ্যুষিত এবং গ্রিক দর্শন প্রভাবান্বিত। যার ফলে আরবরা গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটলের বই অনুবাদ শুরু করেন। মূলত গ্রিক দর্শনের বইগুলো অনুবাদ শুরু করেন পারস্যদেশীয় দার্শনিক ইবনে মোকাফা। ড. রিচার্ড ওয়াল জেবের এর মতে, 'আরব দার্শনিকরা সেইসব গ্রিক দার্শনিকের রচনা অনুবাদ করে গেছেন–যাঁরা গ্রিক স্কুলগুলোর শেষ দিকের দার্শনিক ছিলেন।"

এভাবেই একের পর এক প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, প্রতীচ্যের রাজ্য জয়ের ফলে বিশ্বদর্শনের ধারা এবং গ্রহ-নক্ষত্রের ব্যাপারে গ্রিকদর্শন, আরব-দার্শনিকদের যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে। তাঁদের মাঝে প্রাচ্যের খ্রিস্টান মতবাদ, পারস্যের জোরোস্টারের মতবাদ–শিক্ষা, গ্রিক দর্শন এবং নব্যপ্লাটোনিক মতবাদের অংশ দিয়ে পুষ্ট। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী–'আল্লাহতায়ালা প্রথমেই যুক্তি ও মতবাদের জন্ম দিয়েছেন।' কিন্তু এই 'যুক্তি ও মতবাদ তথা মুক্তিকে' নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ দেখা দেয়। তৎকালীন যুক্তি ও মুক্তচিন্তার বিপক্ষে প্রায় সবাই অবস্থান নেয়। যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা দেয়। যাঁরা তৎকালীন সময়ে এই 'যুক্তি ও মুক্তির' মাঝে জগৎ-সংসার, ধর্ম-সমাজ, মূল্যবোধ তথা গোটা জীবনটাকেই ভেবেছেন, দেখেছেন পরবর্তী সময়ে তারাই ইসলামি দর্শন জগতে দার্শনিক হিসেবে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁরা মুক্ত চিন্তক যুক্তিবাদী প্রগতিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে অভিহিত হয়েছিলেন। যারা পরবর্তীতে 'মুতাজিলা' হিসেবে আবির্ভূত হোন।

'মুতাজিলা' আরবি 'ইতিজাল' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। মওলানা মাসউদি বলেন–'যারা ইতিজালের মতবাদ মেনে চলে তারাই মুতাজিলা'। 'মানজিলাতুন বাইনালমান জিলাতায়ন' অর্থাৎ যারা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী এক তৃতীয় অবস্থার নীতি স্বীকার করে, তাঁরাই মুতাজিলা। 'মুতাজিলা' ধারণার উৎপত্তি কিন্তু ওয়াসিল আতার (হিজরি দ্বিতীয় শতকে) সময়ে হয়নি; এর উৎপত্তি শিয়া এবং খারিজি আন্দোলনের অনুরূপ পরিবেশে ও অবস্থায় উদ্ভব হয়েছিল বলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক প্রমাণিত সত্য যে, আলীর খিলাফত লাভের পর যাঁরা তাঁর আনুগত্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মত হন এবং অস্বীকার করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন–তালহা, যুবাইর, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, মুহাম্মদ ইবনে মাসালামা, ইসামা ইবনে যায়েদ, সুহাব ইবনে সিনান ও খালেদ ইবনে সাবিত (তাবারী)। এঁদের মধ্যে প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হন তালহা আর যুবাইর। আর অধিকাংশ নিরপেক্ষ রয়ে যান। বসরাতে আহনাফ ইবনে কায়েস ও সাবরা ইবনে শায়মান এই কোন্দল থেকে দূরে সরে থাকেন। এঁদের দূরে সরে থাকার প্রসঙ্গে 'ইতাজালা' শব্দটি ক্রিয়া পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আলী ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে বিবাদে নিরপেক্ষ থাকার অর্থে 'ইতাজিলা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মূলত 'ইতাজালা' রাজনৈতিক শব্দ। আলী খলিফা হলে একটা দল সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, মোহাম্মদ ইবনে মাসালামা ও উসামা ইবনে জায়েদের নীতি অনুসরণ করে আলীকে খলিফা স্বীকার করলেও তাঁর নিকট থেকে দূরে সরে যাকে (ইতাজালু) এবং খলিফার পক্ষে ও বিপক্ষে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে।

সম্ভবত এদেরকেই 'মুতাজিলা' বলা হতো এবং তারাই পরবর্তী সময়ে মুতাজিলার পূর্বসূরি। পরে রাজনৈতিক মুতাজিলা থেকে ধর্মতাত্তিক মুতাজিলার উদ্ভব হয়। এটা দিবালোকের মত সত্য যে, ইতিজাল শব্দ থেকে মুতাজিলা শব্দের উদ্ভব হয়। ওয়াসিল আতা প্রথমে এ মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পরে আমর ইবনে বাহার আল জাহিজকে তাঁর শিক্ষার অনুসারী করেন।

'মুতাজিলাবাদ' মূলত ইসলামের শিয়া সম্প্রদায়রা পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। ওয়াসিল বিন আতা ও আমর বিন ওবায়েদ এ দুজন ছিলেন মুতাজিলাবাদের প্রবক্তা। এতে অবশ্য কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন। যেমন–তারা বলেন, শিয়া সম্প্রদায়ের ষষ্ঠ ইমাম জাফর আস-সাদিকের শিষ্য ও ওয়াসিল ইবনে আতা (মৃত্যু ১৩১ হি:) এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে স্বীকার করেন।

'মুতাজিলাবাদের' প্রবক্তা কে বা কারা, এই নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও এ বিষয়ে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, এঁরা বিখ্যাত জ্ঞানতাপস হাসান আল-বসরির শিষ্য। তাপস হাসান-বসরির নির্দেশেই তাঁরা বসরার প্রধান কেন্দ্রীয় মসজিদে নিয়মিত ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভাষণ দিতেন। কথিত আছে, একদিন হাসান-আল-বসরির শিষ্যদের সাথে আলোচনাকালে বলেন, যদি কেউ 'কবীরা গুনাহ' করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। গুরু হাসান-আল-বসরির এ মন্তব্য শুনে শিষ্য ওয়াসিল আতা বলেন ওঠেন–'হুজুর, আমার মতে সে ব্যক্তি কাফেরও নয়–মুসলমানও নয়'। একথা শুনে গুরু হাসান-আল-বসরি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন–'ইতাজাল আন্না'। অর্থাৎ দফা হো যাও-যার বাঙলা অর্থ দাঁড়ায়–বের হও। ঠিক তখনই ওয়াসিল ও আমর তাঁদের গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং মসজিদের অন্য এক অংশে বসে তাঁদের নিজস্ব স্বাধীন মত প্রচার শুরু করেন।

ওয়াসিল আতা, হাসান আল বসরির কথিত ঐ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন–'কোরআন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী বলে যে বর্ণনা আছে তাতে কবীরা গুনাহের পাপীকে মুমিন বা কাফের কিছুই বলা যায় না' অর্থাৎ সে মুমিনও নয় কাফিরও নয়। কিন্তু যে মুনাফেকের মুনাফেকি ধরা পড়ে না, সে লোকচক্ষে মুমিন। সুতরাং হাসান বসরি তাকে মুনাফিক বলতে পারেন না, যতক্ষণ তার মুনাফেকি ধরা না পড়ে। তাই একমাত্র পন্থা হলো ফাসিককে মাঝামাঝি অবস্থায় রাখা অর্থাৎ মানজিলাতুল বায়ানাল-মানজিলাতান।

ওয়াসিল বিন আতা ও আমর বিন ওবায়েদ 'কদর ও আদল'–বিষয়ক মত ছাড়াও কিছু নতুন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূক্ষ-বিশ্লেষণ করেন। তাতে এ সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শেষ পর্যন্ত মুতাজিলারা রাজকীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। খলিফা ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালিদ মুতাজিলা মত প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়াদের পতনের পর মুতাজিলারা আব্বাসীয়দের কাছ থেকে উদার সমর্থন লাভ করেন। দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা মনসুর ছিলেন আমর বিন ওবায়েদের বন্ধু। পরে মুতাজিলারা খলিফা মামুনের কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন লাভ করেন। মুতাজিলা মতবাদে যে মৌলিক বৈশিষ্ট্য তা হলো মুতাজিলরা দার্শনিক, মুক্তচিন্তা, প্রগতিবাদী, যুক্তিবাদী, বুদ্ধিপন্থী ও উদারনৈতিক বলে পরিচিতি লাভ করেন। মুতাজিলীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন –

ক. আবুল হুজায়ল মুহাম্মদ ইবনুল হুজায়ল আল-আল্লাফ (মৃত্যু ৮৪০) :

আবুল হুজায়ল আল-আল্লাফ মুতাজিলাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। সম্ভবত তিনি শঙ্করাচার্যের সমসাময়িক। শঙ্করের মতো আল্লাফও একজন শক্তিশালী তার্কিক ছিলেন। আল্লাহর অদ্বৈতকে নির্গুণ সিদ্ধ করতে তিনি যে যুক্তি দেখান, তা শঙ্করের 'নির্বিশেষ চিন্মাত্র' তত্ত্বের সাথে মিলে যায়। আল্লাহর মধ্যে কোনো গুণ (বিশেষণ) থাকতে পারে না; কেননা গুণ দুই ভাবে থাকতে পারে, হয় তিনি গুণী থেকে বিচ্ছিন্ন, নয়তো গুণীস্বরূপ। গুণীবিচ্ছিন্ন মানলে তিনি অদ্বৈত নন, আবার অদ্বৈত নির্গুণ আল্লাহ তথা গুণ-স্বরূপ আল্লাহর মধ্যে শব্দেরই ব্যবধান হবে। হুজায়ল আল-আল্লাফ মানুষের কর্মকে দুই প্রকার বলে মনে করেছেন–এক. প্রাকৃতিক কর্ম অর্থাৎ কায়িক বা ইন্দ্রিয়গত, দ্বিতীয়ত. আচার (পাপ-পূণ্য) সম্মন্ধী বা হার্দ্যিক কর্ম। যে কর্ম আমরা বিনা বাধায় সম্পন্ন করতে পারি তাই-ই আচার-সম্মন্ধী কর্ম মানুষের অর্জিত সম্পদ, তার যত্নের ফল। আল্লাহ ও কোরআনের বাণী এবং কিছু নৈসর্গিক (প্রকৃতি) প্রকাশ থেকে মানুষ জ্ঞানার্জন করে। কোরআনিক বাণীকে জানার আগেও কখনো কখনো প্রাকৃতিক চেতনা দ্বারা মানুষ কর্তব্যজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে, যা পরে আল্লাহর-সম্মন্ধী জ্ঞান দান করে; ভালো-মন্দ জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি থেকে জন্মে ও সৎ, নিষ্কাম জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।

খ. নজ্জাম (মৃত্যু ৮৪৫) :

নজ্জাম সম্ভবত আল্লাফের সহচর ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে নাস্তিক, আবার কেউ কেউ উন্মাদ বলে ধারণা করতেন। নজ্জামের মতে, আল্লাহর মন্দ কর্ম করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আল্লাহ তাঁর জ্ঞানানুযায়ী যে কাজ তাঁর ধার্মিক বান্দাদের জন্য ভালো বলে মনে করেন তাই শুধু করতে পারেন। বস্তুত যেটুকু তিনি করেন সেটুকুই মাত্র তাঁর সর্বশক্তিমত্তার সীমা। যার কোনো বস্তুর প্রয়োজন থাকে তারই ইচ্ছা থাকে, অতএব ইচ্ছাশক্তি আল্লাহর গুণ হতে পারে না। আল্লাহ একবারই সৃষ্টি করেন; প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে তিনি সেই শক্তি নিহিত করেন যার দ্বারা ভবিষ্যতেও তাঁর নির্মাণক্রম কার্যকরী থাকবে। নজ্জাফের কথা হলো : সকল সম্প্রদায়েরই কিছু ভূল ধারণা থাকতে পারে, যেমন মুসলমানদের একটা ধারণা হলো অন্যান্য নবি অপেক্ষা মুহাম্মদের আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল, তা হলো তিনি আল্লাহকর্তৃক প্রেরিত; কিন্তু এখানে তো এটাই ভুল যে মাত্র একজনকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন; নবি শব্দটির অর্থানুযায়ী তো সকল নবিকেই আল্লাহ প্রেরিত বলে ধরে নিতে হবে।

গ. আমর ইবনে বাহার আল জাহিজ (মৃত্যু ৮৬৯) :

জাহিজ হলেন নজ্জামের শিষ্য। তিনি নামকরা লেখক এবং গম্ভীরচেতা দার্শনিক ছিলেন। তিনি মনে করতেন সত্য নির্ণয়ের জন্য ধর্ম এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সমন্বয় সাধন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যেই প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করে, আর সেই কাজের মধ্যেই আল্লাহর প্রকাশ। মানববুদ্ধিই জ্ঞানের স্রষ্টা।

ঘ. মুআম্মর :

আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দের মুতাজিলা দার্শনিক। মুআম্মর তাঁর পূর্বসূরিগণ অপেক্ষাও অধিক 'নির্গুণবাদী'। আল্লাহ সর্বপ্রকার দ্বৈত থেকে সর্বদাই মুক্ত অতএব তাঁর মধ্যে কোনো গুণ-বিশেষণের সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ নিজেকে বা অন্য কোনো বস্তু বা গুণকে জানেন না, কারণ জ্ঞান স্বীকার করার পর জ্ঞাতা জ্ঞেয় ইত্যাদি নানা অসংখ্য দ্বৈত এসে হাজির হবে। মুআম্মরের মতে, গতি-স্থিতি সাম্য-অসাম্য সমস্তই কাল্পনিক ধারণা, এদের কোনো বাস্তবিক সত্য নেই। মানুষের ইচ্ছা বন্ধনহীন। ইচ্ছাই মানুষের একমাত্র ক্রিয়া। বাকি ক্রিয়াসমূহ কেবল শারীর-সম্বন্ধী।

ঙ. আবু হাসিম বসরি(৯৩৩ খৃস্টাব্দ) :

তাঁর মতে, আল্লাহর গুণ, ঘটনাবলি, জাতি (সামান্য) জ্ঞান-যুক্তি কিছু স্থিতি সত্তা ও অ-সত্তার মধ্যে অবস্থান করে। সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সন্দেহের উদ্ভব হওয়া প্রয়োজন।

উপরিল্লিখিত আলোচনায় দেখা যায় যে, মুতাজিলা প্রবক্তাদের মতবাদ প্রধানত নিম্নলিখিত তত্ত্ব ও তত্ত্বগুলোর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সেগুলো হলো :

১. আল্লাহর একত্ব;
২. আল্লাহর গুণাবলি (সিফাত);
৩. আল্লাহর দর্শন লাভ (দিদার);
৪. আল্লাহর কার্যকলাপ;
৫. ভাল-মন্দ বা সৎ-অসৎ;
৬. কোরআন চিরন্তন কিংবা সৃষ্ট;
৭. মানুষের চিন্তা ও কর্মে স্বাধীনতা; এবং
৮. বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য।

কোরআনে আল্লাহকে জ্ঞাতা (আলেম), শক্তিমান (কাদের), প্রাণবান (হাই) প্রভৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে সরল বিশ্বাসে মেনে নেয়া হয় যে, আল্লাহ জ্ঞান, প্রাণ প্রভৃতি গুণের অধিকারী। কিন্তু মুতাজিলারা এ প্রচলিত মতের বিরোধী। তাঁদের মতে আল্লাহর কোনো বিশেষ গুণের অধিকারী হতে পারেন না। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। সুতরাং তাঁকে বহুগুণের অধিকারী বলে মনে করার অর্থই হবে তাঁর সত্তার বহুত্ব আরোপ করা। তাঁরা আরো বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ কারোর দ্বারা সৃষ্টি নন এবং তাঁর কোনো অংশিদার নেই। কিন্তু তাদের মতে আল্লাহ্ নিরাকার এবং স্বীয় সত্তার (Essence) অধিকারী। আল্লাহর কোনো গুণাবলির প্রতি তাঁরা কোন আস্থা রাখেননি, কারণ তাঁরা মনে করে যে, ঐ গুণাবলি আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্বকে ব্যাহত করবে। তাঁরা বলেন যে, আল্লাহকে উপলব্ধির জন্যই গুণাবলি ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর নিরঙ্কুশ একত্ব প্রমাণ করার জন্য তাদের আহল-উল-তাওহিদ (Partisans of Unity- একত্ববাদী) বলে অভিহিত করা হয়।

রক্ষণশীল মুসলিমদের মতে কোরআনে বর্ণিত আয়াতভিত্তিক ধার্মিক ব্যক্তিগণ পরকালে আল্লাহর দর্শন লাভ (Beatific Vision) করবেন। এর বিরোধিতা করে মুতাজিলারা বলে যে, যেহেতু আল্লাহ্ নিরাকার, কায়াহীন, তাই পরকালে পার্থিব চক্ষু দ্বারা আল্লাহর দর্শন লাভ অসম্ভব। আল্লাহকে পার্থিব রূপদান অধর্ম। সুতরাং চর্ম ও বাস্তব চোখে আল্লাহর দর্শন সম্ভব নয়। তবে রোজ কিয়ামতে ধার্মিক ব্যক্তিগণ সূক্ষ্ম আত্মিক অনুভূতির দ্বারা আল্লাহর দর্শন পেতে পারে।

কোরআনের প্রাথমিক সমালোচক হলো মুতাজিলারা, যাদের ইসলামের মুক্তচিন্তক ও যুক্তিবাদী দল বলা হয়। মুতাজিলারা গ্রিক ও আলেক্সান্দ্রিয়ান লেখকদের লেখার সাথে পরিচিত হওয়ায় তাদের জ্ঞান বিদ্যার সাথে পরিচয় হয়। তাই এরা অনেক গ্রিক ধারণা ন্যায়বাদ ও সন্দেহবাদসহ ইসলামি দর্শন ও ধর্মীয় আলোচনায় প্রয়োগ ও আমদানি করেছিলেন।

কোরআন যে অনন্ত ও অসৃষ্ট, এই গোঁড়াবাদী মতবাদকে মুতাজিলারা মনে করেন যে এ ধারণা পোষণ করলে কোরআনকে আল্লাহর সমকালীন (Coeval) বলা হয় যা অবাস্তব। এ ধারণা তাদের মতে, দ্বিত্ববাদের ধারণা যা আল্লাহর একত্বের বিরুদ্ধে এবং শিরক, অংশিদারিত্ব। কারণ কোরআনকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সমতুল্য ও অনন্ত করা হচ্ছে।

মুতাজিলারা আরো মতপোষণ করেন যে, কোরআনের বাণীর হাজার হাজার খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত মূল কপি, হাফসার কপিসহ যা সংকলকদের হেফাজতে ছিল সেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। এখন দাবি করা হয় যে এটি অনন্তকাল থেকে ছিল একরূপে এবং অপরিবর্তিত রূপে। কোরআনের স্টাইল ও রচনা দেখে বোঝা যায় এটা আহামরিও নয়, অলৌকিক গ্রন্থও নয়। কোরআন খাঁটি আরবি ভাষায় লিখিত নয়, এর মধ্যে বহু বিদেশী শব্দ আছে। কোরআন মূলত মোহাম্মদ রচিত গদ্য-কাব্য, অন্য কিছু নয়। কোরআন সম্বন্ধে তাঁরা আরোও বলেন যে, এই গ্রন্থ অনিত্য জয়, সৃষ্ট ও উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান (মৃ. ৭৪৯)-এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং আব্বাসি খলিফাদের সরকারি সমর্থন পেয়েছে। আব্বাসী খলিফা মামুন (মৃ. ৮৩৩) ধর্মীয় আদালত গঠন করে এর প্রচলনও করেছেন।

যুক্তিবাদী ও মুক্ত চিন্তার অধিকারী মুতাজিলারা, কোরআন যে অলৌকিক গ্রন্থ, গোঁড়াবাদীদের এই মন্তব্যকে মোকাবেলা করার জন্য প্রাচীন আরবি কবি ও জ্ঞানীব্যক্তিদের রচনা জনগণের মধ্যে বিতরণ করেছিল এবং দেখাতে চেয়েছিল যে এই প্রাচীন কবিদের রচনা স্টাইল এবং নৈতিক শিক্ষায় কোরআনের চেয়ে অনেক উন্নত। মুতাজিলা লেখক এবং আরবি গদ্যের একজন বিশেষজ্ঞ আমর ইবন বাহার (মৃ. ৮৬৯) আল জাহিজ নামে খ্যাত-বলেছিলেন যে, কোরআন রচনায় ও ভাষায় একটি ভালো গ্রন্থ বটে, তবে পরিপূর্ণ আরবি ভাষায় নয় (Not in perfection of Arabic)। দেখা যায় যে, মুতাজিলা সম্প্রদায় বিশ্বাস করে রক্ষণশীল মতবাদ অনুযায়ী কোরআন চিরন্তন হতে পারে না। কারণ একটা বিশেষ স্থান ও কালে তার সৃষ্টি হয়েছিল।

রক্ষণশীল ইসলামি মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবী আল্লাহর দ্বারা সৃষ্ট এবং ছয় দিনে সাত স্তরে এই পৃথিবী সৃষ্টি। অপরদিকে গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের মতে পৃথিবী চিরন্তন। মুতাজিলারা দাবি করে পৃথিবী সৃষ্ট ও চিরন্তন। এরা বলে, পৃথিবী প্রাথমিক অবস্থায় নিস্তব্ধ ও নিশ্চল ছিল এবং তা চিরন্তনতার সপক্ষে বলা যায়। কিন্তু আল্লাহ্ এতে দেহ, প্রাণ ও গতি সঞ্চার করেছেন। তাদের এই মতবাদ মধ্যপন্থীদের মতবাদ। প্রাথমিক অবস্থায় মুতাজিলা তত্ত্ব ও তথ্যগুলো গ্রিক ভাবধারার প্রভাবে উদ্ভুত না হলেও পরবর্তী যুগে মুতাজিলা মতবাদের বিকাশে এরিস্টটল ও প্লেটোর চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন হয়েছিল, এ কথা অনস্বীকার্য। ও লিয়ারী যথার্থ বলেছেন যে, গ্রিক প্রভাব সিরীয় খ্রিস্টানদের মাধ্যমে ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে। (Arabic Thought and its place in History)।

মুতাজিলাদের তত্ত্বের প্রধান উৎস ছিল গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটলের দর্শন, চিন্তাচেতনা, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য তথা কোরাআনের

বহু আয়াত, যেমন এতে (কোরআন শরিফে) সেই সমস্ত লোকের জন্য ইঙ্গিত রয়েছে যারা উপলব্ধি করে, যুক্তি-তর্ক দ্বারা বিবেচনা করে শ্রবণ করে এবং গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকে। তাই এদের আহল আল কালাম অথবা যুক্তিবাদী গোষ্ঠী বলা হয়। তৎকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মুতাজিলারা ইসলামি দর্শন, মুক্তচিন্তা, প্রগতিবাদী-যুক্তিবাদী তথা বুদ্ধিবাদী হিসেবে ইসলামি রেনেসাঁর ধারক হিসেবে পরিচিত। মুতাজিলারা আজও তৎকাল এবং স্ব-কালের জন্য বিস্ময়।

তথ্যসূত্র :

১. বার্ট্রান্ড রাসেল - পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)।
বেঞ্জামিন ওয়াকার - ফাউন্ডেশন অব ইসলাম (অনুবাদ : সা'দ উল্লাহ) ।
সা'দ উল্লাহ্ - ইসলামী দর্শন ও দার্শনিক।
সা'দ উল্লাহ্ - ইসলামের ভিন্নমত ও ক্ষমতার লড়াই।
সা'দ উল্লাহ্ - ইসলামে ধর্মীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠি।
ড. আমিনুল ইসলাম - ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম দর্শন।
রাহুল সংকৃত্যায়ন - দর্শন দিগদর্শন।

কালের আয়নায় নারীমুক্তির হালচাল

এম এ আলিম

সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে ছয় শত কোটির মত মানুষ রয়েছে। পৃথিবীর এই বিপুল জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশই নারী। নারী সম্ভবত মহাজগতের সবচেয়ে আলোচিত। প্রাচীনকালে নারী ও পুরুষ নিজেদের লজ্জা-সম্ভ্রম নিয়ে তেমন একটা ভাবত না। ভাবত না তাদের জীবিকা নিয়েও। নারী ও পুরুষরা তখন দলবদ্ধ হয়েই জীবিকা নির্বাহের জন্য ফলমূল সংগ্রহ ও বিভিন্ন প্রকার পশু-পাখি শিকার করত। বিশেষ বিশেষ রীতি-নীতির উদ্ভব না হওয়ার কারণে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ছিল অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। অর্থাৎ নারী-পুরুষের মাঝে তখন ছিল অবাধ যৌনাচার।

যৌনমিলনে নারীরা গর্ভবর্তী হত। বরের সূত্রে তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করত। কখনো বা পাহাড়-পর্বত পাড়ি দিয়ে তাদের সম্মুখে চরতে হত। আর তখনই ঘটত গর্ভবতী নারীদের জন্য বিপদ। কেননা, গর্ভবতী নারীদের উচুঁ ভূমিতে আরোহণ কিংবা চলাচল ছিল খুবই কষ্টসাধ্য এবং পশ্চাদগামী। গর্ভবতী নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রেও ছিল অপারগ। কাজেই সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে সম্মুখে চলতে না পারার কারণে ক্রমে ক্রমে গৃহই হয়ে ওঠে তাদের প্রধান আশ্রয়স্থল।

মধ্যযুগে সমস্ত পৃথিবীব্যাপীই যখন ধর্মীয় প্রভাবের ব্যাপক ছড়াছড়ি, তখন নারীরা বহিরাঙ্গন থেকে আরো গুটিয়ে যেতে থাকে। বিশেষ করে মুসলিম নারীরা। পুরুষ নারীকে সাজিয়েছে অসংখ্য অভিধায়। যে অভিধাসমূহের কোনো কোনোটি এমন কুৎসিত যে, বলা বাহুল্য। সমাজব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পর থেকেই ক্রমে ক্রমে পুরুষ সমাজ চালানোর পুরো দায়িত্বভার গ্রহণ করে, আর নারীদের গৃহবন্দী করার জন্য তৈরি করতে থাকে বিভিন্ন সামাজিক শৃঙ্খল। পুরুষ নারীকে বন্দী করার জন্য তৈরি করেছে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র। সৃষ্টির পর থেকে পুরুষরা নারী সম্পর্কে যে সব শ্লোক-বিধি-বিধান তৈরি করেছে তার প্রায় সবটাই সন্দেহজনক ও আপত্তিকর। নারী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পুরুষের সাজানো বিধিবিধানে ক্রমে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে। পুরুষ নারীকে শেখায় তাকে শ্রদ্ধা বা সম্মান করতে, পাশাপাশি ভয়ও করতে। কাজেই শৃঙ্খলিত নারীর অন্তরও পুরুষের প্রতি থাকে ভীত সন্ত্রস্ত, কারণ পুরুষ নারীকে দাসী করে রেখেছে। ঘটনার ঘনঘটায় পড়ে কিংবা স্বীয় স্বার্থে ও অপ্রত্যাশিত ভয়ে পুরুষ কখনো কখনো নারীর জয়গান করে মহীয়সী রূপে কিংবা দেবী রূপে। সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময় ধরে পুরুষ শুধু তার জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করার জন্যই নারীকে প্রয়োজন এবং খানিক মূল্যবানও মনে করে আসছে। যৌনাচার সম্পন্ন করার মুহূর্তগুলিতে পুরুষরা নারীকে অভিহিত করতে থাকে বিভিন্ন মন ভোলানো নিছক অভিধায়। নারী তাতে বিগলিত হয়; কিন্তু স্বীয় অজ্ঞতায় ভূলে যায় পুরুষের এই সাজানো প্রতারণার কথা। সুদীর্ঘ সময় ধরে পুরুষরা নারীকে অবদমিত করতে করতে এতটাই করেছে যে, নারী এখন পুরুষের কোনো খারাপ কাজেরও বিরুদ্ধাচরণ করতে ভয় পায়। নারীর যে নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে, তারও যে নিজস্ব চিন্তা চেতনা, মূল্যবোধ রয়েছে তা সে বেমালুম ভুলে যায়। প্রকৃত পক্ষে তারা, ভুলে যায় না, তাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়।

নারীর বিবেকবোধ সুপ্ত; সে নিজেও যে পুরুষের ন্যায় স্বতন্ত্র সত্তা, তার চিন্তা চেতনা কর্মও যে মূল্যবান কিছু হতে পারে, সভ্যতার অগ্রগতিতে সেও যে মূল্যবান কোন অবদান রাখতে পারে–এমন প্রশ্ন হয়ত কোন কোন নারীর মনে কখনো কখনো জাগে, কিন্তু তা স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে না। কেননা, সমাজ কাঠামোকে পিতৃতন্ত্র এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে যে, একা বা স্বল্পাংশের ক্ষুদ্র চিন্তনে তার মুক্তি সম্ভব নয়।

বর্তমান সভ্যতা হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতা বা পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা। পুরুষতন্ত্রের সৌরলোকের সূর্য পুরুষ আর নারী হচ্ছে অন্ধকার। পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতায় পুরুষ মুখ্য, নারী গৌণ। পুরুষ প্রভু, নারী দাসী; পুরুষ শরীর, নারী ছায়া; পুরুষ ব্রাহ্মণ, নারী শূদ্রী পুরুষ বিকশিত, নারী অবিকশিত। পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় পুরুষ নিয়ন্ত্রক আর নারী নিয়ন্ত্রিত; পুরুষ শোষক; নারী শোষিত পুরুষ সভ্যতার শীর্ষে আরোহণ করে ক্রমে ধারাবাহিকভাবে জয়গান করে চলেছে নিজেদের। পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় পুরুষের যত জয়গান করা হয় ততই করা হয় নারীর জন্য নিন্দা। নারী অক্ষম, অথর্ব, পরনির্ভরশীল ইত্যাদি।

নারীর প্রারম্ভিক রূপ হচ্ছে শিশু। কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে। (নারী, হুমায়ুন আজাদ, পৃষ্টা ১৯) একটি মেয়ে শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর যেদিকে তাকায় সেদিকেই দেখে পুরুষের আধিপত্য। গোটা পৃথিবীটাই যেন পুরুষের। পিতৃতন্ত্রের পরিবার শেখায় পুরুষ প্রধান, সমাজ শেখায় পুরুষ প্রধান, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, প্রচার মাধ্যম, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শেখায় পুরুষ প্রধান অবস্থা দেখে মনে হবে যেন সমাজ রাষ্ট্রের প্রতিটি সংস্থা পুরুষের প্রাধান্য প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের সংস্থা। সতীত্ব নারীকে পুরুষের দেওয়া একটি উপাধি। শরৎচন্দ্র, অনিলা দেবীর ছদ্মনামে বলেন, "...সতীত্বের বাড়া নারীর আর গুণ নাই। সব দেশের পুরুষই একথা বোঝে, এটা পুরুষের কাছে সবচেয়ে উপাদেয় সামগ্রী। ... এই সতীত্ব যে নারীর কতবড় ধর্ম হওয়া উচিত, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে সে কথার পুনঃপুনঃ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ...এখানে স্বয়ং ভগবান ইন্দ্র পর্যন্ত সতীত্বের দাপটে কতবার অস্থির হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমস্য তর্কই একতরফা একা নারীর জন্য।"

পুরুষ এখনো নারীকে দেখে ভোগ্যপণ্য রূপে। গুন্টার গ্রাসের বিখ্যাত একটি কবিতায় আমরা তারই চিত্র স্পষ্ট দেখতে পাই :

পুরুষ চুষতে দেয়না
বড় ওলান ঝুলিয়ে গাভী যখন

বাড়ীর পথে রাস্তা পেরোয়, যানবাহন থামিয়ে দিয়ে
পুরুষরা আড় চোখে তাকায়
পুরুষ কেবল তৃতীয় স্তনের স্বপ্ন দেখে
পুরুষ দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে ইর্ষা করে ...
(গুন্টার গ্রাস সংকলন, পৃষ্টা ১৯)

উপনিষদের ঋষি স্ত্রী সম্পর্কে মনু ও তাহার পোষাক সামন্ত সমাজ হতে বহু স্পষ্ট উক্তি করেছেন। ঋষির বক্তব্য ছিল স্ত্রীর নিজের রুচির জন্য স্ত্রী প্রিয় হয় না, পুরুষের রুচি বিধানের জন্যই স্ত্রী প্রিয় হয়।' (নবৈ ভার্যায়া : কামায় ভার্ষা প্রিয়া ভবতি। আত্মানন্ত কামায় ভার্ষা প্রিয়া ভবতি ॥ (মানব সমাজ, ১৪২) নারীদের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। তারা পরাধীন। এ বিষয়ে একটি নীতি বাক্য করতে পারি–কুমারী কালে তাহার রক্ষক পিতা যৌবনকালে পতি এবং বার্ধক্যেও রক্ষক হবে পুত্র; স্ত্রীর কখনো স্বতন্ত্রতা থাকা উচিত নয়।'

[পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। পুত্র রক্ষতি বার্ধক্যে ন স্ত্রি স্বাতন্ত্র্যমহতি ॥ মনুসংহিতায় বিধবা বিবাহ নিয়েও রয়েছে পিতৃতন্ত্রের এক স্বেচ্ছা লোলুপ ইতিহাস। সামন্ত যুগে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ন হবার ফলেই বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। পরে হিন্দুরা ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে এটাকে প্রচণ্ড ধার্মিক নিষেধ হিসেবে খাড়া করে। এখানে মনে রাখতে হয় যে, এই আমৃত্যু বৈধ স্ত্রীর কোন স্বেচ্ছা প্রণোদিত নিয়ম নয়; কারণ সামন্ত যুগে ধর্ম না হোক, সমাজ সর্বদাই বিধবা বিবাহের বিরোধী ছিল। শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয় ভারতবর্ষের উচ্চকুলে মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহ এখন পর্যন্ত বর্জিত আছে। ক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করে পুরুষ নীতি ভেঙেছে এবং নারীদের কুক্ষিগত করার জন্য সুবিধামতো নীতি তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুঘল আমলে কয়েক পুরুষ ধরিয়া রাজ কুমারীদের অবিবাহিত থাকার রীতি ও চলিত ছিল; জানা যায় ঔরঙ্গজেব সম্রাট হইবার পর এই রূঢ় প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। (রাহুল সাংকৃত্যায়ন, মানব সমাজ; পৃ. ১৪৩)

এর পর পিতৃতন্ত্রের প্রবহমান নৈতিকতায় ক্ষমতার দৌরাত্ম ক্রমশই এগিয়ে চলে; যেথা নারী পুতুলেরই অনুরূপ। "স্ত্রীর অবস্থা সমাজে ক্রমেই খারাপ হইয়াছে, ক্রমেই তাহার মৌলিক অধিকারগুলি লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং শেষে স্ত্রী বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করিতে সাহস পায় না; কেবল গোপনে বিষয়ে গুটির মতো এই নির্মমতাকে কণ্ঠলীন করে নেয়। এর কারণ খুবই স্পষ্ট পিতৃতন্ত্রের সমাজ কাঠামো এমনভাবে তৈরি যে, স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারে সমাজের নাক কান কাটা যাবে আর পুরুষের ভ্রষ্টাচারকে সমাজ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়।

পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও নারীদের স্বাধীনতা নেই; পুরুষই নির্ধারণ করে দিয়েছে নারী কী পোষাক পরবে। দীর্ঘদিন ধরে নারীর অবদমিত হৃদয়ে পিতৃতান্ত্রিক প্রভাবে দাসীবৃত্তি মনোভাব ঠাঁই করে নিয়েছে। নারীবাদী রোকেয়া বলেছেন আমাদের মন পর্যন্ত দাস হইয়া গিয়াছে। (রোকেয়া রচনাবলী, ১৭) তিনি আরো বলেন, শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোধিক জড় (রোকেয়া রচনাবলী, ২৫); আমাদের শয়ন কক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রুপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। (রোকেয়া রচনাবলী, ২৬); বহুকাল হইতে নারী হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিস্ক, হৃদয় সবই 'দাসী' হইয়া পড়িয়াছে। (রোকেয়া রচনাবলী, ২৮)

তাই নারীর জন্য এই দাসীবৃত্তি মনোভাব পরিহার করা আবশ্যক। এ জন্য চাই স্বাতন্ত্র্যবোধ।

'স্বাতন্ত্র্য' হবে অসামান্যতার প্রতীক। তার মনোভূমি হবে সৃজনশীল-নিত্য বাসন্তী হাওয়া বইবে তাতে। ভাঙ্গনে থাকবে তার বেদনাবোধ, গড়নে জাগবে উল্লাস। (আহমদ শরীফ রচনাবলি, ১২৩)

তাই কালিক প্রহরে নারীমুক্তির জন্য প্রয়োজন স্বীয়চিত্তের জাগরণ, জীবনের জাগরণ। জীবনের যখন জাগরণ আসে, তখন মানুষ উন্মুক্ত হয়ে উঠে আত্মপ্রসারে। তখন তাজা প্রাণ ঘিরে থাকে সৃষ্টি সুখের উল্লাস... তাই প্রগতি কিংবা অগ্রগতি আসলে মনেরই চিন্তা ভাবনার ফসল। (আহমদ শরীফ রচনাবলি, ১২৩)

পুরুষের কামবৃত্তি প্রবল। অবশ্য নারীর ও যে নেই তা নয়; তবে পুরুষ শুধু নারীর যৌনকাম চরিতার্থ করার জন্যই নারীকে আবেগাকুলতায় কাছে টানে। আবেগে হয়ে পড়ে বিহ্বল, উন্মুক্ত। এ প্রসঙ্গে টোকন ঠাকুরের একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি স্মরণ যোগ্য :

'...একজন নারীর মধ্যে সমুদ্র আছে, বন্দর আছে জাহাজও আছে।
আর অসংখ্য পুরুষ জাহাজের ডকে কম বেতনের গতরখাটা
খালাসি হয়ে মাসের পর মাস সমুদ্রে বসে থাকে।
বহুদিন সে তার বাড়িতেও ফেরে না।'
(সমকাল, কালের খেয়া, ১০.১১.২০০৬)

নারীরা পুরুষের তৈরি প্রথায় এখনো বন্দী। অসুস্থ ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা যেমন অসুস্থ থাকে, তেমনি প্রথায় বা শৃঙ্খলের গণ্ডিতে বেড়ে ওঠা নারীর অন্তর ও শৃঙ্খলিত থাকে। এমতাবস্থায় থাকে তার স্বীয় অধিকার। অবশ্য, নারীরও যে স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে, তারও যে স্বীয় অধিকার প্রয়োজন, স্বাধীনতা প্রয়োজন, এমন চিন্তাও তার অবচেতনেই থেকে যায়। নারীর অধিকার নিয়ে একগোত্র পুরুষ ঊনিশ শতক থেকে লড়াই করেছেন নারীর পক্ষে। তাদের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের রয়েছে সমান অধিকার। তাছাড়া নারী ও পুরুষের উভয়ের মূল পরিচয় হচ্ছে তারা মানুষ। নারীবাদী রোকেয়ার চোখে পুরুষ শব্দটিই ছিল আপত্তিকর। তিনি পুরুষকে উপহাস করছেন, তাকে গণ্য করেছেন পশুর থেকেও নিকৃষ্টরূপ। তিনি বলেন, 'যদি স্বার্থপরতা, ধূর্ততা ও কপটাচারকে সদগুন বলা যায়, তবে অবশ্য পুরুষজাতি কুকুরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।" (রোকেয়া রচনাবলি, পৃ: ১৭০) পুরুষতন্ত্রের তৈরি এক ঐশী ভাবাদর্শ 'স্বামী' যা পুরুষকে উত্তীর্ণ করেছে নারীর বিধাতার স্তরে। 'স্বামী' তাঁর

কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর শব্দ। তিনি প্রশ্ন করেছেন, শ্রীমতিগণ জীবনে চিরসঙ্গী, শ্রীমানদিগকে 'স্বামী' ভাববেন কেন? (রোকেয়া রচনাবলি, পৃ: ৪৩) তিনি এ শব্দটি বাতিল করে প্রস্তাব করেছেন একটি নতুন শব্দ: আশা করি এখন 'স্বামী' স্থলে 'অর্ধাঙ্গী' শব্দ প্রচলিত হইবে। (রোকেয়া রচনাবলি, পৃ: ৪৪)

পূর্বেই বলেছি, পুরুষের তৈরি করা প্রথায় নারীরা এখনো বন্দী। আর সে প্রথায় নিমগ্ন হয়েই নারীরা অলঙ্কার পরে। নারীর অলঙ্কার নিয়েও রোকেয়া তীব্র পরিহাস করেছেন। তার মতে, 'আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি–এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ। এখন ইহা সৌন্দর্য বর্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয়ে বটে; কিন্তু অনেক মান্যগন্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন (Originally badges of slavery) ছিল। তাই দেখা যায়, কারাগারে বন্দীগণ পায়, লোহনির্মিত বেড়ী পরে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণ রৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ মল পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহ নির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বার্ণ বা রৌপ্য নির্মিত চুড়ি! কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ দেখি, উহাদেরই অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে। ... গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া 'নাকাদড়ী' পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী 'নোলক' পরাইয়াছেন! ঐ নোলক হইতেছে স্বামী'র অস্থিত্বের (সধবার) নিদর্শন! (রোকেয়া রচনাবলী, পৃ: ১৯-২০)

তাঁর মুখেই আমরা শুনতে পাই নারীমুক্তির এক চরমবাণী–"কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কর্মক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের জন্য বস্ত্র উপার্জন করুক।" (রোকেয়া রচনাবলি, পৃ: ৩০)। আঠার শতকের এক বিপ্লবী নারীবাদী লেখিকা মেরি তাঁর দুর্বল লিঙ্গীয় শ্রেণীর শরীর ও মনে শক্তি অর্জনের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, 'একমাত্র উপায়ে নারীরা পৃথিবীতে দাঁড়াতে পারে–বিয়ে ব'সে। এ কামনা তাদের পশুতে পরিণত করে, যখন, তাদের বিয়ে হয় তখন তারা এমন আচরণ করে যা শুধু শিশুদের কাছেই আশা করা যায়–তারা সাজগোজ করে, তারা রঙ মাখে।' (এ ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইটস অফ ও ম্যান)

শিক্ষার মাধ্যমে নারীর চিন্তা–চেতনার প্রভূত উন্নতি সম্ভব। নারীরা যেহেতু গৃহপরিবেশে পিতৃতন্ত্রের প্রবাহমান ধারায় বেড়ে ওঠে তাই তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক কিছুর জন্যই পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয়। নারীদের এই গৃহমনোভাব, পরনির্ভরশীলতার জন্য পুরো সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক কুসংস্কার ও অনগ্রসর মনোভাবই দায়ী। অশিক্ষা ও সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবেই কারণেই নারীরা আজও স্বাবলম্বী নয়। জীবন চলার পথে নারীদের মতামতের বিশেষ মূল্যায়ন করা হয় না বললেই চলে। পিতৃতন্ত্রের বিশ্বাস–তারা প্রয়োজনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যেমন–উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–'বিয়ে'। বিয়েতে সাধারণত গ্রামীণ অধিকাংশ মেয়েরই মতামতের মূল্যায়ন হয় না; শুধু গ্রাম নয় শহরেও খুব স্বল্পাংশ মেয়েরেই মতামতের মূল্যায়ন হয়, যা মোটের তুলনায় খুবই নগন্য। আজও কনে দেখার মানে তার রূপ, দেহের বাহ্যিক গঠন (দাঁত, কান, নাক, হাত, কেশ, সুগঠিত স্তন) পছন্দ করা। অনেকটা বাজারে ভাল গরু ক্রয়-বিক্রয়ের মত ঘটনা আর কি! বর্তমানে অবশ্য নারীদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে দেখা যায়, তবে তা মোটের তুলনায় খুবই অপ্রতুল নয় কি? উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পেলে তারা পরিবারে ও কর্মক্ষেত্রে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে। পারে গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিদ্ধান্ত নিতে এবং প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিতে। ইংল্যান্ডের মার্গারেট থেচার, ভারতের ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীলংকার শ্রীমাভো বন্দর নায়েক, বাংলাদেশের খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা, নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তি আন্দোলনের নেত্রী বেগম রোকেয়া এবং পাকিস্তানের আসমা জাহাঙ্গীর এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নারীদের সম্পর্কে এতকাল ধরে যে সমস্ত ভ্রান্ত ও কুসংস্কার সমাজে বদ্ধমূল হয়ে আছে তা একদিনে যেমন পরিবর্তন সম্ভব নয় তেমনি স্বল্পাংশের প্রচেষ্টায় ও তা দূরীভূত করা সম্ভব নয়। নারীর নিজের অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে নিতে হবে নিজেকেই, পুরুষ তার ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করবে না। নারীর নিরঙ্কুশ মুক্তি তখনই ঘটবে–যখন নারীর ভবিষ্যৎ মানুষ হওয়া, নারী হওয়া, নারী থাকা নয়।

হায় স্বপ্ন! হায় সভ্যতা!

লিটন দাস

দিনবদলের সাথে আমরাও প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছি। আমরা আমাদের মনুষত্বকে বিক্রি করে দিয়েছি অন্যদের হাতে। ওরা আমাদেরকে যে ভাবে ইচ্ছা সেভাবে নাচাচ্ছে। আমরা প্রতিবাদ করা ভুলে গেছি। অপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে নীরবতা ভেঙেছি আবার প্রয়োজনের সময় নীরব থেকেছি। আমরা আমাদের সভ্যতাকে ভুলে গিয়ে অন্য কোনো অসভ্যতাকে গ্রহণ করেছি। বিশিষ্ট দার্শনিক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)বলেছিলেন "ধর্ম হচ্ছে গরিবের আফিম"। আজ সেই আফিমের নেশার মধ্যে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। আমরা সেই আফিমকে আমাদের জীবনের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে রেখেছি যাতে করে আমরা অসভ্য না হয়ে যাই। আমাদের সব সময় মনের মধ্যে অর্থ্যাৎ মাথার মধ্যে একটা চিন্তা কাজ করে আসছে, যে লোকটি এই আফিম গ্রহণ করবে না সে কখনও ভাল মানুষ হবে না! সেই লোকটি হয়ে যাবে কাফির। আমাদের নিজস্ব সভ্যতাকে হারিয়ে আজ এই আফিমের অসভ্যতার বর্বরতা মনে-প্রাণে গ্রহণ করছি, অথবা করতে বাধ্য করছি। আমাদের দেশের মুক্তিযোদ্ধারা আজ দারিদ্র্যের জরাজীর্ণ পরিবেশে অসহায়ভাবে জীবন কাটাচ্ছে অথচ কেউ একটা প্রতিবাদ করে না রাজপথে নেমে। আর এদিকে আফিমসেবনকারীরা কী দাপটে গাড়ি, বাড়ি, রাজপথ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি দেশটা পর্যন্ত ওদের কালো হাতের মুঠোর ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এরপরও ওদেরকে সাপোর্ট করি। ওদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করি।

বিনোদণের মাধ্যম টিভি। টিভি চালু করলে বিজ্ঞাপনে দেখতে পাওয়া যায় অসভ্যতার নিদর্শন। কয়েকটা বিজ্ঞাপন যেমন–

"একা একা খেতে চাও, দরজা বন্ধ করে খাও!"

"একটা মেয়ে দৌঁড়ে আসছে ট্রেনে উঠার জন্য–

অথচ তার হাতটি কালো হওয়ায় তার হাতটি কেউ ধরছে না"

ফেইস পরিস্কার, তুলতুলে না হওয়ায় সে ভাল পারফরম্যান্স করতে পারছেনা।'

"একটি সিগারেট খাওয়ার জন্য একটা সুন্দরী মেয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরছে ইত্যাদি এই রকম লেখলে কয়েকশটা লেখা হয়ে যাবে। উপর্যুক্ত বিজ্ঞাপনগুলো কি সভ্যতা না অসভ্যতার চিহ্ন? মেয়েদেরকে আমরা পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছি। আমাদের ছেলেমেয়েরা এই ধরনের বিজ্ঞাপন দেখে খারাপ হবে না ভাল হবে সেটা চিন্তা না করে ব্যবসার লাভ হবে না ক্ষতি হবে সেটা চিন্তা করি। ব্যবসার লাভের জন্য মেয়েদেরকে যদি ভোগ্যপণ্য করতে হয় তবুও তারা করবে। এই ধরনের রাষ্ট্র থেকে আমাদের জানার বা শেখার কী আছে?

আমরা কি এই রকম একটা রাষ্ট্র গড়তে পারি না। যে রাষ্ট্র মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করবে। লেডিস ফার্স্ট না হয়ে সম অধিকার হবে। কেউ না খেয়ে মরবে না। সবাই রাষ্ট্রের মধ্যে মৌলিক অধিকার হিসেবে পাঁচটি বিষয় অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং শিক্ষা বিনামূল্যে পাবে। কোন প্রাইভেট হাসপাতাল থাকবে না। কোন প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে না। কোন প্রাইভেট টিউটর, কোচিং সেন্টার থাকবে না। সব রাষ্ট্র বহন করবে। যে রাষ্ট্রের ধর্ম হবে মানবিকতা, কারণ সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।

আর এই রাষ্ট্রের নাম যদি হয় বাংলাদেশ তাহলে আপনি ভাববেন এটা স্বপ্নের কথা, বাস্তবে হবে না। যদি আপনারা আমাদের পাশে থাকেন তাহলে বাংলাদেশকে আমরা এই রকম আফিমবিহীন একটি রাষ্ট্র গড়ব আর সেই দিন বেশি দূরে নয়।

ধর্মবিশ্বাসে যুক্তির সংকট

সৈকত চৌধুরী

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ ধর্মবিশ্বাসকে ধারণ করে আসছে। তবে প্রথম দিকে তা ছিল অসংগঠিত; কিছু বিচ্ছিন্ন বিষয়ে বিশ্বাস ও তার আরাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কালক্রমে ধর্ম সংগঠিত হতে শুরু করে এবং জটিল আকার ধারণ করে। আধুনিক যুগে পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম দেখা যায়। যেমন- ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, জৈন, শিখ, ইহুদি, বাহাই ইত্যাদি। আবার বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার একটা বড় অংশই ধর্মহীন।

বিশ্বাস বনাম যুক্তি

ধর্মগুলোর প্রধান শর্ত ও একমাত্র অবলম্বন 'বিশ্বাস'। ধর্মগুলোকে কখনো যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হয় না, যদিও প্রত্যেক ধর্ম নিজ নিজ ধর্মের অনুকূলে অনেক যুক্তির অবতারণা করে; তবে তা কখনও যথার্থ যুক্তি হয়ে ওঠেনি। ধর্মগুলোকে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায় না বলেই হয়ত তা ধর্ম, নইলে তা পরিণত হত বিজ্ঞানে। প্রতিটি ধর্মের ভিত্তি হল বিশ্বাস, যুক্তি নয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কেউ কেউ যুক্তির আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু তা ধর্মের কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। তবে যুক্তির সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক ঠিক যেন পরস্পর বিপরীতমুখী; কেননা বিশ্বাসের প্রশ্ন তখনই আসে যখন তার সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে এবং যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ সম্ভব হয় না। যা যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন সম্ভব, তাকে বিশ্বাস করার জন্য কেউ বলবে না। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বিজ্ঞানের কথা বলা যায়। বিজ্ঞান যুক্তি নির্ভর, তাই বিজ্ঞানের কোনো বিষয় বিশ্বাস করার জন্য কাউকে আহ্বান জানানো হয় না, যেমনটি ধর্ম করে সব সময়। বিশ্বাসের জন্য অপেক্ষা করতে পারে কেবল মিথ্যাই। সত্য সবসময়ই সত্য। বিশ্বাসের জন্য নেই তার অপেক্ষা। ধর্মগুলোর বিষয়ে আরেকটি কথা না বললেই নয়। কোন নির্দিষ্ট ধর্মের সকল মানুষ যদি ঠিক এ মুহূর্তে ঐ ধর্মকে অবিশ্বাস করে তবে, তাৎক্ষণিক তার বিলুপ্তি ঘটবে। তাহলে ধর্মগুলো কি শুধুমাত্র মানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নয়? একমাত্র মানুষের বিশ্বাস ব্যতীত ধর্মের আলাদা কি কোনো অস্তিত্ব আছে?

স্রষ্টায় বিশ্বাস

স্রষ্টায় বিশ্বাস ধর্মগুলোর প্রধান ভিত্তি। তবে স্রষ্টা বিষয়টি একেক ধর্মে একেক রকম। তাঁর বৈশিষ্ট্যে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য, এমনকি নামেও। হিন্দুরা স্রষ্টাকে বলেন ঈশ্বর কিংবা ভগবান, মুসলমানরা আল্লাহ, খ্রিস্টানরা গড, ইহুদিরা জেহোভা। বিশ্বাসীরা স্রষ্টাকে বলেন আদিকারণ(First Cause)। তারা বলেন সব ঘটনার পেছনে যেহেতু কারণ আছে তাই এ মহাবিশ্ব এবং এর যাবতীয় ঘটনার পেছনে এমন একটি বিশেষ কারণ থাকতে হবে যার আর নিজের কোন কারণ নেই (Uncaused cause)। আর এই বিশেষ কারণকেই তারা অভিহিত করেছেন ঈশ্বর হিসেবে। বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। প্রথমেই মনে করি, আমরা স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানি না, কেননা পূর্বসংস্কার সব সময়ই যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দেয়। এবার আমরা আমাদের প্রাত্যহিক ঘটনার দিকে নজর দিলে দেখতে পাই, সব কিছুর পেছনে একটা কারণ আছে। কারণ ছাড়া কিছুই হয় না। আবার সেই কারণের পেছনেও একটা কারণ আছে। যাই হোক, আমরা আমাদের চিন্তার উৎস হিসেবে এ কথাটিকে নিতে পারি, 'সবকিছুর পেছনে একটা কারণ আছে'। এবার আমরা, কারণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধরে নেই, 'সব কিছুর পেছনে একজন ঈশ্বর আছেন, তিনি সবকিছুর কারণ, তার আর কোনো কারণ নেই'। এবার আমাদের চিন্তার উৎসের দিকে নজর দেয়া যাক-'সব কিছুর পেছনে একটি কারণ আছে' তা আমাদের চিন্তার এই ফলাফল-'সব কিছুর মূল কারণ ঈশ্বর, তার কোনো কারণ নেই' এর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক ও বিপরীতমুখী। আমাদের চিন্তার উৎস যেহেতু 'সবকিছুর পেছনে একটি কারণ আছে' তাই ঈশ্বরের পেছনে কোনো কারণ থাকবে না তা হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) বলেন, "If everything must have cause, then God must have a cause"। আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি, **সবকিছুর পেছনে যদি একজন স্রষ্টা থাকতেই হয় তবে তিনি আল্লাহ বা ঈশ্বর যাই হোন না কেন, তার পেছনেও একজন স্রষ্টা থাকতেই হবে।**

আদিকারণের বিষয়ে আরেকটি প্রশ্ন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আদিকারণ যে এক ও অদ্বিতীয় তার যুক্তি কী? এমনও কি হতে পারে না, আসলে আদিকারণ একটি নয় একাধিক। এ প্রসঙ্গে ইসলামের স্পষ্ট বক্তব্য হল, 'আসমান ও জমীনে যদি আল্লাহ ব্যতীত একাধিক ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।' (সূরা আম্বিয়া-২২)

এবার আমরা যদি মানুষের দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাই একাধিক মানুষ মিলে সাধারনত একজন থেকে অধিকতর ভাল ও সুন্দর কিছু তৈরি করতে পারে। বর্তমান যুগে অনেক কিছুই বহু মালিকানাধীন, যা নিয়ে দ্বন্দ্ব খুব কমই হয়। তাহলে স্রষ্টার ব্যাপারে তার ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? একজনের বেশি হলেই তারা কেন মধ্যযুগীয় রাজার মত একজনের ওপর আরেকজন প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করবেন অথবা পরস্পর পরস্পরের সৃষ্টি ধ্বংসে মেতে উঠবেন, তা বোধগম্য নয়। এছাড়া তারা একেকজন যদি নিজের মত করে একেকটি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেন তাতেই বা বাধা কে দিবে? আবার তারা সকলে মিলে সবার মতানুসারে একটি মহাবিশ্ব তৈরি করলেই বা সমস্যা কোথায়? এছাড়া তাদেরকে যে একটা কিছু তৈরি করতেই হবে এমনও তো নয়। তাই একত্ববাদের যুক্তি কতটা গ্রহনযোগ্য তা ভেবে দেখতে হবে।

উদ্দেশ্যবাদীরা বলে থাকেন, স্রষ্টা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টার মানুষ তৈরির উদ্দেশ্য একেক ধর্মে একেক রকম। যেমন- ইসলাম ধর্মমতে, 'জিন ও মানুষ জাতিকে আমি কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' (**51: 56**)
এখানে প্রশ্ন এসে যায়, স্রষ্টার তো কোন অভাববোধ থাকতে পারে না এবং ইবাদতেরও তার কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে কেন মানুষকে ইবাদত বা উপাসনা করার জন্য সৃষ্টি করলেন। বর্তমানে লব্ধ জ্ঞানে আমরা জানি মহাবিশ্বের তুলনায় আমাদের পৃথিবী একটি বিন্দুসম। আর এই পৃথিবীতে যে মানুষগুলো আছে তা নিশ্চয়ই স্রষ্টার জন্য বড় একটা ব্যাপার হতে পারে না। আধুনিক যুগের পূর্বে সামান্য কিছু মানুষ ব্যতীত সকল মানুষই ছিল নিরক্ষর। আধুনিক যুগেও এসে মানুষকে সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ করা যাচ্ছে না। সেই মানুষগুলোকে স্রষ্টা কেনই বা এত উচ্চাশার সাথে তৈরি করলেন।

মানুষের চেয়ে উন্নততর কোনো প্রাণী নেই বিধায় আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা আঁচ করতে না পেরে নিজেদেরকে অত্যন্ত জ্ঞানী ও ক্ষমতাবান মনে করতে থাকি। তাই হয়ত কল্পনা করি যে, অসীম জ্ঞানী স্রষ্টা আমাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হবেন না কেন।

এখানে আরেকটি কথা এসে যায়, ধর্মগ্রন্থসমূহ মতে যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য কি পূরণ হয়েছে? আমরা ইসলামের ইতিহাসে দেখতে পাই কখনো মুসলমানদের সংখ্যা অমুসলিমদের চেয়ে বেশি হয় নাই। এছাড়া মানুষ সাধারণত ধর্মের দৃষ্টিতে যতটা না সৎকাজ করে তার তুলনায় অসৎ কাজ করে ঢের বেশি। এবার কেউ হয়ত বলতে পারেন স্রষ্টা আমাদেরকে পৃথিবীতে পরীক্ষা করছেন। তাহলে বলব, পরীক্ষার ফল কি হল? তিনি কেন তুচ্ছ মানুষদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এটা কি তার পবিত্রতার বরখেলাপ নয়? যেহেতু সকল ধর্ম মতেই স্রষ্টা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাই আপত্তিটি কিছুটা পরিবর্তিত রূপে সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই উত্থাপন করা যায়।

অনেকে আবার স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য মহাবিশ্বের শৃঙখলার দোহাই দেন। এ বিষয়ে নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিফেন ওয়াইনবার্গ বলেন, 'যে বিশ্ব একেবারে বিশৃঙ্খল, বিধিবিহীন, তেমন একটি বিশ্বকে কোনো মূর্খের সৃষ্ট বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।'

অনেকে এমনও বলেন, স্রষ্টাকে আপনি বুঝবেন না। স্রষ্টাকে যদি নাইবা বুঝি তবে তাকে বিশ্বাস করব কিভাবে? যেখানে একেক ধর্মে একেক ধরনের স্রষ্টা; এছাড়া তার অস্তিত্বের বিরোধিতা অনেকেই করেছেন। আর আমরা স্রষ্টাকে না বুঝলে তিনি যে উদ্দেশ্যে আমাদের সৃষ্টি করেছেন বলা হয়, তা পূর্ণ হবেই বা কিভাবে? অবশ্য স্রষ্টা বিষয়টি মানুষের যদি অবোধগম্য হয়, তবে তা নিয়ে মাথাব্যথার কোন কারণ নেই। কেননা তাহলে তিনি অবশ্যই মানুষকে তাঁর আরাধনা বা স্তুতির জন্য নয়, অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। এটি অতিবর্তী ঈশ্বরবাদীদের(Deist) বিশ্বাস। যদিও এর পেছনে কোনো যুক্তি নেই, তবে তা আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে তেমন কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলে না, বিধায় তা মন্দ নয়। আরেকটি কথা, আমরা সাধারণ বলে থাকি স্রষ্টাই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা বেমালুম ভুলে যাই যে, আমরা নর ও নারীর (পিতা-মাতা) মাধ্যমে জৈবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের জন্ম সম্পূর্ণই তাদের (পিতা-মাতা) ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল।

বিভিন্ন ধর্মমতে স্রষ্টার বিভিন্ন গুণ রয়েছে। যেমন- তিনি খুশি হন, রাগ করেন, দেখেন, শোনেন, বুঝেন। বলা হয় তিনি নিরাকার। আবার তাঁর নূর বা জ্যোতি রয়েছে! এছাড়া স্রষ্টার দুটি গুণ অসীম দয়ালু ও ন্যায়বিচারক পরস্পরবিরোধী। যিনি ন্যায়বিচারক, তিনি দয়ালু হন কিভাবে আর যিনি দয়ালু, তিনি ন্যায়বিচারক হন কিভাবে? এছাড়া তার রয়েছে সিংহাসন (আরশ); স্রষ্টাকে বলা হয় অসীম আবার তাকে কেন্দ্রীভূত করা হয় নির্দিষ্ট একটি জায়গায়। স্রষ্টাকে বলা হয় তিনি অসীম ক্ষমতাবান। তাহলে তিনি কি এমন কিছু তৈরি করতে পারবেন যা তিনি নিয়ন্ত্রণে অক্ষম। প্রশ্নটির উত্তর হ্যা বা না যেটিই হোক তা তার অক্ষমতা প্রকাশ করবে। অর্থাৎ অসীম ক্ষমতাবান বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলতে কিছু নেই। এছাড়া স্রষ্টা বিষয়ে আরেকটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ, স্রষ্টার কি এমন কোন গুণ রয়েছে যা সীমিতভাবে মানুষের মধ্যে নেই? তা তো থাকার কথা ছিল, কিন্তু নেই। এতে বিষয়টি পরিস্কার যে, মানুষের পক্ষে স্রষ্টার ও তার গুণাবলির কল্পনা সম্ভব এবং মানুষ তা-ই করেছে।

বিভিন্ন ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্যান্য কিছু প্রসঙ্গ

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম মতে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বর্গ, পৃথিবী, জীবজগৎ ও বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং তারপর তিনি অ্যাডাম ও ইভ নামক প্রথম মানব-মানবীকে মাটি থেকে তৈরি করে প্রাণ দেন। সৃষ্টিমূহুর্তে পৃথিবী ছিল আকারহীন ও শূণ্য এবং মহা অন্ধকারে নিমজ্জিত। বিশ্ব মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে ধ্বংস হবে আর ঐ দিনই ঈশ্বর সকলের কৃতকর্মের বিচার করবেন।

বাইবেল গ্রন্থটি স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। শ্রদ্ধেয় ওয়াহিদ রেজা তাঁর 'ধর্মচেতনা ও ঈশ্বরবিশ্বাস' (*দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৯৩-৯৪) প্রবন্ধে মানুষ সম্পর্কিত বাইবেলের ৬টি স্ববিরোধী উক্তি উল্লেখ করেছেনঃ

১। মানুষ সৃষ্টি হওয়ার আগে গাছ এলো (জেনেসিস ১: ১১-১২) মানুষ তৈরি হওয়ার পর গাছ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ১ঃ ৭-৯)।
২। জন্তু জানোয়ারদের পরে মানুষ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ১: ২৫-২৬) জন্তু জানোয়ারদের আগে মানুষ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ২: ১৮-২০)
৩। আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার দিনই মরবে (জেনেসিস ২: ১৭) আদম ৯৩০ বছর বেঁচেছিল (জেনেসিস ৫: ৫)
৪। ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান না (জেমস ১: ১৩) ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান (জেনেসিস ২২ : ১/২ স্যামুয়েল ২৪ :১)
৫। কোন মানুষ ঈশ্বরকে দেখেনি বা দেখতে পারে না (জন ১ : ১৮/১ টিম ৬ : ১৬) অনেকের কাছেই তিনি দেখা দিয়েছেন (জেনেসিস ২৬ : ২/ এক্সোডাস ২৪ : ৯-১০, ৩৩ : ২২-২৩)
৬। কেউই ঈশ্বরের মুখদর্শন করার পর বেঁচে থাকতে পারে না (এক্সোডাস ৩৩ : ২০) জেকব ও মুসা দুজনেই ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখেছেন

কিন্তু মরেন নি (জেনেসিস ৩২: ৩০, এক্সোডাস ৩৩ : ১১)

বাইবেল ও কোরানের মতে পৃথিবী স্থির। বাইবেলের এই ধারণার কারণে সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের জন্য ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল খ্রিস্টান ধর্মপুরুষরা। এবার কোরানে আসা যাক। কোরানের ভাষায়-

'নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়।' (৩৫:৪১, তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন)

'ইহা তার নিদর্শনসমূহ-আসমান জমিন তারই হুকুমে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে।' (৩০:২৫) বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ মাও. ফজলুর রহমান মুন্সি। সৃষ্টিসম্পর্কে কোরানের অন্যত্র বলা হয়েছে,

'আর তিনি এমন যে, সমস্ত আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তখন আরশ ছিল পানির উপরে।' (১১:৭)

(উল্লেখ্য আরশ শব্দের অর্থ রাজসিংহাসন)

'আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন' (২৪:৪৫) আবার কিয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সেদিন আটজন ফেরেশতা রবের আরশ বহন করবেন' (৬৯:১৭)

সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াত মতে, মৃত ব্যক্তির মা, বাবা, দুই মেয়ে ও এক স্ত্রী থাকলে তার সম্পত্তির মা পাবে $^{১}/_{৬}$, বাবা $^{১}/_{৬}$, দুই মেয়ে $^{২}/_{৩}$ ও স্ত্রী $^{১}/_{৮}$ অংশ। তাহলে মোট অংশ দাঁড়ায় ($^{১}/_{৬}+^{১}/_{৬}+^{২}/_{৩}+^{১}/_{৮}$) = $^{২৭}/_{২৪}$ অংশ, যা মূল পরিমাণের চেয়ে বেশি। পরে হজরত আলী তা সংশোধন করেন, যা ফরায়েজে আইনে 'আউল' নামে পরিচিত।

সূরা ফাতেহার চার থেকে সাত নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর বাণী হয় কিভাবে? কেননা আয়াতগুলোর পূর্বে ' কুল' বা বলো বা 'এই বলে প্রার্থনা করা' বলা হয় নাই।

এছাড়া সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা নাকি অন্য কোন সূরার বা সূরা আনফালের অংশ তা নিয়ে বিভেদ আছে। সূরা ফীল ও কোরাইশ এক সূরা নাকি পৃথক দুটি সূরা তা নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল। তাছাড়া কোরানের আয়াত, শব্দ, বর্ণ, সংখ্যা নিয়ে বিভেদ রয়েছে, তা অনেকেই খেয়াল করেন না।

এবার আসি হাদিসে। আবু যর গেফারি (রা.) একদিন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে সূর্যাস্তের সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন আবু যর, সূর্য কোথায় অস্ত যায় জানো? আবু যর বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নিচে পৌঁছে সেজদা করে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকেও এই সম্বন্ধে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক সূর্য আরশের নিচে পৌঁছে সেজদা এবং নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমণ শুরু করে। (তফসীর মাআরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১১৩৩)

এখন প্রশ্ন হল পৃথিবীর এক জায়গায় সূর্যাস্ত হলে অন্য জায়গায় থাকবে দুপুর, আরেক জায়গায় থাকবে সূর্যোদয়। তাহলে যা বলা হল, তার ব্যাখ্যা কী?

বিশ্বসৃষ্টির আদিতে যে অবস্থা বিরাজ করছিল, হিন্দুধর্মের মনুসংহিতার ঋষি তা বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'এই যে বিশ্বসংসার চোখের সামনে প্রত্যক্ষ তা ছিল গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই অন্ধকার জগৎ ছিল আমাদের জ্ঞানের অতীত, কোনো লক্ষণের সাহায্যে এ সম্পর্কে অনুমানের কোনো উপায় ছিল না। এই জগৎ ছিল অজ্ঞেয়, যেন সর্বতোভাবে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এই প্রলয়াবস্থার পর স্বয়ম্ভূ সূক্ষরূপী ভগবান পঞ্চমহাভূত প্রভৃতিতে ব্যক্ত করলেন- তিনি অমিততেজা, প্রলয়াবস্থার বিনাশক রূপেই যেন আবির্ভূত হলেন।' (মনুসংহিতা ১: ৬-৭)

সৃষ্টির আদিতে কী ছিল তা ঐতিরেয় উপনিষদে বিবৃত হয়েছে- 'সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল; নিমেষাদি ক্রিয়াশীল অন্য কিছুই ছিল না। সেই আত্মা এই রূপ ঈক্ষন করিলেন- "আমি লোকসমূহ সৃজন করিব"।' (১:১:১)

বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতে, 'পূর্বে কিছুই ছিল না, এই জগৎ ভোজনেচ্ছারূপ মৃত্যু দ্বারা আবৃত ছিল, কারণ বুভুক্ষাই মৃত্যু। 'আমি সমনস্ক হইব'- এইরূপ উদ্দেশ্যযুক্ত হইয়া ঐ মৃত্যু কার্যপর্যালোচনক্ষম মনের সৃষ্টি করলেন। তিনি আপনাকে পূজা করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন অর্চনারত ছিলেন, তখন উদক (জল) উৎপন্ন হইল।' (১:২:১) 'জলই অর্ক। উক্ত স্থলে জলের উপরে সরের ন্যায় যাহা হইয়াছিল, উহা গাঢ় হইল; এবং উহা পৃথিবীতে পরিণত হইল। পৃথিবী সৃষ্টি হইলে শ্রান্ত ক্লান্ত সেই মৃত্যু থেকে তেজোরস নির্গত হইল; (ইনিই) অগ্নি অর্থাৎ বিরাট।' (১:২:২)

এ বর্ণনা থেকে এটাই উপলব্দি হয় যে, হিন্দুধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে বিজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই এবং তা আদিম কল্পনা বৈ কিছু নয়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, যুক্তির সাথে বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব প্রকট এবং বিরাট। যুক্তির ওপর ভর করে বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে। আর বিশ্বাসের ওপর ভর করে ধর্মগ্রন্থগুলো। এখন আপনি কোনটি গ্রহণ করবেন?

আমরা এ কথা স্পষ্টভাবে মনে করি- ধারণ করি, আমাদেরকে অবশ্যই ধর্মগ্রন্থগুলো পড়তে হবে, যার যার নিজের ভাষায়, যুক্তি প্রয়োগ করে বুঝতে হবে ধর্মগ্রন্থে বাণীসমূহের মর্মার্থ। শুধু পুণ্যলাভের আশায় পবিত্র ভাষায় না বুঝে, পাঠ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। না বুঝে পাঠ করলে শুধুই অজ্ঞতাই বৃদ্ধি পায়, জ্ঞান বাড়ে না। আর এই অজ্ঞতা নামক দুর্বলতার সুবিধা নেয় আমাদের চারপাশের কিছু ভণ্ড মোল্লা-মৌলভি, পির-ফকির, ঠাকুর প্রমুখেরা। তাই আমাদের সমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল করে তুলতে হলে, আসুন আমরা যুক্তির আশ্রয় নেই। ঝেড়ে ফেলি সকল অজ্ঞতা, কুসংস্কার আর পবিত্র বিশ্বাসের নামে অপবিশ্বাসগুলো। এর কোনো বিকল্প নেই।

মুক্তচিন্তক পরিচিতি*

ড্যান বার্কার

অনুবাদ : মিহিরকান্তি চৌধুরী

মুক্তচিন্তকরা ধর্মকে যুক্তি দিয়ে, ঐতিহ্য, কর্তৃত্ব ও প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস নিরপেক্ষ হয়ে যৌক্তিক মানদণ্ডে নিজের বিশ্বাসের কাঠামো নির্মাণ করেন। তাঁদের মধ্যে যেমন রয়েছেন নাস্তিক, তেমনই রয়েছেন অজ্ঞাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী ও নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদীরা।

ধর্মবিশ্বাস, ধর্মগ্রন্থ ও ত্রাণকর্তার প্রতি আনুগত্য রেখে মুক্তচিন্তক হওয়া সম্ভবপর নয়। মুক্তচিন্তকদের কাছে রহস্যোদঘাটন নিরর্থক এবং গোঁড়ামি সত্যের পথে বাধাস্বরূপ।

মুক্তচিন্তকের জ্ঞানের ভিত্তি কী?

মুক্তচিন্তকরা প্রকৃতিবাদীও বটে। বাস্তবতার সাথে শুধু সত্যেরই সামঞ্জস্য রয়েছে। বাস্তবতা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবনযোগ্য অথবা যুক্তিগ্রাহ্যতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নিশ্চিত হওয়া বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানমনস্কতা হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। কোনো একটি বিষয়কে সত্য বলে মানতে হলে সেটাকে অবশ্যই যুক্তির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে (একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার উপযুক্ততা), হতে হবে পরিবর্তনযোগ্য (তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত না হওয়ার জন্য বিবেচ্য), হিসেবী (সীমিত অনুমানভিত্তিক সহজ ব্যাখ্যার উপযুক্ততা) এবং যুক্তিসম্মত (বিরোধমুক্ত)।

মুক্তচিন্তক ব্যক্তিরা মানবজীবনকে নৈতিকতার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। যা মানবকল্যাণ নিশ্চিত করে তাই 'অকল্যাণকর' এবং যা তাকে বিপদাপন্ন করে তাই 'অমঙ্গল'। সৃষ্টি পরম নয়। এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের মূল্যবোধের ভিত্তি হচ্ছে জীবন। কাজেই যুক্তিবাদীরা মানবতাবাদীও বটে। এটা থেকেই আমাদের এ বিশ্বের কল্যাণের জন্য আগ্রহের সৃষ্টি আর সেটা জীবজন্তু পর্যন্তও ব্যাপ্ত।

*লেখকের অনুমতিক্রমে `Losing faith in faith; from preacher to atheist' গ্রন্থের "What is a freethinker" পরিচ্ছেদের অনুবাদ।

একটি নৈতিক সিদ্ধান্ত বা বিচার-বিশ্লেষণ 'ন্যায়-অন্যায়'কেন্দ্রিক। অধিকাংশ নৈতিক প্রশ্নে মূল্যবোধের বিরোধ রয়েছে যেখানে যুক্তির সতর্ক প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। অন্যের মানসিক কাঠামোকে শাসন করা চরমভাবে অনৈতিক ও খুবই বিপজ্জনক।

মুক্তচিন্তকরা কি জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান?

মুক্তচিন্তকরা অবশ্যই জানেন যে অভিপ্রায়ের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে মন। মহাবিশ্বের মন নেই, ভাবনাও নেই বলেই আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে যদি আপনি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চান। ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে। তিনি মানবিক নৈতিকতাকে বজায় রেখে নিজস্ব কাঠামো নির্মাণ করতে পারেন।

অনেক মুক্তচিন্তক বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি অনুভূতি ও সহানুভূতি প্রদর্শনে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। এ ধরনের ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে মানুষের অপ্রয়োজনীয় দুঃখ-কষ্ট, সামাজিক উন্নয়ন, মানবাতাবোধের সৌন্দর্য (শিল্পকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য), ব্যক্তিগত সুখ সাচ্ছন্দ্য, আনন্দ, ভালোবাসা ও জ্ঞানের উন্নয়ন।

জীবনের জটিলতা কি সৃষ্ট নয়?

জীবনে যে কোনো প্রশ্ন বা জটিলতা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব লক্ষ-কোটি বছর ধরে গড়ে ওঠা প্রাকৃতিক সৃষ্টিকাঠামোর ব্যাখ্যা দান করেছে। দৈবভাবে কোনো কিছুর সৃষ্টির প্রসঙ্গ আসে না কারণ সেক্ষেত্রে সার্বিক বিষয়টিও সমভাবে যুক্তিকতার মানদণ্ডে উন্নীত হতে হবে। মুক্তচিন্তকরা স্বীকার করেন যে, এ মহাবিশ্বে রয়েছে অনেক বিশৃঙ্খলা, অস্বস্তি এবং কষ্ট-বেদনা–যেগুলোর ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে।

মুক্তচিন্তকদের কেন ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান?

মুক্তচিন্তকরা দৃঢ়প্রত্যয়ী যে-ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে সত্যতার অভাব রয়েছে যেগুলো সাক্ষ্য প্রমাণও যুক্তির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। মিথ্যাকে বিশ্বাস করে কিছু অর্জনের যে কিছু নেই, শুধু তাই নয় কুসংস্কারের কাছে আমাদের যুক্তির অপরিহার্য মানদণ্ডটি হারানোর ফলে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তই হবার উপক্রম হয়।

অধিকাংশ মুক্তচিন্তক ধর্মকে শুধু মিথ্যাশ্রয়ী বলেন না, ক্ষতিকর বলেও মনে করেন। ধর্মযুক্তবিগ্রহ, দাসত্ব, নারী-পুরুষ বৈষম্য, জাতিগত বৈষম্য, হানাহানি, অসহনশীলতা ও সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন ইত্যাদি বিষয়ে ন্যায্যতা দান করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ধর্ম কি বিশ্বের কোনো অসাধারণ মঙ্গল বয়ে আনেনি?

কিছু কিছু ধর্মবাদী ভালো লোক কিন্তু তাঁরা তো যে কোনো মানদণ্ডেই ভালো। মুক্তচিন্তকদের ন্যায় বিচার বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ ধর্মবাদীদের ক্ষেত্রে ধর্মের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই।

বস্তুত অধিকাংশ আধুনিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়ন ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারাই হয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছেন ক্লারা-বার্টন, আলবার্ট আইনস্টাইন, এন্ড্রু কার্নেগী, থমাস এডিসন, মেরী কুরী, এলিজাবেথ ক্যাডী স্টান্টন, সুসান বি প্রন্থনী, এইচ এল মেনকেন, চালর্স ডারউইন, সিগমাণ্ড ফ্রয়েড, বরার্ট বার্নস, পার্সি শেলী, জোহানস ব্রামস এবং আরো অনেকে যাঁদের আমরা আজও মানবতার প্রতি অবদানের জন্য সম্মান করি।

অধিকাংশ ধর্মবিশ্বাস প্রতিনিয়তই প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে আসে দাসত্বপ্রথা বিলোপের প্রশ্ন। নারী সমাজের ভোটাধিকার, মহিলাদের গর্ভনিরোধ, গর্ভপাত, চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নয়নে অবেদনিক ব্যবহার, সৌরজগতের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিবর্তন, বিদ্যুৎ দণ্ডের ব্যবহার এবং রাষ্ট্র ও গীর্জার প্রশ্নে আমেরিকার নীতি ইত্যাদি।

মুক্তচিন্তকদের কি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ রয়েছে?

না, মুক্তচিন্তা মনস্তাত্ত্বিক একটি বিষয়, রাজনৈতিক নয়। আজকাল মুক্তচিন্তা বাস্তবে প্রায় সকল রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুগতদের মধ্যে প্রসারতা লাভ করেছে। আর সেটা পুঁজিপতি, ব্যক্তিবাদী, সমাজবাদী, সাম্যবাদী, রিপাবলিকান, ডেমোক্রেট, উদারপন্থী, রক্ষণশীল যেই হোন না কেন। সাম্যবাদ ও নাস্তিকতার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। এডাম স্মিথ ও আইন রেন্ড-এর মতো ব্যক্তিত্বরা ছিলেন গোঁড়া পুঁজিপতি। অন্যদিকে অনেক সাম্যবাদীও ছিলেন গোঁড়া ধার্মিক যেমনটির উদাহরণ হিসেবে আদি খ্রিস্টীয় গীর্জার (Early Christian Church) কথা উল্লেখ করা যায়।

নাস্তিকতা/মানবতাবাদ কি ধর্মের পর্যায়ে পড়ে?

নাস্তিকতা কোনো বিশ্বাস নয়। এটা দেব-দেবীতে বিশ্বাসের অভাব। কোনো বিশ্বাসের সংকটে নতুন কোনো বিশ্বাসের প্রয়োজন পড়ে না। নাস্তিকতা বাস্তব পক্ষে যুক্তিবাদের প্রতিশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এটা কোনোভাবেই ধর্মের পর্যায়ে পড়ে না।

মুক্তচিন্তকরা 'ধর্ম' কথাটিকে কিছু বিশ্বাসকাঠামোর মধ্যে বিচার করেন যেখানে রয়েছে অলৌকিক জগতের কথা, বিগ্রহের কথা, দৈবভাবেপ্রাপ্ত লিখিত ধর্মবাণীর কথা যা সংশ্লিষ্ট বিশুদ্ধ ধর্মবিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবোধের কোনো ঈশ্বর, কোনো ধর্মগ্রন্থ বা কোনো ত্রাণকর্তা নেই। এটা স্বাভাবিক যে যুক্তিবাদী দর্শন নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা নমনীয় ও বাস্তবসম্মত–এটা ধর্মের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।

ধ্যান-ধারণার বহুত্ব কি মানবতার অগ্রযাত্রা নয়?

হ্যাঁ, এটাই আমাদের প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন। গোঁড়ামির শৃঙ্খলমুক্ত ব্যক্তিচিন্তার বহুতা যে কোনো ধ্যানধারণাকে বিচার বিশ্লেষণের গ্রহণের বা বর্জনের উপযোগী করে তোলে। ধর্মীয় গোঁড়াদের সর্বগ্রাসী মনোভাব প্রগতিকে ব্যাহত করে।

মুক্তচিন্তক হিসেবে কেন আমি গর্ববোধ করি?

মুক্তচিন্তা বা যুক্তিবাদ বাস্তবতা সম্মত। মুক্তচিন্তা কাউকে তার নিজের মতোই চিন্তা করতে সাহায্য করে। মুক্তচিন্তকরা প্রাচীন কুসংস্কারের অন্ধভক্ত হওয়াতে কোনো অহংকার দেখেন না, অহংকার দেখেন না আদিকালের উন্মোচিত কোনো দৈবশাসকের সম্মুখে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবনত হতে। মুক্তচিন্তা সম্মানজনক। মুক্তচিন্তা প্রকৃতপক্ষে বন্ধনহীন।

যুক্তি ও যুক্তিবাদ

অনন্ত বিজয় দাশ

যখন থেকে মানুষের যাত্রা শুরু, সেই পঞ্চাশ-ষাটহাজার বছর আগের নিয়্যানডারথ্যাল প্রজাতি থেকে বর্তমানকালের ক্রো-ম্যাগনন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে ভাবনাটি মানবমস্তিষ্কে উদিত হয়েছে, তা হলো 'কেন'। এটা কী, ওটা কী, এটা কেন, ওটা কেন। এই 'কেন' ভাবনাটি মানুষকে চালিত করেছে, মানুষের চিন্তায় পৃথিবীর নানা ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগিয়েছে, মানুষকে জ্ঞান অন্বেষণে চালিত করেছে। মানুষ আজ যতটুকুই 'মানুষ' হোক না কেন, তার সবটুকুরই পেছনে একমাত্র ভূমিকা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে অহর্নিশ জেগে থাকা 'কেন' প্রশ্নটি। প্রাচীনকালের গুহাবাসী মানুষ লক্ষ্য করেছে, আকাশে কী সুন্দর করে ডানা মেলে উড়ে যায় পাখি, গাছ থেকে টপটপ করে ফল পড়ে, শুকনোপাতা ঝরে পড়ে, নদীতে নির্দিষ্ট সময় পরপর জোয়ার-ভাটার খেলা হয়, প্রতিদিন ভোর হলে একই নিয়মে আকাশে সূর্য দেখা যায়, সূর্যের আলোয় ভরে যায় পৃথিবী; আবার সন্ধ্যা হলে সূর্যকে দেখা যায় না, আস্তে আস্তে গাঢ় অন্ধকারে পৃথিবী ঢেকে যায়। এই সময়ে একচিলতে আলো নিয়ে উপস্থিত হয় চাঁদ। পৃথিবীর এই সকল নানা ঘটনার পাশাপাশি সূর্য-চন্দ্রের এই লুকোচুরি খেলা মানবমনে নানা কৌতুহলের সৃষ্টি করেছে, ভাবিত করেছে, জিজ্ঞাসা জাগিয়েছে। এই জিজ্ঞাসার আর কৌতুহলের উত্তর জানার তাগিদেই মানুষ সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান'কে, যা মানুষকে সভ্যতা গড়ার পথে পরিচালিত করেছে। অর্থাৎ এই প্রশ্ন করার বাতিক আর উত্তর খোঁজার তাগিদই মানুষের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, সবচেয়ে বড় সম্পদ; পৃথিবীকে বদলে ফেলার, নতুন পৃথিবীকে গড়ার। কোন ধরনের গায়েবি মাজেজায় কিংবা আপ্তবাক্যে কখনও নিঃসংশয় না থেকে মানুষ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছে তার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার 'প্রশ্ন করার বাতিক আর উত্তর খোঁজার তাগিদ।' এরই ফলে সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষের চিন্তায় তৈরি হয়েছে সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি, জিজ্ঞাসায় ভরপুর 'প্রশ্ন করা এবং উত্তর খোঁজার' এক প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। এই জ্ঞান-অন্বেষণের তীব্র স্পৃহা থেকেই তৈরি হয়েছে *যুক্তি*, যা বাস্তব জীবনে নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিচার-বিশ্লেষণের মাপকাঠি। যুক্তি মানুষের মস্তিস্কক্রিয়ার ফল বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাপ্রসূত। আরো ভালোভাবে বললে বলা যায়, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার সুসংবদ্ধরূপই হচ্ছে যুক্তি। মানুষ বিবেক-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ফলে মুক্তচিন্তা, মুক্তবুদ্ধি মানুষকে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে সাহায্য করে। অপরদিকে অবস্তুতান্ত্রিক যুক্তিহীন ভক্তি-ভয়-বিশ্বাস মানুষকে কার্যকারণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তবতার ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখে; ঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধাগ্রস্থ করে। মুক্তচিন্তা, যুক্তিবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতার বদলে অপ্রমাণিত অলৌকিক বিশ্বাসনির্ভরতা, কল্পিত-অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে আত্মসমর্পণে মানুষের অনুসন্ধিৎসা, জিজ্ঞাসা, মেধা-মনীষার অপমৃত্যু ঘটে। কিন্তু তারপরও অজ্ঞতার, অন্ধকার যুগের কিংবদন্তি ও পৌরাণিক বিশ্বাস আজো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার যুগেও আমাদের মাঝে হাত ধরাধরি করে সহাবস্থান করেছে, এবং পশ্চাৎদিকে অনবরত টেনে ধরছে। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। শৈশবের পৌরাণিক অতিকথা, উপাসনা-ধর্মীয় উপাখ্যান, পাপ-পূণ্যের শাস্তি, পুরস্কারের লোভ কখনোই মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়নি। বরঞ্চ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, যুক্তিবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতা, কর্মস্পৃহা, মনুষ্যত্ব মানবসভ্যতাকে যুগ যুগ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেছে, এখনো যাচ্ছে।

'*যুক্তিবাদ*' নিয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমেই বলে ফেলা ভালো 'যুক্তিবাদ' হচ্ছে 'যুক্তিকেন্দ্রিক মতবাদ'; একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের দর্শনশাস্ত্র মোটা দাগে দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে 'ভাববাদ' এবং অপরটি হচ্ছে 'বস্তুবাদ'। এই 'ভাববাদ' এবং 'বস্তুবাদ' নিজেরা বিভিন্ন তত্ত্বে বহু 'বাদ'–'মতবাদ'–এ বিভক্ত। যাই হোক, এই বস্তুবাদের মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তিবাদ বা 'Rationalism'।

এখন 'বাদ' বা 'Ism' ব্যাপারটা ঠিক কী, সেটাই প্রথমে দেখা যাক। 'বাদ' বা 'Ism' সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে বললে বলা যায় 'বাদ' বা 'Ism' সাধারণত তিন ধরনের। প্রথমত জীবন ও জগৎ ঠিক কী রকম, সে প্রসঙ্গে কোনও দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক মতকে 'বাদ' বা 'Ism' বলে। যথা-বার্কলের Solipsism, ডেভিড হিউমের Agnosticism । দ্বিতীয়ত কোনও দার্শনিক মতের ধরন বা দৃষ্টিভঙ্গিকে 'বাদ' বা 'Ism' বলা হয়। যথা– Idealism, Realism ইত্যাদি। আবার তৃতীয়ত দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি বা দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জ্ঞানতত্ত্বগত উপায় বা সোপানকেও বাদ বা 'Ism' বলা হয়ে থাকে। যথা Criticism, Scepticism ইত্যাদি। এছাড়া আরো অসংখ্য অর্থে 'বাদ' বা 'Ism' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেগুলো এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।

'বাদ' বা 'Ism' সম্পর্কে তৃতীয়ত যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তার আলোকে দেখা যায় যে, সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সোপানকেও 'বাদ' বা 'Ism' বলা হয় এবং যুক্তি যেহেতু কোন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিতে বা দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সোপান, অতএব 'যুক্তিবাদ' অবশ্যই একটি 'বাদ' বা 'Ism'। এছাড়াও প্রথমত এবং দ্বিতীয়ত বলে যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে; এর আলোকে দেখা যায় যে, 'যুক্তিবাদ' একটি 'দর্শন', 'মতবাদ' বা 'Ism'। অর্থাৎ 'যুক্তিবাদ' শুধু বিচার-বিশ্লেষণের কিছু পদ্ধতিগত কায়দাকানুন নয়, 'যুক্তিবাদ' একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন, একটি বিশ্বনিরীক্ষণ-পদ্ধতি, একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি।

যুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি :

Logic বা যুক্তিবিদ্যায় সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দুটি পদ্ধতি আছে।

যথা- ১. ডিডাকশন (Deduction) বা অবরোহ; ২. ইন্ডাকশন (Induction) বা আরোহ।

এ সর্ম্পকে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বলা যায় যে :

১. অবরোহ বা ডিডাকশন (Deduction) হলো, কোনো ব্যাপক বা সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে পৌঁছনোর কায়দা। ধরা যাক, বলা হলো 'সব মানুষই মরণশীল' এবং আরো বলা হলো 'রহিম সাহেব একজন মানুষ,' তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, 'রহিম সাহেব মরণশীল।

... এই পদ্ধতিটির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রহিম সাহেব একই সঙ্গে অমর ও মরণশীল হতে পারেন না। যেকোনো একটিই তাকে হতেই হবে। কিন্তু তিনি অমর হলে প্রথম বাক্য 'সব মানুষই মরণশীল'–এর বিরোধিতা করা হয়। অর্থাৎ, তাহলে রহিম সাহেব মানুষ নন। কিন্তু রহিম সাহেব 'মানুষ' হলে তাকে অবশ্যই মরণশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এখন দেখা যাচ্ছে যে, 'সব মানুষ মরণশীল'–এই সাধারণ সত্য থেকে আমরা একজন বিশেষ মানুষ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। অর্থাৎ বহুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত থেকে একের বিষয়ে নেমে এসেছি। এটাই অবরোহমূলক যুক্তি এবং এই অবরোহমূলক যুক্তির পেছনে আছে আত্মবিরোধিতা বা স্বরিরোধিতা না করার নীতি, যাকে ইংরেজিতে বলে 'Law of non self-contradiction' এবং তার সাথে আছে 'জগৎ সংসার স্বরিরোধী নয়'–এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি।

২. আরোহ বা ইন্ডাকশন (Induction) হলো– কোনো বিশেষ ঘটনা বা সত্য থেকে পাওয়া তথ্য থেকে একটি ব্যাপক বা সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। ধরা যাক, বলা হলো :

'করিম সাহেব' পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

'জলিল সাহেব' পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

'সালাম সাহেব' পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

'মতিন সাহেব' পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

... এমনি করে অসংখ্য পটাশিয়াম সায়ানাইড-খাওয়া ব্যক্তির ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল, পটাশিয়াম সায়ানাইড খাওয়ার কারণে মারা গেছেন। ফলে অসংখ্য ব্যক্তির ওপর পরীক্ষা চালানোর ভিত্তিতে বলা যায়, 'যে পটাশিয়াম সায়ানাইড খায়, সে মারা যায়।' মূলত এখন যত বেশি সংখ্যক লোকের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, ততই সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হবে অথবা নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

আরোহমূলক যুক্তির পিছনে কয়েকটি মৌলিক নীতি বা Principle রয়েছে।

যেমন :

১. 'প্রত্যেকটি ঘটনারই কারণ রয়েছে, যাকে ইংরেজিতে বলে 'Law of Causation'– এই প্রত্যয় না থাকলে 'মৃত্যু'র আদৌ কোনো কারণ আছে কি না তা নিয়ে সংশয়ে পড়তে হয় এবং পরবর্তী ঘটনার কারণ খোঁজার প্রশ্নই আসে না।

২. 'একই কারণ সব সময় একই ফল দেবে বা 'Law of Uniformity of nature'–এই প্রত্যয় না থাকলে অসংখ্য লোক পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মরলেও সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যেত না।

৩. 'অনুসন্ধান বা গবেষণা করলে প্রতিটি ঘটনারই কারণ সম্পূর্ণ বোধগম্য হতে বাধ্য।'–এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্বাস করলেও কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-এর ক্ষেত্রে একপাও এগোনো যাবে না। যদি ভাবা হয় মৃত্যুর কারণ থাকলেও তা জ্ঞান বা বুদ্ধির অগম্য, তাহলে পটাশিয়াম সায়ানাইড বা ঐ জাতীয় কোনো বাস্তব বিষয়ের মধ্যে কারণ খোঁজে বেড়ানোর কথা মাথাতেই আসা উচিৎ নয়।

... উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অবরোহ বা আরোহ যে ধরনেরই যুক্তি প্রয়োগ করি না কেন, কতগুলো মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া এগোনো সম্ভব নয়। যেমন : স্ববিরোধিতা করা চলবে না, প্রতিটি ঘটনারই কারণ খুঁজতে হবে, কারণগুলো সর্বজনীন হবে এবং কারণগুলো বোঝা যাবে।

এখন যে প্রশ্নগুলো উঠে আসে, কার স্ববিরোধিতা না করা, কিসের ঘটনা, কিসের কারণ, কোন পরিপ্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে, কিসের বোধগম্যতা? ইত্যাদি।

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর হচ্ছে, যখন এক পরিবর্তনশীল বস্তুতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এগুলো চিন্তা করি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করি এবং যেকোনো সফল স্বার্থক ইতিবাচক চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষ চিরকালই তাই করে আসছে। 'যুক্তিবাদ' তাই আসলে 'বস্তুবাদ। বস্তুময়তা এবং বাস্তব পরিবর্তনশীলতার ধারণা ছাড়া যুক্তি, লজিক একেবারেই দাঁড়ায় না। তাই বস্তুপরিবর্তন-যুক্তি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে বাধা। একমাত্র বিমূর্ত চিন্তা ছাড়া যুক্তির অস্তিত্ব আমরা অন্য কোথাও অবহেলা করতে পারি না।

যুক্তিবাদ তাই আমাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি, আমাদের আত্মমগ্নতা ও বহির্মুখিতা উভয়েরই সঙ্গী। যুক্তিবাদ মানে একটি গোটা বিশ্ববীক্ষা অর্থাৎ গোটা বিশ্বনিরীক্ষণ পদ্ধতি, স্ববিরোধিতাহীন জীবনদর্শন।

তথ্যসূত্র :

১. মফিজুর রহমান রুননু, যুক্তিবাদ চেতনামুক্তির লড়াই, পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ।

২. প্রবীর ঘোষ, সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩।

এ সংখ্যার লেখক-পরিচিত

১. ড. অজয় রায় : বিজ্ঞানী, অধ্যাপক (অব.) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

২. অভিজিৎ রায় : গবেষক, প্রকৌশলী । মুক্তমনা (mukto-mona.com) আন্তর্জালের প্রতিষ্ঠাতা । উল্লেখ্যযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ : 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' (অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫) ইত্যাদি ।

৩. বন্যা আহমদ: আমেরিকা প্রবাসী সিস্টেম এনালিস্ট । প্রকাশিত গ্রন্থ : 'বিবর্তনের পথ ধরে' (অবসর প্রকাশনী, ২০০৭) ।

৪. আকাশ মালিক : ইংল্যান্ড প্রবাসী কবি, লেখক ।

৫. নন্দিনী হোসেন : ইংল্যান্ড প্রবাসী লেখক । সাতরং (satrong.org) আন্তর্জালের প্রতিষ্ঠাতা ।

৬. ফরিদ আহমেদ : মুক্তমনা আন্তর্জালের কো-মডারেটর । যৌথভাবে প্রকাশিত গ্রন্থ : 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' (অবসর প্রকাশনী, ২০০৭) ।

৭. মৌ মধুবন্তী : কানাডা প্রবাসী কবি । প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'রক্তনদী একা' ।

৮. জাহেদ আহমদ : আমেরিকা প্রবাসী, বায়োটেকনোলজিতে মাস্টার্স । মুক্তমনা আন্তর্জালের কো-মডারেটর ।

৯. মফিজুর রহমান রুন্নু : যশোর যুক্তিবাদী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা । প্রকাশিত গ্রন্থ : 'যুক্তিবাদ চেতনামুক্তির লড়াই' (পড়ুয়া প্রকাশনী) ।

১০. অরুনকান্তি দাশ : লেখক, ব্যাংক এমপ্লয়ি ।

১১. মাহমুদ আলী : কবি, প্রকাশিত উপন্যাস : 'নরকে শূন্য থালা' ।

১২. অ.আ.ম. রেজা : কবি, প্রাবন্ধিক ।

১৩. জাহিদ রাসেল : ইংল্যান্ড প্রবাসী লেখক ।

১৪. সুমন তুরহান : অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী প্রাবন্ধিক । প্রকাশিত গ্রন্থ : 'এই পাখির প্রবাহ
এই ঋতুবতী মেঘ (২০০০), ঝরাসময়ের গান (২০০৫) ইত্যাদি ।

১৫. ফাতেমা রেজমিন : লেখক । শিক্ষার্থী; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট ।

১৬. মনির হোসাইন : লেখক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষার্থী ; মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট ।

১৭. এম.এ. আলিম : কবি, লেখক । শিক্ষার্থী; মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট ।

১৮. লিটন দাস: প্রাবন্ধিক । শিক্ষার্থী; মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট ।

১৯. সৈকত চৌধুরী : লেখক । শিক্ষার্থী ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

২০. মিহিরকান্তি চৌধুরী : লেখক, অনুবাদক । পরিচালক, একাডেমী অব টু আরস,
সিলেট । প্রকাশিত কাব্য : 'ওরিয়েন্টাল সান' (২০০০) ।

২১. অনন্ত বিজয় দাশ : শিক্ষার্থী ; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়,
সিলেট ।

নবজীবনের সন্ধানে

একদল পরিবর্তন প্রয়াসী মানুষ; একটি বিপ্লব। অসংখ্য তাজা প্রাণ; অনেক রক্ত। একটি নতুন ভোর; অসংখ্য নবজীবন।

মাঝখানে কেটে যাওয়া দুরন্ত সময়।

আবার একদল পরিবর্তন প্রয়াসী মানুষ; একটি বিপ্লব। অসংখ্য তাজা প্রাণ; অনেক রক্ত। একটি নতুন ভোরের প্রতীক্ষায় অনেক প্রাণ; বাঁচার আকুতিতে।

এ বিপ্লবের নাম 'সন্ধানী'; রূপকার অসংখ্য নিবেদিত প্রাণ মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ আর মূলমন্ত্র 'স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলন।'

বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদান আন্দোলন সর্বপ্রথম শুরু করে 'সন্ধানী'। ১৯৭৮ সালের ২রা নভেম্বর একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে। পরবর্তীতে দিনটিকে 'জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এরপর এগিয়ে চলা, অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে; অনেক ত্যাগ, তবু আমরা দেখা পাইনি সেই ভোরের, যেখানে রক্তের অভাবে মারা যাবেনা আর একজন মানুষও।

কারণ এখনো এদেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় রক্তদান হতে দূরে; এখনো রক্তের প্রয়োজনে পেশাদার রক্তদাতাদের সাথে তাদের অসহায় সখ্যতা। আর এর মূলে রয়েছে সচেতনতার অভাব, অনর্থক আজও অজ্ঞতাজনিত ভয়। এজন্য সন্ধানীর রয়েছে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী; সাক্ষাতে এবং অন্যান্য মাধ্যমে। প্রতিবছর এদেশে প্রায় আড়াই-তিন লক্ষ ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন হয়; এর মধ্যে মাত্র প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার ব্যাগ রক্ত সরবরাহ করে সন্ধানী। কিছু সংগৃহীত হয় রেডক্রিসেন্ট, বাঁধন ও অন্যান্য সংগঠনের মাধ্যমে আর স্বেচ্ছাদাতাদের মাধ্যমে। আর বাকি চাহিদার প্রায় অনেকটুকু আসে পেশাদার রক্ত বিক্রেতার কাছ থেকে; আর কিছুটা আসে না। এসব পেশাদার রক্তবিক্রেতারা মাদকাসক্ত; যারা হেপাটাইটিস-বি.সি, সিফিলিস, এইডসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। এদের রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে রোগী আক্রান্ত হয় এসব প্রাণঘাতী রোগে। ফলশ্রুতিতে হারিয়ে যায় অসংখ্য তাজা প্রাণ নীরবে।

অথচ আমাদের এতটুকু ইচ্ছা আর সচেতনতা পারে এসব মৃত্যুপথযাত্রীকে ফিরিয়ে আনতে; যারা আমাদেরই ভাই-বোন-বন্ধু। ৪৭.৫ কেজি ওজন সম্পন্ন ১৮ থেকে ৫৭ বছর বয়সী যে কোন সুস্থ মানুষ প্রতি চারমাস অন্তর রক্তদান করতে পারেন। আমাদের শরীরের রক্তকণিকাগুলো প্রতি চারমাস পর আপনিই নষ্ট হয়ে যায়। অথচ আমরা যদি এক ব্যাগ রক্তদান করি এবং একজন অসুস্থ মানুষের শরীরে দেয়া হয়, তাহলে তা পারে তাকে বাঁচাতে। রক্তদানে শরীরের কোন ক্ষতি হয়না। জলীয় অংশ সেদিনই পূর্ণ হয়ে যায়। স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য মনোবল ব্যতীত আর কিছুই প্রয়োজন নেই। আর সন্ধানীতে রক্তদান করলে আপনি পাচ্ছেন একটি ডোনার কার্ড; যার মাধ্যমে আপনার বা আপনার আত্মীয় স্বজনের প্রয়োজনে বাংলাদেশের যেকোন সন্ধানী ইউনিট হতে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবেন। সর্বোপরি মানবসেবার যে আনন্দ, তা থেকে আপনি কেন নিজেকে বঞ্চিত করবেন? তাই–আসুন প্রতিজ্ঞা করি স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে।

স্বেচ্ছায় রক্তদানের পাশাপাশি মরণোত্তর চক্ষুদান নিয়েও কাজ করছে সন্ধানী। এদেশে প্রায় ১৫লক্ষ লোক কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্বের স্বীকার। যার একমাত্র সমাধান কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন। আর তার জন্য প্রয়োজন ভালো কর্ণিয়া, যা একমাত্র মরণোত্তর চক্ষুদানের মাধ্যমে সম্ভব। আপনার একটু সদিচ্ছায় একজন হয়তো দেখতে পাবে পৃথিবীর আলো; গড়ে ওঠতে পারে একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে। মরণোত্তর চক্ষুদানের ব্যাপারে ধর্মীয় কোন বিধি নিষেধও নেই। তাই মরণোত্তর চক্ষুদানের মাধ্যমে আসুন আমরা আলোকিত করি অনেক আলোহীন সম্ভাবনাময় জীবন।

আসুন, আমরা প্রতিজ্ঞা করি; সহযাত্রী হই সেই মহান বিপ্লবের যা মানুষকে দেখায় বাঁচার স্বপ্ন, করে তোলে আলোকিত আঁধারবাসীকে।

যোগাযোগ

সন্ধানী
(মেডিকেল ও ডেন্টাল ছাত্র-ছাত্রী পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান)
সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ ইউনিট
সিলেট, বাংলাদেশ।
ফোন : ৭১০৮৮০।